উৎসর্গ

অধুনা বিস্মৃতপ্রায় হলেও এ যুগের চিন্তা ও কর্মে যাদের অবদান মহামূল্য, বাংলার প্রগতি প্রয়াসে একদা যাঁরা ছিলেন প্রকৃত প্রাজ্ঞ পুরোধা, যাদের জীবন ও জনহিতে বিবিধ প্রযত্ন ছিল আত্মচিন্তার সংস্পর্শ মুক্ত, সেই তিন চরিত্রের বাঙালী মনস্বী

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর

স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ সমর্পিত হল।

মুখবন্ধ

'কানু বিনা গীত নাই'। আজ্‌কের দুনিয়াকে বুঝতে হলে মার্ক্‌স্‌বাদের শরণ-না নিয়ে পথ নেই। মার্ক্‌স্‌-এর শিক্ষার সব চেয়ে কঠোর বৈরী যারা, তাদেরও পণ্ডিত-মুখপত্রেরা নিজেদের বলতে আরম্ভ করছেন 'Marxologists' —এ যেন শত্রুভাবে ভজনার এক নামান্তর! যাই হোক্‌, শত্রুমিত্র সবাইকে আজ জটিল এই জগৎকে বুঝ্‌বার প্রয়াসে মার্ক্‌স্‌বাদ এবং তার প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনায় নাম্‌তে হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে রচিত আমার কতকগুলি প্রবন্ধ এখানে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে এগুলিকে প্রকাশ করা কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের পরিচয়, সন্দেহ নেই। আমার নিজের এ ব্যাপারে সংকোচ ও শঙ্কা ছিল। এখনও তা কাটে নি। কিন্তু কয়েকজন সুহৃদের আগ্রহে এই প্রকাশনে সম্মতি দিয়েছি। নিজের দায়িত্ব অপর কয়েকজন সহৃদয় সজ্জনের উপর চাপাবার উদ্দেশ্যে এ কথা বলছি না। এ ব্যাপারে দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আমার; তবে বলছি নিজের মনের দ্বিধা একেবারে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি বলে।

বহু বিষয়ের উত্থাপন প্রবন্ধগুলিতে ঘটেছে। আশাকরি পাঠক তার মধ্যে যোগসূত্রের সন্ধান সহজে পাবেন। ভারতবর্ষের ভূমিতে একান্তভাবে প্রোথিত যার সত্তা, তার পক্ষে মার্ক্‌স্‌বাদ কেমন করে 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দ'-এর ভিত্তিস্থল হতে পারে, 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' মন্ত্রের সাধকতম অস্ত্ররূপে উপলব্ধ হতে পারে, তারই সাক্ষ্য এখানে যদি মেলে তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

আমার বন্ধু ও প্রাক্তন ছাত্র, সুকবি মনীন্দ্র রায় উদ্যোগী না হলে এ-সংকলন সম্ভব হত না। প্রকাশভবনের পক্ষ থেকে শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এর প্রচার ব্যবস্থার ভার অসংকোচে গ্রহণ করে আমায় বিস্মিত করেছেন। এঁদের উভয়কে বিশেষ করে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মার্কস্‌বাদ ও মুক্তমতি

কমিউনিজমের জুজু সারা ইয়োরোপকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছে, এই হল ১৮৪৮ সালে লেখা কমিউনিস্ট ইশতেহারের প্রথম কথা। তারপর থেকে দুনিয়ার সব ঘাটে কত জল বয়ে গেছে, অদলবদল ঘটেছে অজস্র, গোটা জগৎ জুড়ে অন্তত দুটো যুদ্ধ হয়েছে এমন ধরনের যা পূর্বে ছিল প্রায় অভাবনীয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতিতে পর্যন্ত পরিবর্তন এসেছে—১৭৮৯-৯৪ সালে ফরাসী দেশে যে গণজাগরণকে মনে হয়েছিল বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা, তাকে গুণগতভাবে ছাপিয়ে উঠল মেহনতী মানুষের ক্রমবর্ধমান অভিযান, যা আপাত-পরাজয় সত্ত্বেও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল অপরাজেয়। ১৮৭১ সালে প্যারিস 'কম্যুন্'-কে অবলম্বন করে শ্রমজীবী জনতার নিছক নিজস্ব অভ্যুত্থানকে মার্কস্ অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে শুধু মর্ত্যে নয়, যেন স্বর্গে পর্যন্ত তারা ঝটিতি বিস্তার করে দিয়েছিল। এরই দেদীপ্যমান সংস্করণ হল ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব, যা শুধু রুশ সাম্রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ আয়তনে নবজীবনের বীজ বপন করে ক্ষান্ত হল না, বিশ্বসাম্রাজ্যতন্ত্রের সমগ্র কাঠামোতে ফাটল ধরাল, সর্বদেশের নির্জিত মানুষকে জানাল 'দিন আগত ঐ'। শোষণ-কারাগারের লৌহকপাট তারপর থেকে ভেঙে পড়তে আরম্ভ হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে পৃথিবীর জনতা দিকে দিকে নবশক্তির উন্মেষে আজ সমুজ্জ্বল। মহাচীনের বিপুল ভূখণ্ডকে এখন সাম্যবাদীরা নিয়ন্ত্রিত করছে, জগতের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ধনতন্ত্রের পূর্ণবিলুপ্তি ঘটেছে, আর বহুকালের শৃঙ্খল চূর্ণ করে এশিয়া এবং আফ্রিকার মানুষ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্ববশ জীবন গড়তে গিয়ে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, সমাজবাদী ধারায় অর্থ-ব্যবস্থা নির্মাণের অবশ্যম্ভাবিতাকে উপলব্ধি করছে। কবিকল্পনার কাছে ঋণ নিয়ে বলতে ইচ্ছা যায় যে আজ নবযুগের চারণ যেন শোনাচ্ছে: "ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারই হউক জয়!"

অবশ্য ইতিহাসের রথচক্র চলে এসেছে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা' দিয়ে, তার যাত্রায় সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ তো পড়ে না, আর জীবন তো এই বিশ্বেরই

মতো সতত সঞ্চরমাণ—একেবারে এককভাবে মানুষ হয়তো বহু সাধনায় নিজের চিত্তকে অবিক্ষিপ্ত রেখে তুরীয় প্রশান্তির আস্বাদ পেতে পারে, কিন্তু বহু-জনাকীর্ণ সমাজ কোনও অচঞ্চল বিন্দুতে স্থির, নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে না। সাম্যবাদ সর্বত্র পূর্ণ সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও তো সমাজজীবন পরিণতির স্থাণুত্বে পর্যবসিত হতে পারে না। সাম্যবাদের পরিপূর্ণ সার্থকতার চেহারা নিয়ে চিত্তবিলাস করেছিলেন আকাশবিহারী মনীষীরা, যাঁরা মনঃসৃষ্ট "ইউটোপিয়া"-র মাধ্যমে সমসাময়িক জীবনের গ্লানি ও অন্যায়কে ধিকৃত করেছিলেন এমন সময়ে যখন সাম্যবাদ অনেকটা আয়ত্তের বাইরেই ছিল। সাম্যবাদ নিয়ে আকাশকুসুম রচনার আজ কারণ নেই, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদের পরিণত রূপ সম্বন্ধে কারুকল্পনারও কোনো তাগিদ নেই। সবচেয়ে প্রয়োজন আজ হল যে সাম্যবাদের সাফল্য সম্ভাবনা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ বলেই আমরা তার বর্তমান গতিপথকে যথাসাধ্য নিষ্কণ্টক ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত যেন করতে পারি, বিগত দিনের অভিজ্ঞতাকে অনাগত দিনের সৌকর্যসাধনে প্রযুক্ত করতে পারি, এবং এখনও তার প্রগতিকে যে বহুবিধ প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা আমাদের চিন্তায়, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের সমাজগঠনের মধ্যে সন্নিহিত হয়ে রয়েছে, তাকে যেন অপসৃত করতে পারি। এ কাজ বড়ো সহজ নয়, সামান্য নয়—যারা সাম্যবাদী তাদেরই চিন্তায় এবং আচরণে বহু দৌর্বল্য, বহু বিকৃতি, বহু অসঙ্গতি, অন্যায় ও অপরাধ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে এবং আজও দিয়ে থাকে, আর সাম্যবাদের যারা শত্রু, যাদের বহুরূপে আমরা সর্বদেশে এখনও দেখি, তাদেরও তূণে যে সবকটি শর আজ ব্যর্থ তা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে রাখি যে কথা ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা শ্রীযুক্ত তোগলিয়াত্তি কিছুকাল আগে কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে বলেছিলেন: "যে আশা পূরণ হয়েছে তারই শুধু প্রতীক আমরা নই, আমাদের আন্দোলনে অবয়ব লাভ করেছে একটি নিশ্চিতি, একটি বর্ধমান, অগ্রগামী শক্তি।"

কেউ হয়তো রহস্য করে বলবেন যে লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে এই নিশ্চিতি হল ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাম্যবাদের প্রকৃত সাদৃশ্য, আর এই নিশ্চিতির কথা জোর গলায় বলতে না পারলে বোধ হয় বহুজনকে চরম উন্মাদনার আস্বাদ দিয়ে কাজে নামানো যায় না—সে-নিশ্চিতি ভগবানের কিংবা ইতিহাসের নামেই ধর্ম এবং কমিউনিজম প্রচার করে এসেছে। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না, যদিও আপাতদৃষ্টিতে কতকগুলি সৌসাদৃশ্য থাকলেও

কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং ক্যাথলিক গির্জার মতো সংস্থার বনিয়াদী ব্যাপারে একেবারে গরমিল রয়েছে। স্বীকার করতে হবে যে নানা কারণে অনেক শ্রদ্ধেয় সাম্যবাদীও তাঁদের তত্ত্ব ও কর্ম নিয়ে যন্ত্রবৎ বিচার করে থাকেন ; সহজ, সাধারণ মানুষের মনে যে বহু প্রশ্ন ওঠে তাকে হয়তো অজ্ঞাতে উপেক্ষা করে বসেন ; সাম্যবাদকে সমাজবিবর্তন প্রসঙ্গে অনিবার্য জেনে যেন নির্ভর করেন ইতিহাসের অকাট্য ধারার উপর ; ভুলে যান ইতিহাস অতিমানবিক কোনো প্রত্যয় নয়, ইতিহাস স্বয়ম্ভূ নয়, তার স্রষ্টা হল মানুষ। দোষে-গুণে গড়া, সংস্কারের বাঁধনে-বাঁধা অথচ এগিয়ে-চলার-তাগিদে-সাড়া-দেওয়া মানুষ। সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্যায়ে, রুশদেশের রূপান্তর সংসাধন কালে, লেনিন-স্তালিনের যুগে কিয়ৎপরিমাণ তত্ত্ব- ও কর্ম-সম্বন্ধীয় কাঠিন্য ও কঠোরতা অবশ্য বোধগম্য, কিন্তু বর্তমানে, বিশ্বের সামাজিক ভারসাম্য যখন কমিউনিস্টদের অনুকূল না হওয়ার কোনো হেতু নেই, তখন প্রাক্তন এবং সম্ভবত অনিবার্য কঠোরতা ও কাঠিন্যকে বহুলাংশে বর্জন বোধ হয় করা যেতে পারে। এমনও হয়তো বলা যায়, অত্যন্ত সবিনয়ে ও কথঞ্চিৎ কুণ্ঠা নিয়ে বলা যায় যে সাম্যবাদের বিশ্ববীক্ষা নিয়ে কার্ল মার্কস্‌ তাঁর পূর্ণ বক্তব্য সাজিয়ে রেখে যেতে পারেন নি। ফয়েরবাথ সম্বন্ধে সূত্রগুলিতে কিংবা তাঁর পত্রাবলীর অংশবিশেষে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি রবিরশ্মির মতোই সমাজসত্যকে উদ্ভাসিত করেছে, কিন্তু তার সর্বত্রবিস্তারী সম্প্রসারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। একাধারে অপূর্ব মনীষা ও চিকীর্ষার অধিকারী হয়েও মহামতি লেনিনকে বাস্তব সমস্যা নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এমনই জড়িত হয়ে থাকতে হয়েছিল যে তাঁর অবদান অমূল্য হলেও দৈনন্দিন কর্মের অসম্ভব চাপে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ পরিবেশেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। ঠিক তাঁর তুলনীয় প্রতিভা আর দেখা যায় নি, এবং রুশদেশে, চীনে ও অন্যত্র নানা ঐতিহাসিক কারণে কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা অনেকাংশে অপরিহার্য হওয়ায় সাম্যবাদের স্বচ্ছন্দ তত্ত্বগত ক্রমবিকাশ কথঞ্চিৎ ব্যাহত হয়েছে। এখনও এ-বাধা কাটে নি ; চীনের কমিউনিস্ট নায়কেরা মার্কসবাদের পবিত্রতা রক্ষার নামে তত্ত্ব ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই যেন দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন, আর সোভিয়েত পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ব্যাপক ও মৌলিক পর্যালোচনা হচ্ছে না, সমসাময়িক কর্তব্যের দোহাই দিয়ে দুরূহ চিন্তার বালাই থেকে রেহাই পাওয়াই যেন তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। মাঝে মাঝে পোলাণ্ডের মতো স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় দেশ থেকে কিছু কিছু আশার আলো দেখা যাচ্ছে, কিংবা

ইতালির মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশে কমিউনিস্ট পার্টি জনতার সঙ্গে প্রকৃত আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার ফলে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে নব নব উন্মেষের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। মনে হয় আশা করা বাতুলতা, কিন্তু ইচ্ছা হয় আশা করতে যে আমাদের এই ভারতবর্ষের মতো দেশ, যা অতিবৃদ্ধ হলেও কখনও আত্মিক দিক থেকে জরদ্‌গব হয়ে পড়ে নি, যা বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের শুধু সন্ধান করে নি, তাকে স্থাপনও করতে পেরেছে, যে দেশে দৈন্য সত্ত্বেও আছে দীপ্তি, যেখানে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের কথা সহজ, স্বাভাবিক সুরে প্রোক্ত হয়েছে, সে-দেশ মার্কস্‌বাদের বিশ্ববীক্ষাকে সত্য, শিব, সুন্দর এই তিন গুণে সজ্জিত করতে সাহায্য করবে।

সম্প্রতি চীনের কমিউনিস্ট পাটির পক্ষ থেকে সোভিয়েত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে লেখা এক সুদীর্ঘ পত্র প্রচারিত হয়েছে, যাতে নানা কথার মধ্যে আছে কোনো কোনো কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে প্রখর ভৎ'সনা। চীনে ব্যাপক বিপ্লব সংঘটনের সার্থকতম শক্তিরূপে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি প্রভূত পরিমাণে আত্মগরিমাবোধ যে রাখে, তার পরিচয় অবশ্য সম্প্রতি প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক, পূর্বোক্ত পত্রের একস্থানে ভারতীয় কমিউনিস্ট পাটির নামোল্লেখ না থাকলেও প্রায় নিঃসন্দেহ লাগে যে কটাক্ষটা আমাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। "এমন পার্টি আজ কোনো কোনো দেশে আছে, যারা নিজের দেশের সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজস্ব অনুশীলন করে না, অন্য দেশ থেকে নির্ধারিত নীতির প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকে, তার ফলে কাজের ক্ষেত্রে হাতড়ানো ছাড়া আর বেশি কিছু করে উঠতে পারে না"—ঠিক তরজমা না হলেও এমনই ধরনের কথা পিকিং থেকে শোনানো হয়েছে। আজ অবশ্য প্রায় সব দেশের কমিউনিস্টরা পিকিং-মার্কা ফতোয়া (আর তার ফলাফল) লক্ষ্য করে শুধু যে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ ভেবে বিচলিত তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পিকিং-এর চিঠিতে যে-দোষের কথা বলা হয়েছে সে-দোষে বেশ কিছুটা যে আমরা দোষী, তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ ঘটবে। ভারতবর্ষের মতো দেশের স্বাভাবিক আত্মমর্যাদায় বিশ্রীভাবে আঘাত করে আর দুনিয়া জুড়ে সর্বনাশা যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনাকে উসকে দিতে পর্যন্ত তৈরি থাকার ভাব দেখিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছে, তা আমাদের চোখে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তাই বলে ভারতীয় কমিউনিস্টরা নিজেদের দোষত্রুটি ও

ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে অচেতন বা উদাসীন থাকলে ক্ষতি হবে তাদেরই এবং তাদের দেশের।

শুধু কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে নয়, আধুনিক যুগে এদেশের জীবনে প্রায় সব ব্যাপারে বিদেশের মুখাপেক্ষিতা একটা প্রচণ্ড অভিশাপ বই কিছু নয়। দুশো বছরের পরাধীনতা ভারতবর্ষকে এমনভাবে কক্ষচ্যুত করেছিল যে, এখনও সে-দুর্দশার প্রতিকার আমরা করতে পারি নি। ইংরেজশাসন জেঁকে বসার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের অন্তরাত্মা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠেছিল—পূর্ববর্তী যুগে সামাজিক যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা যে কম ছিল তা নয়, কিন্তু তখন অন্তত জীবনের ধারায় একটা সামঞ্জস্য ছিল, এমন পরিস্থিতি হাজির হয় নি যখন অতীত হল বিচ্ছিন্ন, বর্তমান হল দুঃসহ আর ভবিষ্যৎ ঘনান্ধকার। মরা হাড়ে ভেলকি খেলাবার শক্তি এই প্রাচীন দেশের ছিল বলেই আমরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাই নি, কিন্তু নিদারুণ দাম আমাদের দিতে হয়েছে ইতিহাসের এই কশাঘাতে। তাই ব্যতিক্রম সত্ত্বেও আমাদের দেশে গত একশো বছরের চিন্তায় আর মনীষায় দেখা দিয়েছে সেই দোষ যাকে গান্ধীজী নাম দিয়েছিলেন 'দাস-মনোভাব'। তাই এখনও আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি—এবং এই ধারণারই প্রতিফলন অনিবার্যভাবে পড়েছে সরকারি কাজকর্মে—যে শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজি ভাষাকেই চালু রাখা চাই, অন্তত উচ্চস্তরে তো বটেই। তাই এখনও রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস যে বিলাতের পার্লামেন্টমার্কা ব্যবস্থা হল সবচেয়ে সরেশ—আমরা ভুলে যাই যে আমাদের মতো দেশের পরিস্থিতিতে আছে এমন ধরনের স্বকীয়তা, যা দাবি করে শাসনরীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তা, যে-চিন্তা নিয়ে হয়তো বা কিছু পরিমাণে চেষ্টা হচ্ছে আফ্রিকা এবং এশিয়ার কোনো কোনো দেশে, যাদের সম্বন্ধে আমাদের নাকতোলা ছাড়া অন্য মনোভাব নেই, ইংরেজের যোগ্য শিষ্যরূপে আমাদের অপরিব্যক্ত অহঙ্কার এত বেশি! ইংরেজ রাজত্বের যুগে আমাদের উপরে যে চাপ পড়েছিল তার ফলে এদেশের শিরদাঁড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু কিছু কিছু মচকে যে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আত্মশক্তি সম্বন্ধে অনাস্থা আমরা প্রায় যেন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি—শুধু ভারতীয় কমিউনিস্টরা নয়, অল্লাধিক পরিমাণে এই বোঝা আমাদের সকলেরই ঘাড়ে পড়েছে, তার ভার সম্বন্ধে আমরা সর্বদা সচেতন না থাকলেও এ-কথা সত্য।

গণ্ডগোল আরও বেড়েছে সম্ভবত এজন্য যে মাঝে মাঝে শ্রদ্ধেয় মার্কস্‌-বাদীদের কাছেই আমাদের শুনতে হয় যে কমিউনিজম ব্যাপারটা হল পশ্চিমী ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত—যার অর্থ হল এই যে আমাদের মতো দেশের স্বাভাবিক আবহাওয়া হল কমিউনিজমের প্রতিকূল, আর তাই একেবারে তুলনীয় না হলেও ডিরোজিও-র যুগে যেমন বাঙালী বিদ্বান্‌রা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে নেমেছিলেন, খানিকটা তেমনই ভাবে আজকের নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের পাশ্চাত্ত্য ধারাকে আত্মস্থ করতে হবে। বর্তমান পৃথিবী হল সীমিত; অর্থব্যবস্থা আজ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছে; অতএব মূলত পশ্চিমী ইতিহাস থেকে উদ্ভূত কমিউনিজম আজ সঙ্গতভাবেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে—মোটামুটি এ-ধরনের যুক্তি অনেকের মনে আছে। উলটো দিক থেকে আবার সম্প্রতি প্রকাশিত এক চিন্তাশীল গ্রন্থে বিদগ্ধ লেখক পরম আন্তরিকতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "গণতন্ত্র আর সাম্যবাদ ভালোমন্দ নিয়ে একই বৃক্ষের দুটি শাখা মাত্র, আর বৃক্ষটি হল য়ুরোপীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারা"—যে-ধারা আজ শান্তি আনতে পারে না, স্বাধীনতাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করতে পারে না, "একমাত্র ভারতবর্ষের মহৎ সাধনা ও সিদ্ধিতেই আছে তমসা থেকে জ্যোতিতে উত্তরণের পথ।" (শান্তি বসু, 'শিল্প, স্বাধীনতা ও সমাজ', ১৩৭০)।

ভারতবর্ষের সাধনা এমনই মহীয়সী যে অতি সহজেই এবং তার একান্ত স্বল্প আস্বাদন সত্ত্বেও আমাদের দুর্গতিবিহ্বল চিত্ত সেখান থেকে সান্ত্বনা সংগ্রহ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অতুলন চিত্র অনেকের মনে পড়তে পারে: "ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনো সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে-প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে—পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।" আবার যখন সাম্যবাদী বিদ্বানদের কাছে শুনি যে কমিউনিজম দূরে থাক, এ দেশের যে-পরম্পরা, যে-ঐতিহ্য, তার সঙ্গে মানবিকতারও (humanism) কোনো সামঞ্জস্য নেই, তখন ধীর ভাষায় তাঁদের কাছে মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে-লিখিত ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস পড়বার সুপারিশ করতে মন যায় না, মন রুষ্ট আর বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায় এ-ধরনের অশ্লাঘ্য ও উদ্ভট একদেশদর্শিতার

বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রবোচনাকে সাবধানে এড়িয়ে গিয়েই তো ভাবতে হয়—ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিকথায় শুধু তার সাধনার সংবাদ নেই, সঙ্গে সঙ্গে আছে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত বেদনা ও ব্যর্থতার এমন মর্মন্তুদ কাহিনী যে সাধনার যজ্ঞধূমও তাকে আচ্ছাদন করে রাখতে পারে নি। বৃহদাকার গ্রন্থেও এই প্রসঙ্গের পূর্ণবিশ্লেষণ দুরূহ, কিন্তু অস্বীকার তো করা যায় না যে আমাদের ঐতিহ্যের মহত্ত্বের মাদকতা প্রায়ই আমাদের বাস্তব জীবনের অপার বিড়ম্বনাকে বিস্মৃত হয়ে থাকতে সাহায্য করেছে। একাদশ শতাব্দী থেকে এদেশে অল বরুনির মতো কোনো মনীষীকে দেখা যায় নি, যিনি ব্রত, দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কিংবা ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্ত, কাব্য ইত্যাদি নিয়ে মানসিক কসরত না করে সমাজদেহে যে রোগ প্রবেশ করেছিল তার নির্ণয়-চেষ্টায় প্রকৃত প্রস্তাবে নেমেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার ক্ষেত্র থেকে ভারতবাসী যেন বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। শিবাজীর মতো বিচক্ষণ ও বাস্তববিশারদ ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র কিনতেন বিদেশীদের কাছ থেকে, এদেশে তার কারখানা নির্মাণে অগ্রসর হন নি। নৌবাহিনী ব্যাপারে তো খাস দিল্লীর প্রবলপরাক্রান্ত মুঘল বাদশাহ উদাসীন ছিলেন।

বহুকাল যখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তখন অতীত সম্বন্ধে বর্তমানের পক্ষে রায় দেওয়া সহজ নিশ্চয়ই, হয়তো অন্যায়ও বটে। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনা নানা বিপত্তি সত্ত্বেও অন্তত কথঞ্চিৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের উত্তরাধিকার রূপে এসেছে বলেই অকুণ্ঠে বলা দরকার, সেই সাধনার বিস্ময়কর গরিমা সত্ত্বেও বলা দরকার, যে তাতে ফাঁক ছিল অনেক, হয়তো ফাঁকিও ছিল—এতে অপ্রসন্ন বা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, মানুষ কোথাও কোন কালে তো নিখুঁত হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মনে পাড়িয়ে দেওয়া দরকার যে প্রবল কর্তৃপক্ষীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকায়তবাদ যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের বঞ্চিত জনতার জীবনবোধকে প্রকাশের প্রয়াস করেছে—ভাষার যে-পরিচ্ছদ লোকায়তিকেরা তাঁদের বক্তব্যকে পরিয়েছিলেন তা হয়তো সর্বদা মনোহারী নয়, কিন্তু স্মরণীয় হল এই যে সুচতুরভাবে পরিকল্পিত অবজ্ঞা এবং সঙ্গে সঙ্গে শাসনযন্ত্রের দমনব্যবস্থা প্রয়োগ করেও লোকায়তবাদকে এদেশের জীবন থেকে লুপ্ত করা সম্ভব হয় নি, ভারতমানস থেকে তাকে মুছে দেওয়া যায় নি। কোনো কোনো দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন এই লোকায়তিকদেরই উত্তরাধিকার পেয়েছে। সমাজে 'কায়েমী স্বার্থ রয়েছে

বহু বিভিন্ন পরিচ্ছদে—মনের ক্ষেত্রেও কায়েমী স্বার্থের অস্তিত্ব বড়ো কম লক্ষ্য করার মতো নয়। এই স্বার্থপুঞ্জের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান বিভিন্ন আকারে যুগে যুগে ঘটেছে। বর্তমান শিল্পযুগে নির্বিত্তের দল বিত্তবানদের স্বার্থে এবং নির্দেশে পরিচালিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বদেশে আগুয়ান্‌ হয়েছে। লোকায়তিকদের মতোই তাদের বাক্যে, তাদের আচরণে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত উষ্মা-জনিত অশালীনতা যদি দেখা যায় তো কেবল বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। নতুন পরিস্থিতিতে, নতুন পরিবেশে দেবাসুর যুদ্ধ চলছে বর্তমান যুগে—সমুদ্রমন্থনপর্ব এখনও সমাপ্ত হয় নি, অমৃত ও গরল এখনও উত্থিত হচ্ছে, দলিত মানুষ আজ দেবতার ভূমিকায় অবতীর্ণ, কিন্তু কোনো মহাদেব এসে তার পক্ষ নিয়ে হলাহল গলাধঃকরণ করবে না, দুরূহ কর্তব্য নিজেই সমাধা করে তাকে তার নিজের কঠিন পরিচয় দিতে হবে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, 'না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি।'… বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই।…মানুষের যোগ যদি সংযোগ হয় তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ।" ('শিক্ষার বাহন' ১৩২২) স্বচ্ছ, সহজ এই কটি কথার মধ্যে যেন আজকের সকল বক্তব্যের মর্মবস্তু রয়ে গেছে।

বাস্তবিকই আজ পৃথিবী আকারে ছোট হয়ে গেছে, দেশ থেকে দেশান্তরে যাওয়া সময়ের দিক থেকে সামান্য ব্যাপার। যে মস্কো ভূগোল আর মনের হিসাবে আমাদের দেশ থেকে কত দূর ছিল, আজ তা যেন প্রতিবেশীর মতো। দিল্লী থেকে হাওয়াই জাহাজ তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আকাশে পাড়ি দিয়ে মস্কোতে পৌছে যায়। কিন্তু শুধু দৌড়ে এর ওর কাছে হাজির হওয়া তো বড়ো কথা নয়, দরকার হচ্ছে যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পরস্পরের "সংযোগ"। হিটলার দর্পভরে বলতেন যে 'ব্রেকৃফাস্ট' খাবেন হলাণ্ডে, 'লাঞ্চ' করবেন বেলজিয়মে, আর রাত্রের 'ডিনার' ফ্রান্সে—কারণ সব কটা দেশ হবে তাঁর তাঁবেদার। এ হল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দুর্যোগ" কারণ এ তো মানুষে মানুষে মিলনের ছবি নয়, বহু দেশের গলায় শিকল বেঁধে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পৈশাচিক আনন্দ। এই ধরনেরই "দুর্যোগ" বাধিয়ে দিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থপুষ্টির জন্য লালায়িত বেশ কিছু লোক এখনও জগতে বহাল তবিয়তেই বাস করছে,

আর সেজন্যই "দুর্যোগ" নিবারণ করে "সংযোগ"-এর দিনকে এগিয়ে আনার প্রয়োজন আর গুরুত্ব এত বেশি।

"জানাতেই মুক্তি" ভারতবর্ষের এই ঋষিবাক্য যে কত মহার্ঘ তা বাগাড়ম্বরের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের চিন্তায় জ্ঞানকে দিব্যজ্ঞানের পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনীহা যে সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। এরই সঙ্গে ভাবা যাক প্রাচীন গ্রীকদের কথা—"জ্ঞানই শক্তি"। নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং ব্যবহারিক জীবনে, নিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, এই হল মানুষের অগ্রগতির মর্ম। প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞান মানুষকে শক্তি দিয়েছে বহু ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে পরাভূত করতে, সমাজকে সচেতন করেছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্কের উপর প্রকৃত আলোকপাত করেছে। এই জ্ঞান বিনা সমাজবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি চিন্তা ও কর্মধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করত না, বাস্তব-জীবনে যে অসংখ্য প্রতিবন্ধক আজও সমাজের সুষ্ঠু রূপায়নের পথে কঠোর ও কঠিন কণ্টকস্বরূপ, তাকে অপসৃত করার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে মানুষ সমসমাজের স্বপ্ন দেখতে পারত বটে, কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হতে পারত না। অন্তত ১৮৪৮ সাল থেকে বলা যায় যে মানুষের জ্ঞান এমন স্তরে তখন উঠেছিল যে সমাজ জীবন ব্যাপারে তার প্রকৃত মুক্তিকে যেন সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, আর পেরেছিল বলেই সাম্যবাদের কল্পনাকে আকাশকুসুমের স্তর থেকে নামিয়ে বাস্তব নিশ্চিতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যে বিপ্লবের মূল্য দিতে প্রস্তুত না থেকে কিংবা সে-মূল্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি দেখে বা অনুমান করে আতঙ্কিত হয়ে বহু সৎবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সাম্যবাদকে সমাজ-ব্যাধির প্রকৃত সদুত্তর বলে স্বীকার করেও গ্রহণ করতে পারেন নি।

নাম করার দরকার নেই, কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে আমাদের দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় মনীষী কথোপকথনব্যপদেশে বলেছিলেন মনে আছে "তোমাদের কমিউনিজ্‌ম্‌ থেকে শ্রেণী সংগ্রামের কথাগুলো সরিয়ে দাও, তাহলে আমিও কমিউনিস্ট!" অবশ্য ইংলণ্ডে অধ্যাপক টনি-র (Tawney) মতো ধীরস্থির মনীষী একবার বলেছিলেন ছোট ছোট কিস্তিতে সোশালিজমের দিকে এগিয়ে যাবার প্রসঙ্গে : "আস্তে আস্তে খোসা ছাড়িয়ে পেঁয়াজ খাওয়া যায় বটে,

কিন্তু জ্যান্ত বাঘ কামড়াবার শক্তি রাখে—তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একে একে খসিয়ে আনা সম্ভব নয়।”

যাই হোক্‌, শুধুমাত্র শুভবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে এবং সমাজবিবর্তনের যে ইতিহাস বহু ক্ষেত্রে মর্মন্তুদ তার সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় স্থাপন না করে যাঁরা সাম্যবাদের প্রতি অল্পাধিক আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে মাঝে মাঝে একেবারে সাম্যবাদ সম্বন্ধে হতাশ্বাস হওয়া একটুও অস্বাভাবিক নয়। বিপ্লব যখন ঘটতে থাকে, তখন তার মূল্যদান সম্বন্ধে তবু তাঁরা কতকটা বুঝতে পারেন; যুদ্ধকালে যেমন দোষ-নির্দোষী-নির্বিশেষে বহুজনের যন্ত্রণা, প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটে থাকে, তেমনই বিপ্লব সংঘটনকালে কিছু আতিশয্য ও অপকর্ম মার্জনা করতে এবং তার কারণ উপলব্ধি করতে তাঁরা হয়তো প্রস্তুত। কিন্তু বিপ্লব সফল হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে অন্যায় ও অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে তাঁরা প্রায়শ এমনই বিচলিত হন যে বিপ্লবের সার্থকতা সম্বন্ধেই প্রভূত সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে। কয়েক বৎসর ধরে সোভিয়েত দেশে বিপ্লবী সমাজব্যবস্থা সংরক্ষণের অজুহাতে অজস্র অপকর্ম সম্বন্ধে তথ্য এমনভাবে প্রচারিত হয়েছে, নীতিগত দিক থেকে তার বিচার বিষয়ে অযত্ন সহকারেই প্রচারিত হয়েছে, তার ফলে বহু সদ্‌বুদ্ধি ব্যক্তি একান্ত বিচলিত হয়ে সাম্যবাদের ভিত্তিবস্তু সম্বন্ধে পর্যন্ত সন্দিহান হতে আরম্ভ করেছেন—সাম্যবাদী সমাজ স্থাপনের মূল্য যদি ইতিহাস এমনই সমধিক বলে প্রমাণ করে থাকে তো সেই মূল্য দিয়ে যথোপযুক্ত প্রতিদান মিলেছে কিনা এই সন্দেহ প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আজকের প্রশ্নবিহ্বল পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রয়োজন যে অনুপাতবোধ তা যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি, চিন্তার ভারসাম্য যেন খণ্ডিত না হয়, আর সমাজ ব্যাপারে মৌলিক মূল্যচেতনা যেন বিকৃত না হয়ে পড়ে। বহুকাল আগে মার্কস বলেছিলেন: ‘দার্শনিকেরা নানাভাবে জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কাজ হল জগৎকে বদলে দেওয়া।” কিন্তু এ-কাজ তো সহজ নয়; পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি মানুষের ইতিহাসে যে জঞ্জাল জমেছে তাকে সরিয়ে দিতে পারা তো সামান্য কর্ম নয়—আর কখনও কি মানুষ এই মাটির পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অপাপবিদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে, না হতে চাইবে? নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—যা ভালো মনে করা যায় সেই দিকে এগিয়ে যাওয়া এটাই তো সংগ্রাম, আর এই সংগ্রামই

তো জীবন, সংগ্রামহীনতা হল মৃত্যু, যে-কথা একবার বলেছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ।

ইতিহাসের রুদ্ররূপ দেখে বাস্তবিকই মনে হতে পারে যে তাকে এড়িয়ে যেতে পারাই হল ভালো, কিন্তু মানুষ চাইলেই কি তার ইচ্ছা পূরণ হয়ে থাকে? রুশ বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার অল্প কয়েক বৎসর পরে বার্ট্রাণ্ড্‌ রাসেল্‌ সোভিয়েত দেশে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে "The Theory and Practice of Bolshevism" নামে একটি গ্রন্থে তাঁর প্রতিকূল সমালোচনা প্রচার করেছিলেন। মনে আছে, কার্ল্‌ রাদেক্‌ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন যে রাসেল্‌ সাহেব "নিজের গৃহকোণে আগুনের সামনে পা রেখে আরামে কোনো বই পড়ছেন এবং পাইপ টানছেন, এ-ছবি সহজে কল্পনা করতে পারি, কারণ বলশেভিক বিপ্লবকে ধিক্কার জানিয়ে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা, যারা এই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লিপ্ত, তাদের তো আর অত সহজে ছুটি নেই!" বাস্তবিকই যাঁরা একটু গভীরভাবে সাম্যবাদ বিষয়ে চিন্তার চেষ্টা করছেন তাঁদের পক্ষে মনে রাখা দরকার যে চিত্তের কথঞ্চিৎ ঔদার্য ও প্রসার থাকলে সাম্যবাদের ন্যায় জীবনদর্শনকে গ্রহণ করা দুরূহ নয়, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ব্যাপারে যে কত সমস্যা, কত কঠিনতা, এবং দোলায়মানতা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত স্থিরীকরণের একান্ত গুরুত্ব দেখা দিয়েছে এবং দেবে, তার ইয়ত্তা নেই। যাঁরা চিত্তরাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁরা অনেকেই কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সেই চিন্তার রূপায়ন সম্বন্ধে এমনই উদাসীন যে সমাজজীবনে সমস্যা যখন এসে দেখা দেয় তখন সেই চিন্তা যে প্রকৃতপ্রস্তাবে কী তা ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে আনা যায় না। এই ধরনের চিন্তায় যাঁরা সন্তুষ্ট, তাঁরা অবশ্য নিজেদের বিচারবুদ্ধির নির্ভুলতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাস্তব জীবনে তার পরীক্ষা ঘটে না, ক্রমাগত দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয় তাঁদেরই যাঁরা ব্যবহারিক জীবনে সাম্যবাদী হওয়ার চেষ্টা করছেন, পরীক্ষায় যাঁরা অবশ্য সর্বদাই উত্তীর্ণ হতে পারেন না, কিন্তু নিয়ত কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েই তাঁদের সমাজচিন্তা পরীক্ষিত হচ্ছে, সংশোধিত হচ্ছে, সুসংস্কৃত হচ্ছে, অল্পাধিক প্রয়োগ-সাফল্য অর্জন করে ইতিহাসের রথচক্রকে এগিয়ে দিচ্ছে।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে স্তালিন যুগের শেষ পর্বে বহুবিধ অন্যায়, অনাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যে অকরুণ আত্মসমালোচনা হয়েছিল, তারই জের টেনে আরও অনেক কথা

সেদেশ থেকে এবং সেখানকার সোশালিস্ট ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত অপকর্ম সম্বন্ধে জানা গেছে। না বলে উপায় নেই যে সোভিয়েত দেশের বর্তমান কর্তৃপক্ষীয়েরা এ-বিষয়ে যে সব কথা বলেছেন এবং মাঝে মাঝে কয়েকটি কাজও করেছেন, যার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। যে-অপকর্ম ঘটেছে, সে-সম্বন্ধে অন্তত মোটামুটিভাবে জানা দরকার যে ব্যাপক বিচারে তা অনিবার্য ছিল কিংবা নিবার্য ছিল। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ঘটনার কথা না তুলে সমগ্র বিচারে যদি স্থির হয় যে ঘটনাবলী ছিল অন্তত মোটামুটিভাবে অনিবার্য, তো তার অর্থ হয় একরূপ। কিন্তু তার অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ হয় যদি বিচারে স্থির হয় যে অপ্রিয় ঘটনাবলী নিবার্য ছিল অথচ নিবারিত হয় নি, অর্থাৎ ব্যবস্থায় এমন গলদ ছিল যে অত্যন্ত কদর্য ঘটনাও নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নিবারিত হয় নি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সোভিয়েত দেশ থেকে কিংবা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে সন্তোষজনক আলোচনা লক্ষ্য করা যায় নি। বোধ করি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সোভিয়েতের একান্ত দুঃসময়ে, যখন শত্রুবেষ্টিত সোভিয়েত দেশের বিলোপ সাধনের জন্য জগৎজোড়া ষড়যন্ত্র ও আয়োজন অনবরত চলছিল, তখন মানুষের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতকে মনে রেখে যাঁরা অকুণ্ঠে, অপ্রতিভ না হয়ে, এবং কখনও কখনও পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়ার পূর্বে, সোভিয়েতের পক্ষ সমর্থন করা প্রকৃত মানবিক কর্তব্য মনে করে এসেছেন, তাঁরাই আজ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কোনো ত্রুটি দেখলে সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে সংকুচিত হবেন না, কারণ দুনিয়ার চেহারা আজ বদলেছে, সোভিয়েত আজ সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর অবস্থায় নেই, সমাজবাদ পৃথিবীর একতৃতীয়াংশে শক্তি স্থাপন করে বর্তমান যুগের ইতিহাসকে শুধু প্রভাবিত নয়, নিয়ন্ত্রিত করারও সাধ্য রাখে।

কিন্তু সোভিয়েত এবং অন্যান্য সোস্যালিস্ট দেশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিচারে ত্রুটি যতই দেখা যাক না কেন, সন্দেহ নেই যে গুণগতভাবে ইতিহাসে নতুন এক সমাজের অবস্থিতি আজ তার অকাট্য প্রভাব বিস্তার করছে। ১৯৪২ সালে বীয়ট্রিস ওয়েব সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে যখন লেখেন যে "দুনিয়ার সব চেয়ে সমানাধিকারমূলক ও সর্বব্যাপী গণতন্ত্র" সেখানে স্থাপিত হয়েছে, তখন তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিচারে হয়তো কিছু আতিশয্য ছিল, কিন্তু মূলগত দিক থেকে কোনো ভ্রান্তি ছিল না। মনে পড়ে যায় বহুদিন পূর্বে

মহামতি রম্যাঁ রলাঁর কথা ; সোভিয়েত দেশকে আক্রমণ করার কলরব যখন চতুর্দিকে, তখন রলাঁ বলেন যে তাঁর বুড়ো চোখে অশ্রুজল বোধ হয় শুকিয়ে গেছে কিন্তু সোভিয়েতের বিপদ শুনলে তিনি বলে উঠবেন : "সোভিয়েতকে বাঁচাতে হবে নইলে মৃত্যুবরণ করব।" সোশালিস্ট সমাজ স্থাপন ব্যাপারে ইতিহাসে নতুন পদক্ষেপ ঘটিয়েছে সোভিয়েত। যদি তার দোষের কথা আজ শোনা যায় তো মনে রাখতে হবে : "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

হঠাৎ এক একটা খবর বেরোয় যা থেকে সোশালিস্ট সমাজের গুণগত প্রভেদ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৫।৪।৬৩ তারিখের 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজের একটি ছোট্ট কোণে দেখা গেল যে পূর্ব সাইবীরিয়ার রাজধানী ইর্‌কুট্‌স্কে প্রধান গ্রন্থাগারে এক প্রদর্শনী হচ্ছে—বিষয় হল "কবি বায়রনের জন্ম থেকে ১৭৫ বৎসর"! ঐ কাগজেরই মন্তব্য দেখলাম যে অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত 'বড্‌লিয়ান' গ্রন্থাগারে যে প্রদর্শনীর কথা কল্পনা করা যায় না, তাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন এক অঞ্চলে যা হল উত্তর ক্যানাডার মতো দুরধিগম্য, যাকে বলে পাণ্ডববর্জিত স্থান! ছোট্ট এই ঘটনা, কিন্তু এর তাৎপর্যের শেষ নেই। হয়তো কারও কারও মনে পড়বে স্তালিনযুগে প্রোক্ত যে কথা বলেছিলেন আইরিশ লেখক শোন্‌ ও-কেসি। তিনি বলেন যে দুটো কারণে তিনি সোভিয়েতের বন্ধু—এক হল যে আধুনিক ফরাসী চিত্রের সংগ্রহ সোভিয়েত দেশে যা আছে তা অতুলনীয়, আর দ্বিতীয় হল যে শিশু ও নারীদের বিষয়ে সোভিয়েত শাসনের বিবিধ ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কিছু অন্য কোনো দেশে নেই।

বিপ্লবকালে এবং বিপ্লবোত্তর যুগে বহু নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত সোভিয়েত দেশ থেকে মিলেছে সন্দেহ নেই। কোনো একটিমাত্র অপকর্মেরও গুরুত্ব হ্রাস করতে চাওয়া ঠিক হবে না—"res sacra homo" (মানুষের অস্তিত্ব হল পুণ্যবস্তু), খ্রীষ্টান ধর্মের মূলগত এই কথা, যে-কথা ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় ও অন্যান্য চিন্তায় বিভিন্ন রূপে সুপ্রকাশ, মার্কসবাদের মূল বক্তব্যে তা একেবারেই অস্বীকৃত নয়। মার্কসের রচনায় অগণিত পরিচয় রয়েছে যে কমিউনিজম্‌ তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে, ব্যক্তিসত্তা আর সমাজজীবন থেকে বিচ্যুতির বিড়ম্বনা ভোগ করবে না (The reintegration or return of man to himself, transcendence of

human self-alienation)। কিন্তু সমাজের ইতিহাস বিচারে ভুললে চলবে না যে যত অন্যায়, অনাচার, অবিচার, অপকর্ম ঘটেছে অনিবার্যভাবে—যুদ্ধের তাণ্ডবে, শক্তির মদমত্ততায়, হিংসার তাণ্ডবে, ক্রূরতার পরাকাষ্ঠায়। যে-ভারতবর্ষে ভগবান্‌ বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে, সে দেশে এবং সর্বদেশে কি নিষ্ঠুরতার নিদর্শন ইতিহাসে অল্প? শূলে চড়ানো, ক্রুশবিদ্ধ করা, জীবন্ত কবর কিম্বা পুড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো কিম্বা ঘোড়া চালিয়ে দেওয়া, গ্যাসে-ভরা ঘরে পূরে দেওয়া—আরও কত উপায়ে সেকালে ও একালে সমাজপতিরা দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে থেকেছেন। আর যুদ্ধ? মহাভারতের যুদ্ধ কিম্বা ট্রয়ের যুদ্ধ গোলাপজল ছড়িয়ে লড়া হয়নি, আর আধুনিক যুগে যুদ্ধেরই অঙ্গীভূত দুষ্কর্ম হিসাবে কার না মনে পড়বে আউশ্‌ভিৎস-এর (Auschwitz) কথা, যেখানে হিটলারি দানবতা চল্লিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়েছিল জঘন্য পদ্ধতিতে, কিম্বা হিরোশিমা যেখানে এক বোমা ফেলে আড়াই লক্ষ লোকের মৃত্যু ও বহু লক্ষের জীবন্মৃত্যুর ব্যবস্থা হয়েছিল? এ-সব কথা সৎ মানুষের মনে মাঝে মাঝে এসে কি ভিড় করে না? এ জন্যই তো বার্ট্রাণ্ড রাসেল একবার লিখেছিলেন:

> "মানুষ না থাকলে পৃথিবীটা হত আরও অনেক মধুর, অনেক তাজা। যখন সেপ্টেম্বরের সকালে সূর্যোদয়ের সময় শিশিরকণা হীরের মতো ঝলমল করে ওঠে, তখন প্রতিটি ঘাসের ডগায় দেখা যায় সৌন্দর্য আর অনবদ্য পবিত্রতা। ভাবতে ভয় করে যে বহু পাপী চক্ষু এই সৌন্দর্যকে দেখছে, আর তাদের কদর্য ও নিষ্ঠুর অহমিকার ছটায় তার মধুরিমাকে কলঙ্কিত করছে। আমি বুঝি না যে-ভগবান এই শোভা নিজে দেখছেন তিনি কেমন করে এতদিন ধরে বরদাস্ত করে এসেছেন সেই মানুষকে, যে দাবি করে যে সে ভগবানেরই প্রতিমূর্তিরূপে গঠিত হয়েছে!"

যুগ যুগ ধরে মানুষ সংগ্রাম করে এসেছে সমাজের রূপান্তরকল্পে—সে-সংগ্রাম প্রায়শ চলেছে অচেতনভাবে, কিন্তু এর বিরাম নেই। তার ইতিহাসে কালিমার অন্ত নেই, এত কালিমা যে অনুপাতবোধ বিস্মৃত হয়ে সেদিকে তাকালে আত্মাবলোপ ভিন্ন সৎ মানুষের গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে গরিমা—এমন গরিমা যা যুগ যুগ ধরে শুভ বুদ্ধির সঙ্গে আদর্শ, আবেগ,

নিষ্ঠা, স্বার্থবিসর্জন, সর্বজীবে মমতা প্রভৃতি দেবদুর্লভ গুণ—দুর্বল মানুষেরই মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছে। রামায়ণে বাল্মীকি রামের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন: "কর্মভূমিম্ ইমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যম্ মর্ম যৎ শুভম্"—এই কর্মভূমি আমরা পেয়েছি, সৎকর্ম হল আমাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্য প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই নতুন অভ্যুদয় আমাদের এই বিশ্বে ঘটবে। অনেক ব্যাপার এখনও অকাট্য, অনেক ক্ষেত্রে এখনও আমরা স্ববশ নই—কিন্তু উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ এমন স্তরে আজ উপনীত হওয়ার শক্তি রাখে যেখানে "সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বং আত্মবশং সুখং," এই মহাকাব্য অনুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। একথাই মার্কস্ লিখে গেছেন 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে: "Beyond it (the realm of necessity) begins that development of human energy which is an end in itself, the true realm of freedom, which however can blossom only with this realm of necessity as its basis." (ইংরেজী সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃঃ ৮০০)

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে নানাদেশে বহু গুণীজন সাম্যবাদের আকর্ষণে অনেকটা রাস্তা এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের অনেকেই আবার পিছিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। আর সম্প্রতি সাম্যবাদের বিচিত্রবীর্য কীর্তিকে প্রশস্তি জানিয়েও অনেকে তার কোনো কোনো দিক সম্বন্ধে এমনই বীতরাগ যে শত্রুপক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে যোগ দিয়ে ফেলতেও যেন তাঁদের সংকোচ তেমন নেই। আমাদের দেশে প্রায় বৎসরাধিককাল কমিউনিস্ট চীনের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বহু বুদ্ধিজীবী সাম্যবাদ সম্বন্ধে চকিতে (এবং বহুক্ষেত্রে চিন্তাব্যতিরেকে) এমনই বিরূপ হয়ে উঠেছেন যে তাঁদের বক্তব্যে অস্বচ্ছতা ও নীতিদৈন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকররূপে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই দুরবস্থার জন্য চিন্তা এবং কর্মের ক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিস্টদের বহুবিধ ত্রুটি ও অকর্মণ্যতা যে বহুলপরিমাণে দায়ী, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু দোষ ও দায়িত্ব আরোপনে তুষ্ট হয়ে থাকা অনুচিত। এ-বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা কিছু সম্ভব কিনা, তাই নিয়ে চিন্তা হোক।

যাঁরা কমিউনিস্ট নন, তাঁরা স্বীকার করবেন ভরসা করি যে সংগঠন যতই গণ্ডগোলের কারণ হোক না কেন, সংগঠন বিনা সমাজজীবনে সংহত পদ্ধতিতে কোনো রূপান্তর সংঘটন সম্ভব নয়। স্বয়ং ট্রট্‌স্কি একবার বলেছিলেন:

"I cannot be right against the Party"—হয়তো আমি যা ভাবছি, তাই ঠিক, কিন্তু পার্টিকে যদি তা না বোঝানো যায় তো আমার অভ্রান্ত চিন্তাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। কেউ কেউ এ-ধরনের কথা শুনে বিরক্ত হবেন, কিন্তু সংগঠন ব্যাপারে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি প্রায় অপরিহার্য মনে হলেও সংগঠন বিনা ব্যাপক ভিত্তিতে শুভ কিম্বা অশুভ কোনো কর্মই সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। বর্তমানে তো এদেশে দেখা যায় যে চিন্তাক্ষেত্রে কমিউনিজম্‌কে নিঃস্ব এবং হাস্যাস্পদ প্রমাণ করে একেবারে জব্দ করার চেষ্টায় যাঁরা দারুণ উৎসাহ নিয়ে লেগেছেন, তাঁরা আমেরিকার পুঁজিপতিদের প্রসাদে পুষ্ট সংস্থার বিবিধ সাহায্য নিতে একটুও ইতস্তত করছেন না, Congress of Cultural Freedom নামক প্রতিষ্ঠানটির কথা এই ব্যপদেশে সকলেরই মনে পড়বে। যাই হোক্‌, কেবল সাংগঠনিক আনুগত্যের জন্য কমিউনিস্টদের মুণ্ডপাত যাঁরা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে নাচার। কমিউনিজমের প্রকৃত বক্তব্য এবং বর্তমান পৃথিবীতে তার অপার গুরুত্ব সম্বন্ধে মূলগত মতভেদ সত্ত্বেও যাঁরা অল্পাধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা রাখেন, তাঁদেরই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথার আভাস দেওয়ার ক্ষীণ প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধে করা গেছে।

প্রথিতযশা অধ্যাপক আর. এচ্‌. টনি (R. H. Tawney) একবার বলেছিলেন যে তিনি সোশালিস্ট এই কারণে যে নীতির দিক থেকে ধনতন্ত্র বর্জনীয়, আর যদি কেউ জবাব দেয় যে ধনতন্ত্রের আমলে তো সমাজের কাজ বেশ চলে যায়, তাহলে তিনি বলবেন যে ব্যাপারটা সেজন্যই আরও বিশ্রী। আমাদের দেশেও অনেকে অবশ্য এই ভাবে চিন্তা করে থাকেন, এবং হয়তো কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁদের বিরূপতার কারণ হল এই যে তাঁরা ভাবেন কমিউনিস্টরা চায় যে মানুষ কাজ করুক ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে (তার গূঢ়ার্থ যাই হোক না কেন) আর যেহেতু ইতিহাস কমিউনিজমের অনিবার্য সাফল্য সম্বন্ধে রায় দিয়ে বসে আছে, সেহেতু ইতিহাসের হাতিয়ার হওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। ঠিক এ-ধরনের কথা না বলা হলেও ইতিহাসের দোহাই দিতে গিয়ে কমিউনিস্টরা অনেক সময় যে মানুষের মজ্জাগত ন্যায়বোধকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি, তা অস্বীকার করা যায় না। ১৯৬২ সালের জুন সংখ্যা "Polish Perspectives" মাসিকপত্রে এই বিষয়ে মার্কসবাদী দার্শনিক Marek Fritzhand-এর মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি আছে—এর আলোচনা করতে গেলে আবার বিস্তৃত রচনা প্রয়োজন। শুধু বলা যায় যে বর্তমান

পরিস্থিতিতে একথা স্পষ্ট যে পূর্ববর্তী যুগে, বিপ্লবের প্রয়োজনবোধে, যে কথা বলা হয়েছে এবং যে কায়দায় বলা হয়েছে, তা আজ অনেকটা অচল। ইতিহাসের ধারা বুঝতে গিয়ে যদি বলা হয় এই যে ইতিহাস নামে নৈর্ব্যক্তিক শক্তির উপর ভরসা রেখে ব্যক্তিমানসে শুভ বুদ্ধির উদ্রেক সম্বন্ধে অচেতন থাকি তো অঘটন ঘটারই আশঙ্কা। আজ আমরা বুঝি যে ইতিহাস এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে পূর্বের চেয়ে আরও স্বাধীন এবং আরও সচেতন ভাবে মানুষ তার নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা লাভ করেছে। যে-মুক্তমতির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কার্ল মার্কসের রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে, সেই মুক্তমতি নিয়ে আজ সমাজে সর্ববিধ শুভবুদ্ধিকে একত্রিত করে "বহুজনহিতায়" প্রয়োগ করতে হবে।

'Polish Perspectives' পত্রিকার মে, ১৯৬৩ সংখ্যায় আছে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্কের আলোচনা। আজকের পোলাণ্ড নিঃসন্দিগ্ধভাবেই সমাজবাদকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখনও পোলাণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী ধর্মে বিশ্বাস রাখে, ক্যাথলিক বলে নিজেদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নয়। যারা বয়সে তরুণ, তাদেরও মধ্যে সম্প্রতি অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে শতকরা ৭০ জনেরও বেশি ক্যাথলিক বলে নিজেদের বর্ণনা করেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকেও ক্যাথলিক ধর্ম বহু শতাব্দী ধরে পোলাণ্ডে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। আজও পোলাণ্ডে গেলে গির্জায় উপাসকদের সহজে ও বহুল সংখ্যাতেই দেখা যাবে। পোলাণ্ডের নেতা শ্রীযুক্ত গোমুল্‌কা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পূর্বেও ক্যাথলিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের মোটামুটি বোঝাপড়া একরকম চলেছিল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পর থেকে সাধারণ ভাবে সাম্যবাদীরা প্রাক্তন একটি বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, তা হল এই যে সোশালিজম্‌ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বাড়বে, সুতরাং যারা শত্রু কিম্বা চিন্তাধারাগত বা অন্য কারণে শত্রু হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তাদের দমন করতে হবে। এই ঘটনার তাৎপর্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সোশালিজমের অগ্রগতির ফলে শ্রেণীসংঘর্ষ যদি কঠোরতর না হয়ে বরং হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে, পূর্বতন শ্রেণীপরিস্থিতি যদি ক্রমশ অন্তর্ধান করতে থাকে, তো অনুকূল অবস্থায় ক্যাথলিক চার্চের মতো প্রতিষ্ঠান বিত্তবান্‌ শ্রেণীর সঙ্গে তার সুদীর্ঘ সম্পর্কের ঐতিহ্য সত্ত্বেও সোশালিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্তোষজনক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। সম্প্রতি গোমুল্‌কা তাই বলেছিলেন : "ধর্মবিশ্বাস ব্যাপারে রোমান্‌ ক্যাথলিক

পথে যদি চার্চ চলে তো আমরা আপত্তি করি না। তবে আমরা চাই যে পোলাণ্ডের জনতা তার স্বকীয় গণতন্ত্রকে বিকশিত করবার জন্য যে পথে চলেছে, চার্চও সেই পথ অনুসরণ করুক।" মূলগত চিন্তাধারা সম্পর্কে কমিউনিজম্ আর ক্যাথলিসিজম্ একত্রিত হচ্ছে, এ-কথা বলা বা ভাবা বাতুলতা। কেবল সাময়িকভাবে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পোলাণ্ডের কমিউনিস্টরা চার্চের সহযোগিতা সংগ্রহের এক কৌশল অবলম্বন করেছে, তা বলাও অন্যায় হবে। মার্ক্‌স্‌বাদী ও খ্রীষ্টান চিত্তবৃত্তির মৌলিক স্তরেও কোনও সংমিশ্রণের চেষ্টা হচ্ছে না। যা হচ্ছে তার তাৎপর্য অনেক—কারণ বিভিন্ন অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে যদি কমিউনিস্ট এবং ধর্মবিশ্বাসীদের মিলন সম্ভব হয় তো তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটুক। মানবিকতার যে সম্প্রসারণ কমিউনিস্টদের কাম্য, তাকে সুদৃঢ়, সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত করতে গিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংযোগ হবে না কেন?

পোলাণ্ডের মতো দেশে যদি এ-প্রশ্ন এভাবে উঠে থাকে তো আমাদের দেশে এর অনুশীলন কি সঙ্গত নয়? ভারতবর্ষ পৃথিবীর সব চেয়ে বিরাট ও জনাকীর্ণ দেশগুলির মধ্যে চীনের পরই দ্বিতীয় স্থান নিয়ে আছে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের অবশ্য কর্তব্য কি নয় এমন চিন্তাধারা উত্থাপনের চেষ্টা করা, যার ফলে আফ্রিকা ও এশিয়ার সদ্যস্বাধীন দেশগুলির কাছে চীন-কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রখর, সংগ্রামপ্রধান, শ্রেণীসংঘর্ষমূলক, আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করার মতো অটল অতি-বিপ্লববাদের বিকল্প কোনও মার্কস্‌বাদসম্মত বক্তব্য উপস্থাপিত হতে পারে? এ-বিষয়ে আমাদের অক্ষমতা অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু এই দায়িত্ব যে আজ উপস্থিত, তা কি সহজে অস্বীকার করা যায়?

বুঝি না কেন ভারতবর্ষের মার্ক্‌স্‌বাদীরা ভ্রান্তিভয়ে ভীত অবস্থায় আমাদের এই বিপুল ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশে কিঞ্চিৎ মুক্তমতি হয়ে কর্মপথে নামতে চাইবেন না, আমাদেরই স্বকীয় চিন্তার যে-পরম্পরা তার কথা নিজেরা স্মরণ করবেন না, অপরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আজকের সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনে তাঁদের সহযোগিতা অর্জন করবেন না। সিদ্ধান্তের কথা ভিন্ন, কিন্তু ইয়োরোপের সাম্যবাদী মহলে খ্রীষ্টান ধর্মসংস্থার ইতিহাস আলোচনা হয়েছে; Clement of Alexandria, Tertullian, Cyprian, Ambrose, Augustine প্রভৃতি সাধুর বক্তব্য সম্বন্ধে বিচার তাঁরা করেছেন সমাজবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

এ-ঘটনা ঘটেছে বলেই তো আজ পোলাণ্ডে সাম্যবাদের হয়তো সবচেয়ে জোরালো বিরোধী ক্যাথলিক চার্চেরও উষ্মা শীতল হয়ে আসছে। বেদে, উপনিষদে, রামায়ণ-মহাভারতে, বিবিধ-পুরাণে, মুসলিম ধর্মচিন্তা ও নিত্যকর্ম-বিধানে, অগণিত সাধুসন্তের জীবন ও উপদেশে মনুষ্যধর্ম সম্পর্কে যে মূল্যায়ন মাঝে মাঝে অসঙ্গতিদুষ্ট হয়েও জাজ্বল্যমান, তাকে, মানুষের এগিয়ে চলা হল যে আন্দোলনের মূল কথা, তার সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টায় আমরা লিপ্ত হব না কেন? কোথায় কোন্ ভুল করে ফেলে গণ্ডগোল ঘটাব, এই আশঙ্কায় চিন্তাজ্বর থেকে নিস্তার লাভের চেষ্টাই তো এদেশে সাম্যবাদের চর্চাকে পঙ্গু করে রেখেছে। কমিউনিস্ট জগতের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথাই স্পষ্ট যে গুরুবাদী জড়তা পরিহার করে স্বচ্ছ, সুস্থ, মুক্তচিন্তার যুগ আরম্ভ হতে চলেছে। কিন্তু তা হবে না, যদি আমরা আমাদের নিজস্ব ভূমিকায় নামতে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি। ইতিমধ্যে তো কালস্রোত বয়ে চলেছে, আর শুনতে যদি চাই তো আমরা শুনতে পারি স্কন্দ পুরাণের কথা:

পরিনির্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমিব হি।
নোপকারাৎ পরো ধর্মো নাপকারাদঘং পরং॥

"বাক্যজাল মথিত করে একথাই নির্ণীত হয় যে পরের উপকার সাধনের চেয়ে বড়ো ধর্ম কিছু নেই আর অপকার করার চেয়ে বড়ো পাপ কিছু নেই।"

ভারতবর্ষ ও মানবিকতা

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার একটি ঘটনা মনে আসছে। আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন এক বন্ধু বিদেশে বসে অকস্মাৎ মাতৃবিয়োগ সংবাদ পেয়েছেন জেনে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য গিয়ে তাঁকে দেখলাম মুহ্যমান অবস্থায়। তিনি তখনই ছিলেন বহু বৎসর ধরে প্রবাসী। স্বদেশের শিক্ষিত সমাজে মানসিকতার দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা, এবং জীবনযাত্রার প্রণালীতে বহু কণ্টকের অভিজ্ঞতা তাঁর দেশাভিমানী চিত্তে এমন আঘাত এনেছিল যে বিদেশের পরিচিত হলেও অনাত্মীয় ও কিয়ৎপরিমাণে কৃত্রিম পরিবেশে বাস করার অসুখী সিদ্ধান্ত তিনি করেছিলেন; আজও তিনি বার বার মনেপ্রাণে ফিরতে চেয়েও দেশে ফিরতে পারেন নি। অনপনেয় অস্বস্তি তাঁর জীবনের সঙ্গী হয়ে থেকেছে, যা নিয়ে হয়তো উপন্যাস লেখা চলে, কিন্তু তা হল ভিন্ন ব্যাপার। বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক অটুট বলে সদ্য মাতৃহীন অবস্থায় বিলাপ করতে আমি তাঁকে দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম একটি কথা যা এখনও এতদিন পরেও ভুলতে পারি নি। পরদিনই তাঁকে দেখলাম বাহ্যত সুস্থ, সংযত, স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিন মনের রাশ তিনি ধরে রাখতে পারেন নি, আর বলেছিলেন: আমাদের সত্তার শিকড় যে-মাটিকে ছুঁয়ে আছে সেটা ইয়োরোপ নয়, সেখানে আমরা বহিরাগত অতিথি ছাড়া কিছু নই। স্বদেশের প্রতি অভিমান এবং জীবনের সৃষ্টিবৈচিত্র্যে সুশোভন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মায়া মিলে যাঁকে প্রায় চল্লিশ বৎসর প্রবাসী জীবনের অকাট্য একাকিত্বের অভিশাপকে অভ্যর্থনা করিয়ে রেখেছে, তাঁর মুখে শুনেছিলাম আমাদের সত্তার শিকড় যে-মাটিকে ছুঁয়ে আছে সেটা ইয়োরোপ নয়, কখনও হতে পারে না।

কোনো কথাই সম্ভবত শেষ কথা নয়—যে-কথা উদ্ধৃত করলাম তা তো নিশ্চয়ই শেষ কথা নয়, হয়তো বা চিরন্তন নয়, হঠাৎ ধাক্কা-খাওয়া মনের পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। ব্যাখ্যা তার গভীর হতে পারে কিন্তু চরম মূল্য তার নেই। তবু এই কথাটি নিয়ে প্রবন্ধ আরম্ভ করার উদ্দেশ্য একটা

রয়েছে। প্রায়ই দেখি আমাদের নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে আমরা এদেশে যথোপযুক্ত ভাবে সচেতন থাকি না, এবং প্রধানত ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অর্ধ-পরিচয়ের ফলে পশ্চিম মহাদেশের দেদীপ্যমান সভ্যতার আলো মাঝে মাঝে আমাদের চোখ শুধু যে ঝলসে দিয়েছে তা নয়, এক অদ্ভুত (এবং কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক) মোহাঞ্জনে আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন পর্যন্ত করে রেখেছে। তাই যাঁদের আমরা বুদ্ধিজীবী বলে থাকি তাঁদের মতো অসুখী বোধ হয় কোথাও কেউ নেই। মানসিকতার প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে মূলত পরবশ হওয়ার চেয়ে দুঃখ তো থাকতে পারে না। আত্মবশ হওয়ার মধ্যে যে সুখ তা আমাদের অধিকাংশ চিন্তাজ্বরস্পৃষ্ট শিক্ষিতের অনায়ত্ত। নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে একপ্রকার শঙ্কিত এবং হয়তো বা উপেক্ষা যেন প্রায় আমাদের মনের অগোচরে বিরাজ করছে বলে সে-বিষয়ে চিন্তার দ্বার আমরা বন্ধ করে রেখেছি। যে-সত্তার অস্তিত্ব আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে অকাট্য তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে তাই সংকোচ বোধ করে থাকি। একটু ত্রস্ত পর্যন্ত হয়ে পড়ি হয়তো বা কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করার মতো অভিজ্ঞতার আশংকায়, আর নিজের কাছে জবাবদিহি না করেই যা হল কর্তব্যকর্ম তা থেকে নিবৃত্তির সহজ আশ্রয় খুঁজি।

ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে যুগে যুগে আমাদের মধ্যে পুরুষোত্তমের আবির্ভাব ঘটেছে। যাঁরা এসেছেন কোনো গুহ্য শক্তির অবতাররূপে নয়, শুধু এসেছেন এমন মানবমহিমা নিয়ে যে তাঁদেরই সম্বন্ধে কবি বলেছেন: "দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে···।" এই দেবদীপবাহী মানুষ কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে:

"···আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন। আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ';) আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাইতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে

আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

আমাদের এই সার্বভৌম কবির ছিল সর্বভূমিতে বিচরণ, সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্তি, সর্বদেশে অধিষ্ঠান, সর্বমানবীয় আস্বাদে ও আকুলতায় তাঁর শিল্পীসত্তার পুষ্টি, সর্বজনের অন্তরে তাঁর আধিপত্য। অথচ তাঁর মনের, তাঁর হৃদয়ের, তাঁর আত্মার ভিত্তি প্রোথিত ছিল ভারতভূমিতে, এদেশের মাটি আর জল আর বায়ু মাতৃস্নেহসিঞ্চনে তাঁর প্রাণশক্তির উদ্রেক ও উদ্দীপনা ঘটিয়েছে। এজন্যই ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টিশীলতা এবং তারই বিচিত্র অনুষঙ্গ রূপে শিল্পসাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবীনৃত্যমান ছন্দের মধুরিমা তাঁকে মুগ্ধ করলেও কখনও অভিভূতি বলে কক্ষচ্যুত করতে পারে নি। এজন্যই তাঁর মধ্যে দেখেছি অধুনাতন যুগের ভারতবর্ষীয় মানবিকতার প্রোজ্জ্বলতম ব্যঞ্জনা, রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকরণে যে পরম্পরার প্রতীক, তাকেই বহুধা বিচ্ছুরিত প্রতিভার ভাস্বর ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাছে আমাদের সকল প্রতীক্ষা পরিতুষ্ট হয় নি, হবারও কোনো হেতু ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষেব মানবিকতা তাঁর এবং মহাত্মা গান্ধীর যুগ্মজীবনে প্রকাশ পেয়েছে—এই যুগল বিভূতিব ভাতি নিয়ে অহংকারে-কোনো প্রত্যবায় ঘটে না।

হয়তো অপ্রসন্ন প্রতিবাদ শুনব: এই দুই ব্যক্তির মানবিকতার মধ্যে বিপুল প্রভেদ রয়েছে—অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রী বিভিন্ন হলেও গঙ্গাযমুনা কি সহোদরা নয়? হয়তো বা বৈদগ্ধ্যেব উচ্চভূমি থেকে ইতরজনের স্পর্ধিত অজ্ঞতা সম্বন্ধে ঈষৎ-পুলকিত ঔদাসীন্যের কণ্ঠে মন্তব্য শোনা যাবে: সংসারবিমুখিতা যে দেশেব চিন্তায় প্রকট, আধ্যাত্মিকতার বিচিত্র নাগপাশে যে দেশের হৃদয়মন বাঁধা, জাতিধর্মভেদাভেদের বিড়ম্বনায় যে দেশের ইতিহাস অভিশপ্ত ও প্রগতি স্তিমিত, সনাতন অনুশাসনে যে দেশ বিশ্বাসী, প্রাচীনপন্থা যেখানে জীবনের সর্বস্তরে মজ্জাগতপ্রায়, "আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহীসুত বিশ্ববিধাতৃর," এই ধ্বনি যে দেশে অসুস্থ, অবাস্তব, মনোবিকার বলে ধিক্কৃত, সে দেশে বাক্যের যদি কোনও তাৎপর্য থাকে, গুরুত্ব থাকে, তো মানবিকতা শব্দটির উল্লেখ না করাই সমীচীন। এই সম্ভ্রান্ত অথচ সুতীব্র সমালোচনাকে উপেক্ষা করা বাতুলতারই পরিচায়ক হবে; এই বক্তব্যের মধ্যে বহু যথার্থ তথ্য যে নিহিত রয়েছে, তাও অনস্বীকার্য।

বিদগ্ধজনের মানসিকতার পাণ্ডিত্যের কঠোর বিচারে অনুত্তীর্ণদের সম্বন্ধে যে অনীহা হয়তো অজ্ঞাতসারে প্রায়শ প্রকাশ পেয়ে থাকে তাতে ক্ষুব্ধ না হয়েই বলা উচিত যে ইতিহাসেরই অমোঘ বিধানে ইয়োরোপের মানবিকতা যে বস্তু (তার সংজ্ঞা অবশ্যই একান্ত দুরূহ), তার সঙ্গে ভারতবর্ষে মানবিকতা বলে বর্ণনীয় যদি কোনো ধারা থাকে তো তা তুল্যমূল্য না হতে পারে, সাদৃশ্য কিছু পরিমাণে থাকলেও সাযুজ্যে সম্ভবত বহু প্রভেদ থাকতে পারে, উভয় ভূভাগে চিন্তা ও কর্ম যে-পরিচ্ছদে দেখা দিয়েছে তাতে গরমিলও ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু হয়তো বলা ভুল হবে না যে মূলগত দিক থেকে বিচার করলে এদেশেও দেখা দিয়েছে মানবিকতা। প্রতীচ্যের মানবিকতা থেকে কোনো কোনো বিচারে বিভিন্ন হলেও যার রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে ভারত-প্রতিভা প্রভাবিত হয়ে এসেছে এবং বিশ্বজনীন নবযুগসাধনায় যার বিশিষ্ট অবদান আছে। "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্" বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পত্তন করেছিলেন ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে, জায়মান জগতের সঙ্গে আমাদের এই বয়োভারানত মহাদেশের আত্মীয়সম্পর্ক অসংকোচে এবং ঈষৎ দর্পভরেই ঘোষণা করেছিলেন।

কিছুকাল পূর্বে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় 'মানবতা'র পরিবর্তে 'মানবিকতা' শব্দটি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনাব্যপদেশে বহু মূল্যবান প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। বিভিন্ন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শান্তি বসু, শ্রীযুক্ত বার্নিক রায়, শ্রীযুক্ত অশোক রুদ্র প্রমুখ অনেকে এ-বিষয়ে পর্যালোচনায় নেমেছেন, স্বকীয় চিন্তাকে অকুণ্ঠে প্রকাশ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসু পাঠকের কৃতজ্ঞতাই অর্জন করেছেন। এ-বিষয়ে সুযোগ ও সময় পেলে বারান্তরে কিছু বলার চেষ্টা করব। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু ভারতবর্ষীয় চিন্তা ও কর্মধারায় যে-গুণকে মানবিকতা আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নয় তারই সমুজ্জ্বল অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়াস করে ক্ষান্ত হব।

বিলম্বিত হলেও ভূমিকা হিসাবে অল্প কয়েকটি কথা এখানে বলে নিতে চাইছি। বিতর্কে আর বিতণ্ডায় নামতে আপাতত চাইছি না, কিন্তু আমার চিন্তার কয়েকটি সূত্র এখানে ধরে রাখতে চাই। প্রথম কথা এই যে উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনের আনুষঙ্গিক প্রভাব রূপে এ দেশের জীবনে যে ওলটপালট এবং চিন্তারাজ্যে তার প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল এবং যার ফলে কথঞ্চিৎ বিকৃত ও পঙ্গু হলেও যে নবজাগরণ লক্ষিত হয়েছিল, তাকে 'পুনর্জন্ম'

(Renaissance) বলতে আমি অস্বীকৃত; বহু মৌলিক মতভেদ সত্ত্বেও যে চিন্তাশীল বিদ্বান্‌কে আমি অগ্রজ বলে কাছে থেকে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম সেই স্বর্গত কোবিদ্ কে. এম. পানিক্করকে অনুসরণ করে তাকে আমি ভারতবর্ষের 'আত্মসংবরণ (Recovery) আখ্যা দিতে চাই। যদুনাথ সরকারের মতো ভক্তিভাজন ইতিহাসাচার্য উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে জাগরণ ঘটেছিল তাকে ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতকের অতুলন 'নবজন্ম'-এর চেয়ে দীপ্তিমান্ যখন বলেছিলেন তখন অত্যন্ত সবিনয়ে হলেও তাঁরই জীবদ্দশায় প্রখর প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠা বোধ করি নি; এই দুঃসাহসের জন্য নিন্দিত হয়েছি, কিন্তু লজ্জিত নই। দ্বিতীয় কথা এই যে গণতন্ত্র, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, শিল্পবিপ্লব, তত্ত্ব ও কর্মে বৈজ্ঞানিক, যুক্তিসিদ্ধ বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগপ্রচেষ্টার যে-ধারা আজ সর্বমানবের সম্পদ, তাকে একান্তভাবে প্রতীচ্যের অবদান এবং ভারতজীবনে অপরিচয়ের জড়তায় অস্থিরমতি এবং প্রায় অনাকাংখিত আগন্তুক মনে করার যে প্রবণতা কোনও কোনও চিন্তাশীল বিদ্বানের বক্তব্যে লক্ষ্য করি, তাতে আমার যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান বুদ্ধি (এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই আমার মনের ঝোঁক) সায় দেয় না। দেশাভিমান আমার আছে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই, কিন্তু তার ভিত্তিতে নয়, আমার বিবেক ও বোধশক্তি অনুযায়ী তথ্যসংগ্রহের ভিত্তিতেই আমি মনে করি যে আধুনিক সমাজ-জীবনকে বিপ্লবী রূপায়ণ দেওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি আমাদেরই স্বকীয় ঐতিহ্যের মধ্যে উপস্থিত আছে। আরও মনে করি যে স্বদেশীয় পরম্পরার সাহায্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও কর্মধারার স্বপক্ষে সর্ববিধ কর্তব্যকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব আজ একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভারতচেতনা আমাদের মানসিকতাকে যে সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে রেখে সুফলপ্রসূ করতে পারে, এ-বিষয়ে আমার কোনো দ্বিধা নেই।

পূর্বেই বলেছি যে অল্প কয়েকটি তথ্য ভারতকথা থেকে আহরণ করছি, কিন্তু সময়সংক্ষেপ সত্ত্বেও সেই তথ্যসঞ্চয়ন অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে, এত বেশি কথা থেকে বাছাই করতে হচ্ছে যে অবসর প্রচুর না হলে প্রকৃত বাছাইয়ের কাজ যে সম্ভব নয় তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। পাঠকদের কাছে তাই এখনই ক্ষমা চেয়ে রাখছি, আর জানি যে তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মনের ভাণ্ডার থেকে আমার অসম্পূর্ণ বক্তব্যকে পরিপূরণ করে দিতে পারবেন।

আধ্যাত্মিকতা হল ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, এই অহংকার আমরা বহুদিন পুষে রেখেছি—বাস্তব জীবনে বার বার মারাত্মক আঘাত খেয়ে সংসারকে অসার মনে করার প্রবৃত্তিকে অস্বাভাবিক এবং প্রকৃতপক্ষে অসত্য জেনেও অনেক সময় সান্ত্বনার মতো আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। বিদেশী পণ্ডিতেরাও মাঝে মাঝে মনের এই প্রবণতাকে উৎসাহ দিয়েছেন—ইতিহাসকে উপেক্ষা করেই Edwin Arnold-এর মতো ভারতানুরাগী প্রাচীন ভারতে গ্রীক আক্রমণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

> The East bowed low before the blast
> In patient, deep disdain ;
> She let the legions' thunder pass
> And plunged in thought again.

কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি সর্ জন্ উড্রফ্ ভারতবন্ধু ছিলেন ; তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতবাসীদেরই তথ্যগত অজ্ঞতা দূব করতে নেমে তিনি তন্ত্রের গূঢ়ার্থবাদিতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন, *Is India Civilized ?* শীর্ষক গ্রন্থে এবং অন্যত্র Arthur Avalon নাম দিয়ে অধ্যাত্মচিন্তার প্রতি তাঁর আকর্ষণকে প্রকাশ করে ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন বটে, কিন্তু একপ্রকার একদেশদর্শিতাকেই পুষ্ট করেছিলেন। আমাদের মনের এই একপেশে ঝোঁককে ঠাট্টা করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির গান লেখেন—"জীবনটা কিছু নাঃ!" রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গবীর'-কে বিদ্রূপ করেন :

> মনু না কি ছিল আধ্যাত্মিক ?
> আমরাই তাই করিয়াছি ঠিক,
> এ যে নাহি বলে, ধিক্ তারে ধিক্,
> শাপ দিই পৈতে ছুঁয়ে।

আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বড়াই মনের দিক থেকে এমনই সহজ ভুয়ো বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর কাজের ক্ষেত্রে তার ফল যখন ছিল বিষময়, তখন এ-ধরনের কশাঘাত খুবই প্রয়োজন ছিল আর প্রয়োজন ছিল বলেই দেখা গেল স্বামী বিবেকানন্দের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, সন্ন্যাস গ্রহণ করেও যিনি সংসারকে অস্পৃশ্য বলে পরিহার করে থাকতে পারেন নি, বজ্রনির্ঘোষে শুধু ভারতমহিমা প্রচার করেন নি, মানুষের জয়গান করেছিলেন, জগৎজুড়ে নিপীড়িত শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থানের তূর্যধ্বনি শুনে উৎফুল্ল হয়েছিলেন, সবাইকে

ডাক দিয়ে বলেছিলেন: "সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামহীনতাই মৃত্যু।" বিবেকানন্দের মধ্যে দেখা দিল যেন প্রাচীনকালের ঋষি আবার ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়ে বলছেন "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম, রক্তমাংসের মানুষের মধ্যেই বিশ্বের সর্বগৌরব পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। তিনি যেন পূর্বতন ঋষিদের প্রতিধ্বনি করে বললেন, দেবতার প্রসাদ মানুষকে বড় হতে সহায়তা করতে পারে কিন্তু দেবপ্রসাদের চেয়ে মূল্যবান হল 'তপঃপ্রভাব', মানুষের নিজের চেষ্টা, নিজের সাধনা ও সিদ্ধি। রামায়ণের মহাকাব্য যেন আবার আমরা শুনলাম তাঁর মুখে—

ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ (মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই)—

আর যেন রামচন্দ্রের মতোই তিনি বললেন: "কর্মভূমিম্ ইমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যম্ কর্ম যৎ শুভম্"—এই কর্মভূমি পেয়েছি, এখানে শুভ কর্ম করাই আমাদের কর্তব্য।

হয়তো শোনা যাবে যে ধর্মের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, মানবিকতার বৃত্তান্তে তাঁরা মহৎ হলেও স্থান পাবেন না। আর কেউ কেউ শাসাবেন যে পরোপচিকীর্ষা মানবিকতার সঙ্গে সমার্থক নয়, পরদুঃখে বিগলিতহৃদয় মহানুভবতার সঙ্গে মানবিকতায় প্রভূত প্রভেদ আছে। সংজ্ঞার বিচার করতে গেলে অবশ্যই সে প্রভেদ আছে, কিন্তু দুর্গতের আর্তি দূর করার কামনার সঙ্গে মানবিকতা সম্পর্কশূন্য নয়। কাকতালীয় ন্যায়ের উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু মানবিকতা ও মানব দুঃখে বিচলিতির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ না থাকলেও নিকট সম্পর্ক আছে। আর ইয়োরোপেও দেখা যাবে মানবিকতা আন্দোলনের পুরোভাগে এমন বহু ব্যক্তি যাঁরা ছিলেন একান্ত ধর্মনিষ্ঠ. 'ইউটোপিয়া' রচয়িতা টমাস মূর্-এর মতো যিনি ধর্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নি, কিংবা এরাস্‌মুস্-এর মতো বিদ্বান্ যিনি তদানীন্তন ধর্মসংস্কার ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকায় নেমেছিলেন। তাছাড়া ইয়োরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপালন একটা বিশিষ্ট আকার নিয়েছিল যা ভারতবর্ষে কখনও ঘটে নি। ইয়োরোপে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আপামর সাধারণের মনে এই বিশ্বাস ধর্মযাজকেরা বপন করেছিলেন যে, পরিচিত পৃথিবীর অবসান আসন্নপ্রায়, খ্রীষ্ট জন্মের এক হাজার বৎসরের মধ্যে আবার যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করবেন এবং এই দ্বিতীয় আবির্ভাবের ('Second Advent') সঙ্গে সঙ্গে 'আদিম পাপ'-দূষিত পৃথিবী বিলোপ পাবে, যারা ধার্মিক, ধর্মাচরণ যারা মনে কোনো প্রশ্ন না

রেখে করে এসেছে, ঈশ্বরের বিচারে তারা স্বর্গবাসরূপ পুণ্যফল লাভ করবে, আর যারা অবিশ্বাসী, ধর্ম কর্মে যারা অবজ্ঞা বা অবহেলা করেছে, 'ক্যাথলিক চার্চের' সকল নির্দেশ মান্য না করে যারা তর্কে নেমেছে, তারা সবাই যাবে নরকে, সেখানে অনন্তকাল ধরে তপ্ত কটাহে তারা দগ্ধ হবে। অনিত্য জগৎ সম্বন্ধে এই ধারণাকে সম্পূর্ণ উল্‌টে দিয়ে দৃশ্যমান জগতের মনোহারিত্ব যখন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার প্রভাতকিরণোজ্জ্বল চোখ দিয়ে ইয়োরোপ দেখতে শিখল তখন তার মনে, তার দেহে, তার সত্তার নিবিড়ে নতুন এক আলোড়ন এসেছিল, যার অনুরূপ কোনো ঘটনা আমাদেব দেশে ঘটে নি। ইয়োরোপের 'রেনেসাঁস' আন্দোলনে ধর্মাবেগকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে দেখা গেল, মানবিকতার প্রকৃতি এবং খ্রীষ্টধর্মনিষ্ঠার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেল, যাকে বলা হয় 'pagan' ধারা তার প্রোজ্জ্বল প্রকাশ ঘটল। আমাদের দেশে ধর্ম কখনও ইয়োবো.প খ্রীষ্টান ধর্মের অনুরূপ চেহারা নেয় নি। তাই এখানে মানবিকতা দেখা দিল ধর্মচিন্তার সঙ্গে প্রকাশ্য বৈরিতা না করে, তাই এদেশের মধ্যযুগ যখন বলা যায় তখনই দেখা গেল মহাত্মা কবিরের মতো ব্যক্তি, যিনি প্রচার করলেন ভারতপন্থ, ধর্মধ্বজীদের যিনি উপহাস করেন কিন্তু ধর্মকে মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী মনে করেন না, ধর্মাচরণ নিয়ে নিষ্ঠার আতিশয্য ও সংকীর্ণতাকে ঘৃণা করেন কিন্তু ধর্মের মূল সূত্র থেকে এমন বস্তু আহরণ করতে পারলেন যাকে মানবিকতার সমগোত্রীয় বলতে দ্বিধা করা উচিত হবে না।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী শ্‌ভাইৎসের (Schweitzer) ভারতীয় চিন্তায় সংসার বিমুখিতার কথা বলেছেন। সংসার ও জীবন সম্বন্ধে এদেশের চিন্তায় ইতিবাচক ভঙ্গির চেয়ে নেতিবাচক ধারণাকেই তিনি প্রধান বলে দেখেছেন। এ-বিষয়ে ভারতচিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আচার্য রাধাকৃষ্ণণ-প্রণীত *Eastern Religion and Western Ethics* গ্রন্থে আলোচনা আছে; অনেকেরই তা চোখে পড়বার কথা। অবশ্য একথা সত্য যে নিরাসক্তি যখন আসক্তিকে খণ্ডন করছে, তখন নিরাসক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণা তা কিছু পরিমাণে মানবিকতার পরিপন্থী হতে বাধ্য। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আসক্তি বিনা মানবিকতার কল্পনাই সম্ভব নয়, একথা অকাট্য। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের চুলচেরা বিচার যাই বলুক না কেন, অদ্বৈত বেদান্ত যে-নিরাসক্তির প্রবক্তা, ভারতমানসে তার পরম আকর্ষণ থাকলেও ভারতচিন্তায় ভাব ও বস্তুবাদী বৈচিত্র্য আছে অপরিসীম, এবং নিরাসক্তির তুরীয় স্তরে

অধিষ্ঠানকে প্রণম্য হলেও অমানুষিকতার প্রতীক মনে করে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় মহাপুরুষ সাধারণ জীবনের কেন্দ্রস্থলে নেমে থাকাই কর্তব্য মনে করেছিলেন, বহুদূরস্থিত গিরিশৃঙ্গে সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে তিনি অস্বীকৃত হয়েছিলেন, পূতিগন্ধময় সংসার প্রপঞ্চের মধ্যেই জগৎশক্তির লীলাকে প্রকট দেখে তুষ্ট হয়েছিলেন। সংসারকে নস্যাৎ করার অল্পার্থ প্রবৃত্তি হয়তো সহজে এসেছে কোনো সদ্যগৃহত্যাগগর্বী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে, কিন্তু ভারতের গৈরিক পতাকায় অনাসক্তি বন্দিত হলেও কখনও জগৎ ও জীবন অবজ্ঞাত হয় নি।

বৈদিক যুগে দেখা যায় যে কবি বা বিপ্র হয়তো তুরীয় রাজ্যে বিচরণ করতে চাইছেন, কিন্তু সকলেরই কামনা ছিল ধন, মান, সন্ততি, স্বাস্থ্য, যুদ্ধজয়, শতবর্ষব্যাপী আয়ু। যজুর্বেদে প্রার্থনা রয়েছে: আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি, দেহের অটুট শক্তি নিয়ে শতবার শরৎ ঋতুকে দেখি, শুনি, তার কথা বলি, কারও উপর নির্ভরশীল না হয়ে থাকি, শত বর্ষের চেয়েও বেশি আয়ু যেন আমাদের হয়! রবীন্দ্রনাথ এক বক্তৃতায় ঋগ্বেদের আশ্চর্য বচন উদ্ধৃত করেছিলেন: "প্রাণের নেতা, আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, আবার দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখ্‌ব, আমাকে স্বস্তি দিও।" যে উপনিষদ্‌গুলিতে উচ্চ কোটির চিন্তা ভাস্বর হয়ে রয়েছে, সেখানেই বৃথা ভূমিকায় বাক্যব্যয় না করে সোজাসুজি এই পৃথিবীতেই মানুষের আয়ু যাতে বাড়ে তার জন্য মন্ত্র রয়েছে, তুকতাকের ব্যবস্থা রয়েছে, জাদুবিদ্যার শরণ নেওয়া হচ্ছে—পরবর্তী যুগে পুনরায় জন্ম ও মৃত্যুর শিকল থেকে মুক্তি চাওয়া ছিল রীতি, অথচ বৈদিক যুগে বর্তমান জীবনকেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করার কামনা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের ইতিহাস হল সুদীর্ঘ; তার কোনো কোনো পর্যায়ে বৈদান্তিক ধারা কিম্বা অহিংসা নীতি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বটে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ঋষিকে একবার যখন প্রশ্ন করা হয় যে মাংসভোজন নীতিসিদ্ধ কিনা, তখন তিনি বলেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই, তবে কি না মাংসটা কচি হওয়া চাই!'

রাজর্ষি জনক গৃহস্থ ছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য পরিব্রাজক ছিলেন কিন্তু একাধিক দারপরিগ্রহ করেছিলেন, গৃহত্যাগের পূর্বে দুই পত্নীর মধ্যে সম্পত্তি বিতরণের কথা বলতে গিয়ে মৈত্রেয়ীর কালজয়ী প্রশ্ন শুনেছিলেন: "যেনাহম্‌ নামৃতা স্যাম্‌, কিমহম্‌ তেন কুর্যাম্‌" (যাতে আমি অমৃতত্ব পাব না, তা নিয়ে আমি কী করব?)। উপনিষদ্‌ যুগের মর্মবাণী ছিল বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতা; এরই সন্ধানে

গিয়ে সত্যদ্রষ্টাকে বারংবার বলতে হয়েছে "নেতি, নেতি" (এ নয়, এ নয়), মানুষের ক্ষুদ্র কল্পনা এই পরিপূর্ণতাকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না বলে। আবার নিছক চিন্তার ক্ষেত্রে নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বাক্য ও মনের অগোচরত্ব ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ছিল মননের নিম্নস্তরে ঈশ্বরের পরিকল্পনা, যাতে মানুষ যেখানে আশ্রয় নিতে পারে, ভক্তিমার্গের পথ খুলে যায়, জীবনের ব্যঞ্জনা বহুবিধ হয়ে ওঠে। তবে জ্ঞানমার্গকেই মনে করা হত সব চেয়ে প্রকৃষ্ট। কঠোপনিষদে রয়েছে: "বিজ্ঞান যার রথের সারথি, নিজের মনের রাশ যে টেনে রাখতে পারে, সে-ই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে, এগিয়ে চলার লক্ষ্যস্থলে পৌছায়।" মুণ্ডকোপনিষদে আছে অবিস্মরণীয় বাণী:

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্য ঋষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানং।

সত্যই শুধু জয়লাভ করে, যা মিথ্যা তা জয়ী হয় না। দেবতাদের পথ সত্য দ্বারা আস্তৃত, এবং সেই পথ অতিক্রম করে তবেই ঋষিদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, পরম সত্যের যেখানে অধিষ্ঠান সেখানে তাঁরা উপনীত হতে পারেন।"

ধ্যানরাজ্যেও সর্বত্র সেই প্রাচীন যুগে মানুষের স্বকীয় মহিমার মূল্য আরোপ করা যে হয়েছে তার অজস্র পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যকে যে উপদেশের বর্ণনা আছে তা আজকের মুক্ত মানুষও শিরোধার্য করে নিতে ইতস্তত বোধ করবে না:

"সত্য বলবে; ধর্ম আচরণ করবে; অধ্যয়নে অবহেলা কোরো না; আচার্যের জন্য প্রিয় ধন আহরণ করে দেওয়ার পর নিজের সন্তানসন্ততি প্রজননে অবহেলা কোরো না; সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না; ধর্ম থেকে ভুল পথে যাবে না; মঙ্গলকর্ম থেকে, সম্পদ অর্জন থেকে, বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থেকে বিচ্যুত হবে না।

"দেবতা ও পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য থেকে স্খলন যেন না ঘটে; তোমার মাতা তোমার কাছে দেবী স্বরূপা; পিতা, আচার্য, অতিথিকে দেবতার মতো মনে কোরো; যে কর্ম অনবদ্য তাই কোরো, অন্য কর্ম নয়; যাতে আমাদের চরিত্রের উৎকর্ষ ঘটে, তাকেই বড় মনে কোরো, অন্য কিছু করণীয় নয়।"

ঐতরেয় উপনিষদ বলছে: "আবিরাবীর্ম এধি", (যা আবৃত হয়ে রয়েছে তা যেন আমার কাছে আবির্ভূত হয়), আর ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ছদ্মবেশী ইন্দ্র রাজপুত্র রোহিতকে বারবার উৎসাহ দিচ্ছেন: "চরৈবেতি, চরৈবেতি"

(এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো)—“যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে চলেন ; যে চলতে চায় না সে শ্রেষ্ঠ জন হলেও ক্রমে নীচ হতে থাকে ; অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। যে চলে, দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তার আত্মা দিনেদিনে বিকশিত হতে থাকে, এই তো মস্ত ফল। তারপর তার চলার শ্রমে চলবার মুক্ত পথে তার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হয়ে পড়ে শুয়ে। পাপের সমস্যার জন্য আর তার বৃথা মাথা ঘামাতে হয় না। অতএব, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো....” (ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর অনুবাদ)। এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে চমৎকার একটি কাহিনী রয়েছে। এক ঋষির দুই পত্নী ছিলেন একজন শূদ্রা অন্যজন ব্রাহ্মণী। যজ্ঞস্থলে শিক্ষালাভের জন্য মায়েরা একদিন ছেলেদের বাপের কাছে পাঠালেন। ঋষি ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে আদর করে কোলে বসালেন। অথচ যজ্ঞস্থলেই সর্বসমক্ষে শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে অবজ্ঞা দেখালেন। আহত শিশু মায়ের কাছে কেঁদে পড়ায় অভিমানী মা বললেন, “আমি শূদ্রাকন্যা, স্বয়ং পৃথিবী আমার মা, তাঁকে ডেকে দেখি বিহিত ব্যবস্থা তিনিই করবেন।” মাটির সঙ্গে শূদ্রের যোগাযোগ সব চেয়ে বেশি, তাই শূদ্রই যেন বিশেষভাবে পৃথিবীর সন্তান। তাই বসুন্ধরা সেই ছেলের শিক্ষার ভার নিলেন, সর্বশাস্ত্রে বিশারদ করে মায়ের কাছে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। শৈশবের অপমানের প্রতিশোধ তুলল সেই ছেলে ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ‘ব্রাহ্মণ’ রচনা করে। শূদ্রাব, অর্থাৎ ইতরার পুত্র তিনি, তাই তাঁর নাম হল ‘ঐতরেয়’, মহীদাস নামেও তাঁর পরিচয় কারণ মহীরই তিনি শিষ্য ছিলেন। যত বড় পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ গর্বে গর্বিত ব্যক্তিই হোন না কেন, ঋগ্বেদে প্রবেশ করতে হলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ না পড়ে উপায় নেই !

বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে উদাত্ত আহ্বান, যেন উত্থিত হচ্ছে মানুষের অন্তরের অন্তস্থল থেকে—“অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও অন্ধকার থেকে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতত্বে নিয়ে যাও।” আর আছে বজ্রদুন্দুভির ধ্বনি—“দ, দ, দ”, “দাম্যত. দত্ত দয়ধ্বম্”—নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথ্বীর বহু বাধা অতিক্রম করে যা টি. এস্. এলিয়েটের মতো মহাকবির মনে বিংশ শতকের প্রথম পাদে প্রতিধ্বনি তুলেছে ; “সংযত হও, অপরকে দান করো, সর্বজনের প্রতি সহৃদয়তা তোমার কর্তব্য।” এই ‘দয়ধ্বম্’ শব্দেরই নবরূপ দেখা গেল গৌতম বুদ্ধের শ্রীমুখ-

নিঃসৃত শিক্ষায়, যাকে আমরা জানি 'করুণা' বলে, যার পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, অথচ যে অনুভূতি সম্বন্ধে বলা যায় যে মানবিকতা ধারণ ও বহন করতে যদি কোনো শক্তি পারে তো তা হল করুণা, তা হল দুঃখনিবৃত্তির সন্ধানে গৌতমের অভিযান, অষ্টমার্গের পরিকল্পনা, 'মজ্‌ঝিম পন্থের' (মধ্যম পন্থা) প্রস্তাবনা, প্রধান শিষ্য আনন্দকে বুদ্ধের নির্দেশ : "নিজেই নিজের কাছে প্রদীপের মতো হবে" পরমুখাপেক্ষী হবে না জীবনের সর্ববিধ প্রশ্নোত্তরের জন্য, সত্যকে আঁকড়ে থেকো, নিজেই নিজেকে আশ্রয় দিতে পেরো। যারা ধর্মশিক্ষার নামে তত্ত্বকে রহস্যাবৃত করে রাখে, সাধারণ মানুষের মনে বিস্ময় উদ্রেক করার কৌশল অভ্যাস করে, আমি তাদের ঘৃণা করছি, তাদের সম্বন্ধে আমি লজ্জা বোধ করি—একথাই বুদ্ধ বলেছেন। তাই বুদ্ধদেবের কথা বলতে গিয়ে মনীষী সিল্‌ভ্যাঁ লেভি লিখেছেন : "মানুষ যেন স্বর্গের দেবতাদের রাহুগ্রস্ত করে দিল, যে মানুষের পদচিহ্ন পড়ল মাটিতে আর সর্বজনের অন্তরে"।

ঋগ্বেদে আছে "কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি"—যে মানুষ শুধু নিজের জন্য রান্না করে খায় সে পাপী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রয়েছে : "মমেতি মূলং দুঃখস্য, ন মমেতি চ নির্বৃতি"—যত দুঃখের মূল হল এটা আমার, ওটা আমার, এই নিয়ে—আমার কিছু নয়, তা হলেই দুঃখের নিবৃত্তি। বরাহপুরাণ পূর্তধর্মের প্রশংসা করে বলছে যে ইষ্টকর্মাদি করে স্বর্গে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য 'পূর্ত' প্রয়োজন, বহুজনের যাতে মঙ্গল হয় এমন কর্ম করা চাই। ভাগবত পুরাণ বলছে : "যাবদ্ ভ্রিয়েৎ জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাং"—জঠরপূরণের জন্য প্রয়োজন অন্নে মানুষের স্বত্ব আছে, তার বেশি যে অধিকার করে সে হল দণ্ডার্হ। অনুরূপ অসংখ্য উদ্ধৃতি স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে মেলে। অবশ্য এতে মানবিকতা আমাদের চিন্তা ও কর্ম-ধারায় উপস্থিত ছিল বলা আতিশয্য হবে। কিন্তু সংসারবিমুখিতা বাস্তবিকই কখনও ভারতবর্ষের জীবনকে চিহ্নিত করে নি।

ভারতবর্ষের শিল্প ও সাহিত্য যে কয়েক সহস্র বৎসরের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে, তাতে জীবনকে পরিহার করার চেয়ে আছে জীবনকে জয় করার কথা—যদি পরিহার করতে হয় তো তাও হল জীবনকে জয় করারই লক্ষ্য নিয়ে। মৌর্যযুগের পাটলিপুত্র ছিল সাম্রাজ্যগর্বিত রোমনগরীর চতুর্গুণ ; পাটলিপুত্রের নগরপালিকার বহু কর্তব্যের মধ্যে একটি ছিল ২৩০০ বছর আগে শহরে জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা! মহাভারত রামায়ণে অপ্রতিভতা বর্জন করে

মনুষ্য চরিত্রের যে সুস্পষ্ট অথচ গভীর চিত্রণ রয়েছে, তার তাৎপর্য ভুলে যাওয়া অনুচিত। প্রয়োগবিদ্যায় এদেশের অগ্রগতি তদানীন্তন কালের হিসাবে চমকপ্রদ সন্দেহ নেই; লোহার বিরাট থাম গড়া আর সমুদ্রযাত্রী জাহাজ নির্মাণে প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল পারদর্শী। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে কঠোর বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে দ্বিধাহীন বিশ্লেষণ আছে তা সুবিদিত। বৃহস্পতি, চার্বাক প্রভৃতি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে কেন্দ্র করে লোকায়ত চিন্তাধারাকে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজপতিরা দমন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের বস্তুনিষ্ঠা ও সহজ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যুগ যুগ ধরে আমাদের ইতিহাসে অখ্যাত হলেও বিরাট এক সত্য রূপে আজ ক্রমশ স্বীকৃত হতে চলেছে।

যে দেশে কামশাস্ত্রের মতো গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যে দেশে নাগরকের পক্ষে চৌষট্টি কলায় ব্যুৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন বলে ঘোষিত হয়েছে, সেখানে আমরা মানুষ এবং তার অস্থির, অশান্ত জীবনের গোচর এবং অগোচর অগণিত ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে অনীহাগ্রস্ত থেকেছি মনে করা হল বিভ্রান্তি। এদেশের স্থাপত্যে ও চিত্রাঙ্কনে প্রেমের দহন একেবারে অপরিহার্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। নারীদেহ নিয়ে ব্রীড়াহীন আনন্দ যেন আমাদের শিল্প থেকে এখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জীবনের চরম মূল্য ও তাৎপর্য ও লক্ষ্য যে মানুষের প্রেমাবেগের মধ্যে বিধৃত, এ-কথাই যেন সেই শিল্প ক্রমাগত বলছে। অজন্তা গুহায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা হয়তো চিত্রাঙ্কন করেছিলেন; সেখানে পরস্পরসংলগ্ন বহু চিত্রের বিষয় হল নারীদেহের অপার সৌন্দর্য; সেগুলো দেখে মনে হবে না যে প্রেমের দহনজ্বালাকে ধিক্কার দেওয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণ রয়েছে, বরঞ্চ মনে হবে যে প্রেম থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখার দুঃখকেই মাঝে মাঝে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর সংস্কৃত সাহিত্যের তো কথাই নেই—সমাজের নিগড় যতই কঠোর হতে থাকুক, নরনারীর প্রেম হল তার মুখ্য উপজীব্য। জীবন ও সংসার বিষয়ে ঔদাসীন্য আমাদের চিন্তায় মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র কিংবা মহৎ আকারে দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সেটাই আমাদের পঞ্চ সহস্রব্যাপী ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। যদি তা হত তো এত যুগ ধরে আমরা বেঁচে থাকতাম না, প্রাচীন মিশর বা ব্যাবিলনের সঙ্গ নিয়ে ইতিহাসের জাদুঘরে জায়গা নিয়ে থাকতাম।

উত্থানপতন আমাদের ইতিহাসে বার বার ঘটেছে। মনীষী অল্‌বেরুনি

একাদশ শতাব্দীতে লিখেছেন গুপ্ত যুগের হিন্দু সভ্যতার প্রশংসা করে এবং সমসাময়িক হিন্দুদের অবনতির উল্লেখ করে। এ দেশে মুসলিম শক্তির অভ্যুদয়ের পরে কিছুকাল জীবন ও সংস্কৃতির দিক থেকে মন্দা চলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পরে মুসলিম ও হিন্দু সভ্যতার সংমিশ্রণে নতুন ধারা দেখা দিল। এই জায়মান নবজীবনে মানুষের স্থান অনন্ত; যেমন সুফি চিন্তায়, তেমনি হিন্দু-মুসলমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে এ দেশের সাধুসন্তদের জীবনে, কাজে ও কথায় মানুষকে বসানো হয়েছে সংসারের কেন্দ্রে—ঈশ্বরকেও মানুষ তার আপন করে নিতে চেয়েছে, একাত্ম হতে চেয়েছে, বাঙালি বাউল সহজ সুরে গেয়ে উঠেছে—

একে একে মিলিয়ে গেল, আমার হাতে কিছুই রইল না।
গুরু, তোমার পাঠশালাতে অংক শেখা হইল না।

বিশেষ করে মনে পড়ছে ভারতবর্ষের সাধুসন্তদের সম্বন্ধে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর অনলস গবেষণার কথা। দক্ষিণ ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব সাধুর দল, তিরুভল্লুভর-এর মতো বিরাট পুরুষকে যাঁদের মধ্যে গণ্য করা যায়। জ্ঞানেশ্বর থেকে তুকারাম পর্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় সন্তদের কথা, গুর্জরে, রাজস্থানে, উত্তর ভারতে, উড়িষ্যা, বাংলা ও আসামে বহুমুখী ও ব্যাপক ভক্তি আন্দোলন—যাতে হিন্দু আছেন, মুসলমান আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, চণ্ডাল আছেন—যাঁদের মধ্যে রামানন্দ, কবির, দাদু, নানক, চৈতন্য, রবিদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি বহু ক্ষণজন্মার নাম সকলের পরিচিত, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মৈনুদ্দীন চিস্তি, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, বাহাউদ্দীন জাকারিয়া প্রমুখ মুস্লিম্ সাধক—যাঁদের বক্তব্য তুলসী, চণ্ডীদাস ও সুরদাসের মতো কবি কিংবা ভারতপন্থের স্থাপয়িতা কবিরের মতো মহাত্মার কাছ থেকে শুনে ভারতবর্ষ কৃতকৃতার্থ, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা বাড়ুক, নচেৎ এ দেশের মর্মস্থলে প্রবেশ করার মতো ভাগ্য আমাদের হবে না। চার্বাকের সূত্রে, বৌদ্ধ দোহায়, "বৈদিক ও অবৈদিক ধারার যুক্ত বেণীতে", ভারতে "হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনায়" যে সত্য কখনও অস্পষ্ট আবার কখনও উদ্ভাসিত হয়েছে, তারই প্রকাশ চণ্ডীদাসের অতি পরিচিত পংক্তিতে—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" একে শুধু দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণের একটি কাব্যিক বিন্যাস বলে উড়িয়ে দিলে কয়েক হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরাকেই অগ্রাহ্য করা হবে।

"উত্থাতব্যং জাগৃতব্যং যোক্তব্যং ভূতিকর্মসু"—এ হল ভারতবর্ষের প্রাচীন

কথা, ওঠো, জাগো, সর্বজনের হিত সাধনে যোগ দাও। ভারতবর্ষের সনাতন প্রার্থনা হল, "সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু", সর্বজন সুখী হোক। মানুষকে ভাগ্যের হাতে পুতুল বলে ভারতবর্ষ মনে করে নি—"নক্ষত্রবিদ্যা" প্রাচীন সূত্রগ্রন্থে, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে; যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, এক চক্রে যেমন রথ চলে না, তেমনই দৈব ঘটনাকে টানতে পারে না, পুরুষকারের ভূমিকা সর্বদা রয়েছে। "হিন্দুকো হিন্দ্‌বাই দেখি, তুর্কন্‌ কী তুর্কাই" বলে কবির হিন্দু-মুসলমানের সংকীর্ণতাকে ভর্ৎসনা করেছেন, মানবতার আদর্শ তুলে ধরেছেন। গত মহাযুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার আগে ইংরেজ তরুণ কবি অ্যালন্‌ লুইস্‌ দেখেছিলেন, "বিশ্বজনীন যে ক্ষেত্র এদেশে ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে তো অহংকারকে লুপ্ত না করে উপায় নেই।" সকল অহংকার ও ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে অবস্থিত নর-দেবতাকে ভারতবর্ষে ও অন্যত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এদেশের ইতিবৃত্তে, ধর্মে, কর্মে মানবতার জয়গান বহু বিচিত্র সুরে হলেও সর্বথা ধ্বনিত হয়েছে। মানবতা ও মানবিকতার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর তো নয়ই বরঞ্চ অতি স্বল্প। ইয়োরোপের বিশিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতিতে মানবিকতা নিয়ে যে আলোড়ন ঘটেছিল, ভারতবর্ষে ঠিক তা না ঘটলেও মানবিকতা ভারতমানসে অপরিচিতির অস্বস্তি আনবে না।

মার্কস-এর কালজয়ী শিক্ষা

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় মানুষের যে লাঞ্ছনা ঘটে, তার চমৎকার বর্ণনা আছে কার্ল মার্কস-এর 'মজুরি আর পুঁজি' রচনাটিতে : "মজুর কাজ করে শুধু বেঁচে থাকার জন্য। যখন সে মেহনৎ করে, তখন তার মনে হয় না সে বেঁচে রয়েছে। বরঞ্চ মনে হয় যে জীবনের খানিকটা অংশ তাকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে। তার মেহনৎ যেন একটা জিনিস, যা সে অপর একজনকে নিলামে বিক্রয় করে দিয়েছে। তাই তার খাটুনির লক্ষ্য সেই খাটুনির ফলে যা উৎপন্ন হচ্ছে তা নয়। যে-রেশম সে বুনছে, খনিগর্ভে ঢুকে যে-সোনার তাল সে তুলে আনছে, যে-অট্টালিকা সে বানাচ্ছে ; তা সে নিজের জন্য উৎপাদন করছে না। নিজের জন্য উৎপাদন করছে তার মজুরি ; এবং তার কাছে রেশম-সোনা আর অট্টালিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেঁচে থাকার পক্ষে একান্ত আবশ্যক কতকগুলি জিনিস—হয়তো একটা সুতির জামা, তামার কয়েকটি পয়সা আর এঁদোপড়া একটা বাসা। তার জীবন আরম্ভ হয় যখন তার মেহনৎ শেষ হয়—খাবার টেবিলে বা শুঁড়িখানায় বা বিছানায়। গুটিপোকা যখন রেশম কাটতে থাকে, তখন তার উদ্দেশ্য যদি হতো শুধু গুটিপোকা হিসেবেই নিজের আয়ু বাড়িয়ে যাওয়া, তাহলে আমরা মজুরের চমৎকার উদাহরণ দেখতে পেতাম ঐ গুটি-পোকাতে।"

১৮৬৭ সালে 'ক্যাপিটাল' মহাগ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর কার্ল মার্কস-এর আজীবন সহযোগী এবং অবিচল বান্ধব মনীষী এঙ্গেলস লিখেছিলেন : "আমরা যতই বস্তুবাদী তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করছি এবং বর্তমান অবস্থায় তার প্রয়োগে অগ্রসর হচ্ছি, ততই তৎক্ষণাৎ আমাদের চোখের সামনে বিপুল এক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, যে বিপ্লব বাস্তবিকই সর্বযুগের সব চেয়ে বিরাট বিপ্লব।" বিপ্লবের শত্রুরা প্রথমে মার্কস-এর রচনা গভীর ও নীরব উপেক্ষার জোরে হত্যার চেষ্টা করে। যখন তা সম্ভব হলো না, তখন গত একশো বৎসর ধরে তারা চালিয়েছে বহুরূপী আক্রমণ। মিথ্যাকথন, তথ্যের বিকৃতি, নোংরা অপবাদ, পাণ্ডিত্যের খোলস চড়িয়ে দৌরাত্ম্য,

সুকৌশলে বৈদগ্ধ্যের ছলাকলা ব্যবহার করে মার্কসবাদের বিপ্লবী অন্তঃসারকে উড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি ছিল তাদের প্রকরণ। অর্থশাস্ত্রে বিদ্যাদিগ্‌গজ বলে যার খ্যাতি উনিশ শতকের শেষদিকে তুঙ্গে উঠেছিল, সেই Bohm-Bawerk ১৮৯৬ সালে 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখলেন: "মার্কসীয় পদ্ধতির অতীত এবং বর্তমান রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তার স্থায়ী স্থান নেই।...মার্কস তার চিন্তাধারাকে অত্যন্ত নিপুণভাবে বিন্যাস করেছেন, বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশে অসম্ভব দক্ষতা দেখিয়েছেন, অসংখ্য স্তরে বিচিত্র মননফলকে সাজিয়েছেন, কিন্তু যা বানিয়েছেন তা হলো শুধু একটা তাসের ঘর!" বিংশ শতকের প্রমুখ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জে. এফ. (পরে লর্ড) কেন্‌স (Keynes) ১৯২৬ সালে সমুদ্ধত পুলকবোধ প্রকাশ করলেন: "মানুষের মতামত নিয়ে যাঁরা ইতিহাস লিখবেন তাঁদের কাছে এটা সর্বদাই এক দুর্লক্ষণ বলে বোধ হবে যে (মার্কসবাদের মতো·) যুক্তিহীন আর নিরেট গোমড়া একটা তত্ত্ব মানুষের মনের ওপর এবং তার ফলে ইতিহাসের ঘটনাবলীরও ওপর কিভাবেই না প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে!"

প্রচণ্ড পণ্ডিতী পরাক্রম বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থেকেও মার্কসবাদকে পরাভূত করতে পারেনি। রজনী পাম দত্ত 'লেবর মন্থলি' পত্রিকায় ৪৫ বৎসর পূর্বে যা লিখেছিলেন, তা আজও পুনরাবৃত্তি করা চলে: "আজকের দুনিয়ার ইতিহাস এবং জীবন্ত মার্কসবাদ হলো সমার্থক। মার্কস-এর সমালোচকদের যুক্তি নিরসনের প্রয়োজনই ছিল না; ইতিহাস তা করেছে; যেসব টিপ্পনিকারদের নাম আজ শুধু মার্কসীয় গবেষকদের কাছেই পরিচিত, তাঁরা একশোবার 'প্রমাণ' করে দিয়েছেন মার্কস-এর মত 'ভ্রান্ত' এবং 'অবিশ্বাস্য'। পঞ্চাশ বৎসর ধরে যে তত্ত্ববিশারদেরা বলছেন মার্কসবাদ এখন 'বস্তাপচা' এবং আজকের অবস্থায় 'অবান্তর'—তাঁদের লেখাতেই প্রাগৈতিহাসিক গন্ধ ধরে গিয়েছে। বুর্জোয়া বিদ্যা এবং ধ্যানধারণার চৌহদ্দি ভেঙে বেরিয়ে আসতে যাঁরা শঙ্কিত, অথচ দ্বিধাসঙ্কুল মনে নিজেদের মার্কস-এর শিষ্য বলতে যাঁদের বাধে না, তাঁরা তো হাজার বার মার্কসবাদকে জোলো করে ছেড়েছেন, অস্বীকারও করেছেন। তবুও বর্তমান জগতে মার্কস দাঁড়িয়ে আছেন মহিমান্বিত মূর্তিতে—সেই জগতের ব্যাখ্যার চাবিকাঠি এবং সেই জগতের চালকশক্তি উভয় বস্তুই রয়েছে মার্কসবাদে।"

কিন্তু এখনও বলে বেড়াবার লোকের অভাব নেই যে মার্কস-এর মত বহু

মৌল-বিষয়ে ভ্রান্ত। এঁরা বিশেষ করে বলে থাকেন যে অল্পসংখ্যক ধনিকের হাতে অধিকাংশ পুঁজি জমে যাওয়া এবং মেহনতী মানুষের ক্রমবর্ধমান দুর্গতি সম্বন্ধে মার্কস-এর সিদ্ধান্ত নাকি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। এঁদের অনেকে 'সোশালিস্ট' নামধারী, যাঁদের সম্বন্ধে স্টালিন একবার বলেন যে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি এঁরা জানেন না বা জানতে চান না, আর বিপ্লবকে ভয় করেন মহামারীর মতো। এঁরা বলেন, মার্কস-এঙ্গেলস-এর 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর প্রতি স্পষ্ট কটাক্ষ করেই বলেন যে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উলটে দিয়ে বিপ্লব করতে গেলে বিপদ অনেক—শ্রমিকের শৃঙ্খল ছাড়া অনেক কিছুই হারাবার রয়েছে, হয়তো সেভিংস ব্যাঙ্ক-এ কিছু টাকা, হয়তো বা (আমেরিকার মতো দেশে) ছোট একটা মোটর গাড়ি, কিম্বা কিস্তিতে কেনা ছোট্ট একটা বসতবাড়ি—কারণ আজ শ্রমিকের নাকি এই সব 'সম্পত্তি' হয়েছে! এঁদের যুক্তিতে তাই বলে যে বিপ্লব হতেই পারে না, বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতি আজকের অগ্রসর দেশগুলোতে একেবারে নেই, সারা দুনিয়াতেও নাকি সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমশ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, প্রাচুর্যের দিকে যাচ্ছে।

পূর্বের তুলনায়, সর্বত্র না হলেও বহু ক্ষেত্রে, মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রার ধরনে কিছু উন্নতি যে হয়েছে, মার্কসবাদ অবশ্য তা অস্বীকার করে না। আপাতদৃষ্টিতে সে-উন্নতি ঘটেছে, তা স্বীকার করতে লেশমাত্র আপত্তি থাকার কথা নয়, যদিও সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে ঐ 'উন্নতি' ঘটেছে শোষিত জনতার যথাসাধ্য সংগঠিত আন্দোলন এবং সংগ্রামেরই ফলস্বরূপ; যে আন্দোলন এবং সংগ্রামের মূলনীতি ও রূপরেখা তারা প্রধানত আয়ত্ত করতে পেরেছে মার্কসের শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু এ ধরনের কথা বলে যাঁরা মার্কসবাদের ভুল দেখাতে ব্যস্ত, তাঁদের যুক্তি যে বাস্তবিকই অসার হয়তো মার্কস-এরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করলে তা সহজে বোঝা যাবে। 'মজুরি আর পুঁজি' রচনায় মার্কস লেখেন: "সমাজের সাধারণ বিবর্তনের পরিমাপে ধনিকের সুখসম্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যে-সম্ভোগ শ্রমিকের নাগালের বাইরে, আর শ্রমিকের স্বাস্থ্য কিছু বেড়ে থাকলেও সে-তুলনায় সমাজের বাসিন্দা হিসেবে তার মনস্তুষ্টি কমেছে। আমাদের অভাববোধ এবং আমাদের মনের আনন্দ সামাজিক অবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়; আমরা তাই সমাজের মাপকাঠি দিয়েই তার পরিমাণ স্থির করি। তাই আমাদের অভাব এবং আনন্দের প্রকৃতি সামাজিক বলেই তা হলো আপেক্ষিক।" ১৮২৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক কমিটির সামনে

সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এক ডাক্তার-পুঙ্গব বলতে ইতস্তত বোধ করেন নি যে কলের মজুরকে একাদিক্রমে একুশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে খাটানোর দরুন তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার কথা নয়! আজ অবশ্য ঠিক মালিকের পক্ষে অমন নির্লজ্জ সাফাই চট করে শোনা যাবে না। কিন্তু শ্রমিক সচেতন হয়ে লড়াই করে কিছু অধিকার জিতে নিতে পেরেছে বলে যে তার দুর্গতি মোচন হচ্ছে, তা একেবারেই নয়। সমাজের ওপরতলার দিকে তাকিয়ে আমেরিকার মতো সম্পন্ন দেশেও তার অভাববোধ এবং সাংসারিক বঞ্চনা সম্বন্ধে চেতনা বাড়ছে বই কমছে না। কারণ, মানুষ বিচার করে আপেক্ষিকভাবে। চারদিকের অবস্থা বিবেচনায় সে চেষ্টা করে, তাই মুষ্টিমেয় ধনপতির জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও সামাজিক কর্তৃত্বের দিকে নজর গেলে কিঞ্চিৎ সাচ্ছল্য লাভ করেও শ্রমিকের মনস্তুষ্টি হয় না। আমাদের দেশে আজও রিকশাওয়ালার পায়ে শস্তা রবারের জুতো দেখলে কিম্বা মেথরের মাথা গুঁজে থাকার মতো ঘরে আয়না দেখলে অনেকে ভ্রূ কুঁচকে 'ছোটলোকের বাড়' সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর মন্তব্য করেন। কিন্তু তা থেকে যদি কেউ গরিবের হাল ফিরে যাচ্ছে বলে ধারণা করে বসেন তো নাচার।

Walt Rostow, Raymond Aron, এদেশে আরও পরিচিত J. K. Galbraith প্রভৃতি পণ্ডিত মার্কসবাদী বিচারকে খণ্ডন করতে নেমে ক্রমাগত বলতে চাইছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে সমাজ এমন সমৃদ্ধ ("affluent") চেহারায় দেখা দিয়েছে যে মার্কস-এর হিসাব সেখানে বাতিল। কিছুকাল আগে Ilf এবং Petrov নামে দুই হাস্যরসিক লেখক মিলে 'Little Golden America' নামে একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা আমাদের কাছে একদা সুপরিচিত ছিল। আজকাল সাধারণত এ কথাই নানা রঙে শোনা যাচ্ছে যে আমেরিকান সমৃদ্ধি হলো মার্কসীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডনেরই মূর্তিমান প্রমাণ—ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম ইয়োরোপ সেই প্রমাণকেই বুঝি পুষ্ট করছে। অবশ্য মনে পড়ছে যে মাথা পিছু গড় আয়ের হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে তৈলের আকর—অতি ক্ষুদ্র কুবাইট (Kuwait) রাজ্য—প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই সমকক্ষ! মাথাপিছু গড় আয় ব্যাপারটিই অর্থনৈতিক কল্যাণের একমাত্র সূচক নয়, কিন্তু সে-কথা এখন থাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কসবাদকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করছে বলে যে প্রচার চলে, তারই কিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা হোক।

সংশ্লিষ্ট তথ্য নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই বোঝা যায় যে, আমেরিকা

হলো অর্থনীতি ব্যাপারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব এবং উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কের অন্তর্বিরোধের এক প্রখর দৃষ্টান্ত। প্রাক্তন আণ্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং বর্তমানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক A. A. Berle, jr., ১৯৬০ সালে লিখেছিলেন: "কৃষি বাদ দিয়ে অর্থনীতির অন্যান্য বিভাগের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রিত করে ৫০০টি কোম্পানি (যার মার্কিন নাম হলো 'কর্পোরেশন')। কিন্তু এই পাঁচশোর মধ্যে আছে আরও অল্পসংখ্যক একটি গোষ্ঠী, যারা হচ্ছে সর্বেসর্বা। আমার মনে হয় এই হলো পৃথিবীর ইতিহাসে অর্থশক্তির সর্বাধিক কেন্দ্রীকরণের উদাহরণ।" সেখানকার দুই লক্ষ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র দুশোটির হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের (কৃষি বাদ দিয়ে) শতকরা ষাটভাগের উপর কর্তৃত্ব। গত পনেরো-ষোল বৎসরে এদের বিদেশে খাটানো পুঁজির পরিমাণ বেড়ে পাঁচ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি (কয়েক বৎসর পূর্বের হিসাব) একটি সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে। 'The American Federationist' পত্রিকা হলো AFL-CIO নামে বিখ্যাত নরমপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মুখপত্র ; তার অক্টোবর ১৯৬৬ সংখ্যায় নামজাদা অর্থনীতিবিদ Irving Beller লিখেছেন যে শিল্পে মোট লাভের শতকরা ৭২ ভাগ পায় কোম্পানিগুলির মধ্যে শতকরা একের চার ভাগ। অবস্থাটা পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য তিনি আরও লেখেন যে একা General Motors ১৯৬৫ সালে যে মুনাফা করেছিল, তা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঠেরোটা রাজ্যের মোট রাজস্বের যোগফলের সমান এবং ক্যালিফর্নিয়া ও নিউ ইয়র্ক ছাড়া অন্য সকল রাজ্যগুলির মোট সংগৃহীত রাজস্বের চেয়ে বেশি!

কোনো সন্দেহ নেই যে নানা বিশিষ্ট কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন অর্থসমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছে যা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, সোশ্যালিস্ট ব্যবস্থায়, তার কাছাকাছি পৌঁছলেও মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণের বিচারে আমেরিকা এখনও এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু সেখানেও "সমৃদ্ধ সমাজ" সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অধ্যাপক গলব্রেথ (যিনি কিছু আগে ভারতে মার্কিন দূত ছিলেন) বলতে বাধ্য হয়েছেন যে "ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য" এবং সাধারণ ব্যবস্থায় গ্লানি"-র মধ্যে একটা "ভয়ঙ্কর অসঙ্গতি" রয়েছে। বিশেষত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেকারী নিদারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বাঙ্গীন কল্যাণের ভিত্তিতে পরিকল্পনা না

থাকায় শিক্ষাব্যবস্থা বহুস্থলে ভগ্নোন্মুখ। চিকিৎসা পূর্বেও ব্যয়বহুল ছিল, আজও নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার চিকিৎসার প্রয়োজন ঘটলে একান্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অল্পবিত্তদের বাসগৃহ বহু ক্ষেত্রেই ভগ্নপ্রায় কিংবা সেগুলি চুরমার করে সেখানে রাস্তা বানানো হয়েছে বা সে জায়গা অন্য কোনো কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সে দেশের দরিদ্র যারা—তাদের অনেকেই নিগ্রো, কিংবা তাদের আদিবাস মেক্সিকো, পুয়ের্তোরিকো প্রভৃতি দেশে। এদের জীবনের সর্বাঙ্গীন বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছে এমন এক রোষরঞ্জিত হতাশা, যার অপরাজেয় প্রকাশ দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সমৃদ্ধতম দেশে "কৃষ্ণাঙ্গের শক্তি" ("Black Power") আন্দোলনের প্রচণ্ড অভ্যুদয়ে। 'Political Affairs' (New York, April 1960) মাসিক পত্রে Herbert Aptheker-এর প্রবন্ধে উদ্ধৃত রয়েছে মার্কিন অর্থনীতি ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, বিশ্ববিখ্যাত লেখক Stuart Chase-এর কথা: "যদি কারও দৃষ্টি ডলারের পাহাড় অতিক্রম করে এবং মানুষ বাস্তবিকই কেমন ভাবে দিনাতিপাত করছে তা বোঝে, তাহলে আমার আশঙ্কা যে ১৯২৯ সালের মতোই সেই এক সিদ্ধান্তে হাজির হতে হবে: মার্কিন দেশে সমৃদ্ধি হলো কাহিনীমাত্র, প্রকৃত ঘটনা তা নয়।...আমাদের হাতে ডলার অবশ্য এত আছে যে লোভীর স্বপ্নকেও তা ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু যেসব বস্তু নিয়ে জীবনকে সার্থক করার সম্ভাবনা ঘটে, তার হিসাবে আমরা দরিদ্র এবং দিনের পর দিন আরও নিঃস্ব হতে চলেছি। একথা শুধু নিম্ন আয়ের পরিবার সমূহ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। এ হলো আমাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"

সরকারী এবং আধা-সরকারী হিসেব অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন কোটি লোক দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করে—সে-দারিদ্র্য আমাদের দেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও স্থানকাল বিচারে কম যন্ত্রণাদায়ক একেবারেই নয়। এই তিন কোটির মধ্যে এক কোটি হলো কৃষ্ণাঙ্গ, বহুকাল পূর্বে আফ্রিকা থেকে এনে যাদের পূর্বপুরুষদের ক্রীতদাস করে রাখা হয়েছিল। সে দেশে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা আটাশ লক্ষ, যার মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ নিগ্রো। অর্ধ-বেকারের সংখ্যা হলো বিশ লক্ষ; বেকার ও অর্ধ-বেকার মিলে যে আটচল্লিশ লক্ষ, তার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ বারো লক্ষ হলো তরুণ। সমাজের চেহারার কিছুটা আভাস এ-থেকে মিলবে।

একচেটিয়া স্বার্থের মালিকরা মতলব করে মানুষের রুচিতে এবং চরিত্রে

যেন এক প্রকার বিকার ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞাপনের চটকে ভুগে মানুষ বাহারী কতকগুলি জিনিস কিনতে না পারলে বেঁচে থাকা বৃথা ভাবতে শিখছে। মোটর গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, কাপড়কাচা কল ইত্যাদি জীবনকে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ করে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেগুলি কিস্তিতে কিনতে গিয়ে অনেক উদ্ভট ঘটনা ঘটে। বহুকাল ধরে কিস্তিতে দাম দিয়ে ঐগুলি বাড়িতে আনার ফলে অনেক পরিবার দেখে যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যয় বহনে তারা অপারগ, কারও অসুখ-বিসুখ হলে তো মহাসঙ্কট, রোগ মারাত্মক না হলেও চিকিৎসার ব্যয় একটা মস্ত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম জার্মানীতে Geissler নামে এক লেখকের উপন্যাসে দেখা যায় এক অদ্ভুত পরিস্থিতি—মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাওয়ার শর্তে মোটর গাড়ি আর কাপড়-কাচা কল কেনা হয়েছে, কিন্তু ছোট বাচ্চার জন্য দরকার ঠেলা গাড়ি (perambulator) যেটা কিস্তিবন্দি কায়দায় বিক্রয় হয় না এবং সেজন্য ঘরে টাকা নেই। একজন মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক Harvey Swados তো লিখেছেন যে সেদেশে মোটর গাড়ি হয়েছে যেন ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতীক। "শুধু তাই নয়, যেন তার পরিবর্তে পাওয়া এক বস্তু" (a symbol of freedom, almost a substitute for freedom.")। বাড়ি, গাড়ি, 'ফ্রিজ' ইত্যাদি কিনতে গিয়ে বিপদও কম হয় না; ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১৭,০০০ ব্যক্তিকে কিস্তি দিতে না পারার অপরাধে সাধের ঐ-সমস্ত জিনিস ফেরৎ দিতে হয়েছিল।

অর্থবলে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন যাদের, তারা নিজের দেশের মানুষকেও ঐভাবে ভুলিয়ে রাখতে চায়। নিয়মিত রোজগার, একটা গাড়ি, মাঝে মাঝে শখ করে বাগান দেখা, লাইফ ইনসিওরেন্সটা ঠিক রাখা, দুটো টেলিভিশন সেট সাজিয়ে প্রতিবেশীদের ওপর টেক্কা দেওয়া—এত রকম ব্যস্ততার পর মানুষ আর সময় পায়-কিসের জন্য? "এ-সব করতে হলে আর বড় বড় ব্যাপারে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়—কাঁহাতক ভাবতে যাবে আফ্রিকাতে কত লক্ষ লোক না খেয়ে মরছে?" এই জবাব এসেছিল তরুণ এক শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের কাছ থেকে। এ-ধরনের অধঃপতনের কথাই মার্কস বহু আগে বলেছিলেন—অর্থসর্বস্ব সমাজে মানুষ ক্রমে তার মহিমা হারিয়ে ফেলতে থাকবে, সে আটক পড়বে "শুধু দিন-যাপনের গ্লানি"-এর মধ্যে, "সহে না, সহে না আর" বলে রবীন্দ্রনাথের মতো উদাত্ত আবেগ নিয়ে সে আর এই ক্ষুদ্রতাকে পরিহার করতে চাইবে না।

'Fortune' হলো মার্কিন দেশের বিখ্যাত এক পত্রিকা। তাতে

তালিকা বেরিয়েছিল ১৯৫৪ সালে জগতের সবচেয়ে বড়ো একচেটিয়া শক্তিধর প্রতিষ্ঠানের। তালিকাভুক্ত সাতশোর মধ্যে পাঁচশো ছিল মার্কিন প্রতিষ্ঠান। প্রথম একশোর মধ্যে মার্কিন ছিল ছেষট্টি, পশ্চিম জার্মানির ছিল বারো, ব্রিটেন নয়, ফ্রান্স চার, জাপান চার, হলাণ্ড ইতালি ও সুইটসারল্যাণ্ড প্রত্যেকে এক এবং ইংরেজ-ওলন্দাজ যুক্ত প্রতিষ্ঠান দুই। আমাদের দেশে টাটা-বিড়লা প্রমুখ মহারথীরা এদের তুলনায় চুনোপুঁটি বিশেষ, কিন্তু ভারতের পরিস্থিতিতে তারা প্রকাণ্ড তো বটেই। সবাই তো আমরা শুনে শুনে কান পচিয়ে ফেলার উপক্রম করেছি যে এদেশের পঁচাত্তরটি পরিবারের হাতে জাতীয় সম্পদের বহুলাংশ কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। হয়তো বা এ-সব কথা মনে রাখলে "মার্কস-এর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে" জাতীয় গুরুগম্ভীর মন্তব্য বরদাস্ত করা একটু কঠিন হবে। কোনো সন্দেহ নেই যে মার্কস-এর প্রতিভাধর দূরদৃষ্টি ভুল করেনি—বর্তমান জগতের সবচেয়ে জাজ্বল্যমান বাস্তব কি এই নয় যে ধনিক দেশগুলিতে আছে একদিকে অগাধ ঐশ্বর্য, অপর দিকে নিদারুণ দারিদ্র্য ? এ দারিদ্র্য মার্কিন দেশে নেই যে বলে, সে হয় চোখ-কান বুজে চলে, নয়তো জানে না যে জীবনযাত্রার মান গড়ে বৃদ্ধি পেলেই সব মুশকিল আসান হয় না। আমেরিকার সমাজদেহের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি আজ ফেটে পড়ছে বিপুল বিচিত্র বিক্ষোভে।

মার্কসবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়ে তাই বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রবক্তাদেরও মাঝে মাঝে থমকে যেতে হয়। কিন্তু আবার তাঁরা নিজেদের সামলে নিয়ে অভ্যস্ত বুলি আওড়াতে থাকেন। কিন্তু তথ্য সম্বন্ধে নিষ্ঠা থাকলে বুঝতেই হবে আজকের দুনিয়ার অবস্থা। 'Pick's World Currency Report (1960)'-এ ষোলটি দেশকে "ধনী" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ যেখানে গড় মাথা পিছু মুদ্রার লেনদেন হলো প্রতি বৎসরে ১০০ ডলারের বেশি। এই ষোলটি দেশে গরিবের অবস্থা কিছু ফিরেছে নিশ্চয়। কিন্তু তার বিনিময়ে দারিদ্র্যকে যেন "রপ্তানি" করে পাঠানো হয়েছে অন্য দেশে, অর্থাৎ ভারতের মতো দেশে। ধনতন্ত্র একটা আন্তর্জাতিক শক্তিরূপেই যখন কাজ করে, তখন সারা দুনিয়ার হিসাব না নিয়ে মার্কস-এর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় কেমন করে ? কোন সাহসে ধনতন্ত্রের পক্ষভুক্ত পণ্ডিতেরা বলেন যে সঙ্কট আর ঘটবে না এমন ব্যবস্থা ধনতন্ত্র করেছে ? জগৎ জুড়ে অর্থনৈতিক 'পিছপাও হওয়া'র (Recession) কথা তো বেশ ভালোভাবেই শোনা যাচ্ছে। সব চেয়ে

"ধনী" দেশকে অপরিমিত শক্তি ও অর্থ ব্যয় করতে হয় যুদ্ধে এবং যুদ্ধায়োজনে—কারণ পরদেশগ্রাস ও আনুষঙ্গিক সর্ববিধ দুষ্কর্ম সাধন করে পৃথিবীর বড় একটা অংশকে তাঁবে না রাখলে তাদের অর্থ ও সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। নইলে, যে ভিয়েতনাম যুদ্ধে অসম্ভব মোটা অঙ্কের টাকা খরচ হচ্ছে, সেই যুদ্ধ বন্ধ হলে মার্কিন ধনপতিদের পায়ের তলার মাটি সরে যাবে, এ ভয় কেন?

যাই হোক, মার্কসবাদের ধারে-কাছেও যিনি আসেননি, ইউনাইটেড নেশনস-এর সেক্রেটারি-জেনারেল সেই উ-থাণ্ট বলেছিলেন (৫ই জুলাই ১৯৫৬)· যে বর্তমানে ইঙ্গিত যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় ১৯৫০ সালে পৃথিবীতে আজকের চেয়ে ঢের বেশি লোক বেকার হয়ে পড়বে, ঢের বেশি লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পাবে। সম্প্রতি এক ভীতিপ্রদ বই বেরিয়েছে, যার আখ্যা হলো 'Famine 1960'—জগৎ জুড়ে বুঝি দুর্ভিক্ষ আসছে! উ-থাণ্ট বলেছিলেন: "যে সব দেশ এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে, তাদের দুঃখ ক্রমশ বেড়ে চলছে; এই দশকের শেষভাগে তা আরও বাড়বে বলে ভয় হয়।" ইউনাইটেড নেশনস-এর খাদ্য ও কৃষিসংস্থার (F. A. O.) প্রাক্তন ভারতীয় অধ্যক্ষ শ্রী বি. আর. সেন কিছুদিন আগে (আগস্ট ১৯৫৭) বলেছিলেন: "আজ পৃথিবীতে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি মানুষ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম খেতে পায়, আর গোটা মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ অন্তত ১০০ কোটি) যে খাদ্যগুলি খাওয়া উচিত তা পায় না।" তিনি আরও জানান—এ ছাড়া মুশকিল হয়েছে যে গত দশ বৎসরে পশ্চাৎপদ দেশগুলির মাথাপিছু বার্ষিক আয় বেড়েছে এক ডলার, অথচ ঐ সময়ে অগ্রগামী দেশগুলির ক্ষেত্রে মাথাপিছু বার্ষিক আয় বেড়েছে বিশ ডলার! অসঙ্গতির ওপর অসঙ্গতি জড়ো হয়ে বর্তমান জগতের চেহারা যা হয়েছে, মার্কস-এর অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আর কোন্ সূত্র থেকে তাকে আজ বোঝা সম্ভব?

'Pick's World Currency Report'-এ ৩৯টি দেশকে বলা হয়েছে "দরিদ্র", এদের মধ্যে ভারতের স্থান হলো ২৯তম। আমাদেরও অবশ্য রাঘব-বোয়াল ধনপতি রয়েছে, কিন্তু তাদের যত দর্প দেশের ভিতর, বাইরে তারা কেঁচো, তারা বিদেশী ধনপতিগোষ্ঠীর তুচ্ছ অনুচরবৃত্তি করে থাকে এবং ফলে দেশের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটায়। যাই হোক, এখানে স্মরণ করা যাক National Council of Applied Economic Research-এর পক্ষ থেকে পরিচালিত এক অনুসন্ধানের কথা। তাতে দেখা গিয়েছিল যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী

পরিবারগুলির ক্ষেত্রে মাথাপিছু দৈনিক আয় ৬৭ পয়সা হলেও, একেবারে নিচে তেতাল্লিশ লক্ষ পরিবারের (অর্থাৎ অন্তত বিশ কোটি লোকের) মাথাপিছু দৈনিক আয় মাত্র ২৬ পয়সা। মার্কস-এর কথা মনে পড়ছে: "পুঁজির সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণারও সঞ্চয় হতে থাকে।"

রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু হলেন পোপ। ঐ পদের একজন প্রাক্তন অধিকারী ১৯৩৬ সালে বলেছিলেন: "আজকের দিনে দুঃখকষ্ট যে বেড়ে চলেছে, তার উপশমের দুটো উপায় আছে—প্রার্থনা আর উপবাস। যারা ধনী তারা কিছু ভিক্ষাদান করে এই উপবাসব্রত পালন করুক। আর যারা গরিব, যারা আজ বেকারি ও খাদ্যাভাবের কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন, তারা ধনীদেরই মতো প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব নিয়ে স্থির করুক যে পরমেশ্বরের অপরিজ্ঞেয় অথচ চির করুণাময় পরিকল্পনা অনুসারে সমাজের যে স্তরে তাদের স্থান নির্দিষ্ট, সেই স্তরে থাকার দরুন বর্তমান দুঃসময় যে কষ্ট তাদের উপর চাপিয়েছে—তাকে আরও বেশি ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হবে।" ধনী কিছু ভিক্ষা দিক—তার যে-প্রাচুর্যের ভিত্তিভূমি হলো দারিদ্র্য, সেই প্রাচুর্যের একটু ভগ্নকণা প্রসাদ দিক। আর যে দরিদ্র, তার তো 'ভগবান' বিনা সম্বল নেই, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভগবানের নাম নিয়েই সে দুঃখকষ্ট সহ্য করে চলুক।

মহামান্য পোপের উপদেশ কিন্তু মানুষ মানবে না, মানতে পারে না। সে জেনেছে, বিপ্লবী গুরু কার্ল মার্কস-এর সত্যসন্ধ শিক্ষা থেকে জেনেছে—শোষণের অবসান যারা ঘটাবে, সেই শ্রেণীকে শোষকের দল বুর্জোয়া দুর্গে নিজেরাই সৃষ্টি করেছে। কারণ যুগে যুগে কংসের কারাগারেই কংসের নিপাত-কর্তার জন্ম হয়ে থাকে।

ধর্ম, শুভবুদ্ধি ও মার্ক্স্‌বাদী সংগ্রাম

সম্প্রতি "মূল্যায়ন" পত্রিকায় ধর্ম, মানবপ্রেম, মানবিকতা ইত্যাদি বিষয়ে মার্কস্‌বাদের প্রকৃত বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করে আনন্দ পেয়েছি। আমাদের দেশে এমন দুর্দিন চলেছে যখন মার্কসীয় চিন্তা ও কর্মে যাদের ব্যাপৃত থাকার কথা তারা যেন আত্মকলহের চাপে সর্বজনের সমক্ষে সতেজে মার্কস্‌বাদের সৃজনশীল ভূমিকাকে তুলে ধরতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে "মূল্যায়ন" এর পৃষ্ঠায় আলোচনার সূত্রপাত দেখে আমার বন্ধু শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এবং তাঁর সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং সেজন্যই 'মার্কস্‌বাদ ও ধর্ম' বিষয়ক বিচারে স্বল্প অংশ গ্রহণের দুঃসাহসে নামছি।

বারবার মনে রাখা দরকার যে মার্কস্‌বাদ এবং বিশেষ করে কার্ল মার্ক্‌স স্বয়ং কখনও ধর্মকে হেসে উড়িয়ে দেন নি, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন নি, জবরদস্তি করে তার উচ্ছেদের কথা ভাবেন নি, বরঞ্চ পরম শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে তার পর্যালোচনা করেছেন। "ধর্ম হল জনগণের পক্ষে অহিফেন সদৃশ", মার্কসের এই বহু উদ্ধৃত বাক্য যেখানে উচ্চারিত, সেইখানেই পর পর এমন সুগ্রথিত শব্দ বিন্যাসে তাঁর বাণী বিঘোষিত, যার গহন গাম্ভীর্য যেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম রচনার সঙ্গেই তুলনীয়:

"ধর্ম হল নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, যে জগৎ দয়াহীন, ধর্ম তার দাক্ষিণ্য; যে পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিকতা নেই, ধর্ম তার আত্মা। তাই যে দুঃখ উপত্যকায় ধর্মের দিব্য জ্যোতির আশ্বাসে মানুষের পরিক্রমা, ধর্মের সমালোচনা হল সেই দুঃখ উপত্যকারই সমালোচনা। যে কাল্পনিক কুসুমাবলী মানুষের বন্ধন শৃংখলকে অলংকৃত করে রাখে, এই সমালোচনা তাদের ছিন্নভিন্ন করেছে। এই লক্ষ্য এই নয় যে মানুষ তার শিকল পরে থাকুক অথচ মোহাবেশের আরামটুকু থেকেও বঞ্চিত হোক; লক্ষ্য হল এই যে মানুষ যেন তার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে পারে আর আহরণ করে এমন ফুল যা হল জীবন্ত। ধর্মের সমালোচনা আনে মোহমুক্তি, আর মোহমুক্তির পর পূর্ণ সম্বোধি পেয়ে মানুষ চিন্তা, কর্ম এবং আত্মসত্তা গঠনে ব্যাপৃত হতে পারে—মানুষ তখন নিজেই

নিজের সূর্য, স্বকীয় অক্ষপথে তার গতিবিধি। ধর্ম হল সেই কপট সূর্য যা পূর্ণ আত্মচেতনা থেকে বঞ্চিত মানুষের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমণ করে থাকে।"

বর্তমান জগতের মনীষী হোয়াইট্‌হেড একবার বলেন যে "মানুষ তার একাকিত্বের সঙ্গে যা নিয়ে বোঝাপড়া করে, তা হল ধর্ম"। ব্যক্তিমানসের বিবিধ ব্যঞ্জনাকে যদি তার পরিবেশ থেকে নিঃসৃত ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কল্পনা করা যায় তো এ কথার অর্থ অবশ্যই আছে। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে জানা যায় যে ধর্মের প্রকৃতি ও প্রভাব প্রকৃষ্টভাবে বোঝা সম্ভব যেখানে মানুষ যূথবদ্ধ, যেখানে সমাজের অস্তিত্ব, যেখানে নিত্যকর্ম ও বিশ্বাস ও চিত্তবৃত্তিক্ষেত্রে বহুজনের সংহতি। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম হল সেই বস্তু যা সমাজকে "ধারণ" করে আছে। আর মার্ক্‌স্‌ দেখলেন যে ইতিহাসের যখনই অভ্যুদয় তখন থেকেই ধর্ম যে সমাজকে "ধারণ" করে রেখেছে, যে সমাজে অধিকার ও সুযোগের বৈষম্য স্বীকৃত। যে সমাজে "কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ" যেন একটা প্রাকৃতিক বিধানেরই মতো অমোঘ ও অকাট্য বলে মেনে আসা হয়েছে। এ জন্যই দেখি বলা হয়েছে যে ধর্মের তত্ত্ব গুহামধ্যে নিহিত রয়েছে, তাকে ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে আনা কঠিন। আর "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—মহাজনেরা যে পথে গেছেন, সেটাই হল সকলের পক্ষে প্রকৃষ্ট রাস্তা। ধর্মের প্রভাব এই ভাবে মানুষকে গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত করেছে। যা কিছু চলে আসছে তাকে মেনে যাওয়ার প্রয়োজনকে বড় করে তুলে ধরেছে। বিধি-নির্ধারিত রীতিতে সমাজ চলতে থাকবে, যে ঋষিরা সামাজিক জীবনে নিত্যকর্ম পদ্ধতি স্থির করে দিয়েছেন তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, ঈশ্বর অনুপ্রেরিত বলে তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা মহাপাপ, এই কথা সাধারণ মানুষকে ধর্ম বুঝিয়েছে।

তাই সব দেশে ধর্মব্যবস্থার মধ্যে যারা কর্তৃপক্ষীয় হয়ে বসেন, তাদের কায়েমী স্বার্থও সমাজে প্রখর হয়ে উঠেছে। খ্রীষ্টান ধর্মের আদি ভক্তেরা এক-ধরনের কমিউনিজমের কথা ভাসা-ভাসা ভাবে ভেবেছিলেন, বিশ্বপিতার চোখে সবাই এক। সুতরাং সবাই সমান সুযোগ পাবে কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্র একে পিষে মারে। আর তারপর "রাজার প্রাপ্য রাজাকে দাও" ("Render unto Caesar the things that are Caesar's") প্রভৃতি যীশুখ্রীস্টের যে সব বচন ছিল সেগুলিকে সামনে টেনে এনে তখনকার সমাজপতিদের সঙ্গে ধর্মযাজকদের মিতালি ঘটে, খ্রীষ্টান পাদরীরা মঠে ও গির্জায় ক্রমশ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বসেন। ইয়োরোপের

মধ্যযুগে টাকা লেনদেন ব্যাপারে পর্যন্ত এই সংসারবিরাগী ধর্মযাজকেরা একটা বড় অংশ গ্রহণ করেন, বহু উত্থানপতনের মধ্যেও রাষ্ট্রশক্তির প্রতি আনুগত্য রেখে চলেন আর সাধারণ, বঞ্চিত মানুষের অত্যাচার নিরসন করার উদ্যমকে তারা নষ্ট করে দেন। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে ইয়োরোপের ইতিহাসে—যখনই ধর্মবিশ্বাসী সরল মানুষ নীতিকথাকে জীবনের বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছে, উন্‌স্টান্‌লির মতো সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডে যখন তারা বলেছে যে মাটি যারা চাষ করে তারাই মাটির মালিক এই তো ভগবানের বিধান, তখন হোমরা চোমরা পাদরীরা শুধু যে ধমক দিয়ে উঠেছে তা নয়, রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে নির্মমভাবে তাদের পিষে মেরেছে। এ-ব্যাপারে ক্যাথলিক-প্রটেস্টাণ্ট ভেদাভেদ মিলিয়ে যায়। রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ধ্বজাধারী মার্টিন লুথর জার্মানীর চাষীরা ষোড়শ শতাব্দীতে জায়গীরদারী দৌরাত্ম্য হুকুম না করে বিদ্রোহ করেছিল বলে অকথ্য ভাষায় তাদের নিন্দা করেন আর সমাজপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের দমনে সহায়তা করেন। এদেশেও একশো বছরের কিছু বেশি আগে দেখা গেছে যে ওয়াহাবি (বা ফরাজি) নেতৃত্বে সাধারণ মুসলমান কৃষক যখন মোল্লা আর ওয়াকিফ্‌দের বিরুদ্ধে লড়ছে তখন ধর্মধ্বজীরা তাদের ওপর একেবারে খাপ্পা। আবার বছর চল্লিশেক আগে যখন জনতা তারকেশ্বরের মতো বিপুল সম্পত্তির মালিক মোহন্তের বিরুদ্ধে লড়ছে, তখনও সেই একই দৃশ্য।

মার্কসের শিক্ষা আমাদের চোখ খুলে দেখিয়েছে যে ধর্ম কেবলই মানুষকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে এই বলে যে জীবনের অজস্র বিড়ম্বনা দূর করার চেষ্টার বদলে তাকে স্বীকার করে নেওয়াই হল ধার্মিকের লক্ষণ, আর স্তোক দিয়েছে ইহ জীবনের দুঃখ, লজ্জা, অপমানের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে কিম্বা জন্মান্তরে শান্তি ও সুখের আশ্বাস ঝুলিয়ে রেখে। যীশুখ্রীস্টের ধর্মবাণীর যে বিবরণ প্রধান শিষ্যেরা লিখে গেছেন তা থেকে স্পষ্ট যে তখনকার অর্থব্যবস্থায় যারা ধনী তাদের সম্পর্কে বারবার কষাঘাত করে কথা বললেও তিনি সকলকে সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলতে বলেছেন আর গরীবকে প্রবোধ দিয়েছেন যে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী তো তারা। ভগবানের আশীর্বাদ তাদের উপরই পড়ছে। ইসলাম ধর্মের ঐক্য ও সাম্যমন্ত্র জনজীবনের দারিদ্র্য ও গ্লানি মোচন করতে পারে নি বলে বেহেস্ত্‌-এর প্রলোভন দেখিয়ে গরীবকে আমীর-ওমরাহদের হুকুমবরদারী করানোর ব্যবস্থা সমাজ করে রেখেছে। শতাব্দীর পর

শতাব্দী ধরে যে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে হিন্দু জনতা কালাতিপাত করে এসেছে। তার জ্বালা উপশমের কাজে জন্মান্তরবাদকে লাগানো হয়েছে—হয় পুণ্যবলে পুনর্জন্মের শিকল থেকে মুক্তি মিলবে, কিম্বা ইহজন্মে কর্মফলের অনুপাতে আবার জন্মাতে হবে জীবরূপে এবং হয়তো শতকোটি জন্মের পর মুক্তি আসবে, মোটামুটি ভাবে এই হল কথা। এর পরিষ্কার অর্থ হল: ভবিতব্য বিধিনির্দিষ্ট। সুতরাং যা ঘটছে তার বিরুদ্ধাচরণ কোরো না; আশ্বাস রেখো যে মায়াময় জীবনে যা কিছু দেখছ তা হল আসলে অলীক, সুখ আর দুঃখ চক্রের মতো বদলে চলেছে, এর জাল কাটিয়ে মোক্ষ লাভের চেষ্টাই হল কর্তব্য, তাই দেবদ্বিজে ভক্তি রেখো। রাজশক্তিকে মেনে চলো, জাতিধর্ম পালন কোরো এবং শেষ অবধি জেনো, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। আর "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"। মানুষের অনিবার্য অসন্তোষকে প্রশমিত করার জন্য এসেছে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কথা, আর যখন সেই পরমেশ্বরের বিধানকে কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা চলে না তখন বোঝানো হয়েছে যে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার লীলা হল রহস্যময়, তার গূঢ়ার্থ তো আমরা সবাই বুঝবার আশা করতে পারি না!

বাংলাদেশে কোম্পানীর আমলে দুঃখী বাঙালীর মনের কথা বলেছিলেন রামপ্রসাদ সেন তাঁর উপাস্য কালীকে উদ্দেশ করে:

> করুণাময়ি, কে বলে তোরে দয়াময়ী?
> কারও দুগ্ধেতে বাতাসা, আমার এমনই দশা,
> শাকে অন্ন মেলে কই?
> কারে দিলে ধন-জন, মা, হস্তী-অশ্ব-রথচয়,
> ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
> আমি কি তোর কেউ নই?
> কেউ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্‌নি হই,
> মা গো, আমি কি তোর পাকা ক্ষেতে
> দিয়াছিলাম মই?

স্বদেশী-বিদেশী শোষণের তৎকালীন মারাত্মক ত্র্যহস্পর্শে জর্জরিত রামপ্রসাদ কিন্তু সরল মনে তার পরের পদেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন:

> দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপাল বুঝি অম্‌নিসই।
> ওমা আমার দশা দেখে বুঝি শ্যামা হলে পাষাণ ময়ী।

কেন যে মার্কস্ বলেছিলেন ধর্মের মধ্যে মিশে রয়েছে দলিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, আর ধর্মের আফিম গিলিয়ে মানুষকে যুগ যুগ ধরে ঝিমিয়ে রাখা হয়েছে, তা বুঝতে দেরি হয় না। আর সমাজের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ধর্মের মহিমা যাই হোক না কেন, সমাজ জীবনের নিকষপাথরে ঘষে দেখলে তাঁর কথা অকাট্য।

* * *

'অকাট্য' শব্দটি লিখেই কিন্তু মনে আসছে মার্কস্বাদ এবং মার্কস্বাদীদের সম্বন্ধে একটি সাধারণ সমালোচনা যাকে একেবারে ভিত্তিহীন বলা সত্যের প্রলাপ হবে আশঙ্কা করি। মার্কস্বাদীদের প্রায়ই শুনতে হয় যে নিজেদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের নিশ্চিতি এমনই প্রচণ্ড যে তারা যেন একেবারে নিজস্ব এক সত্য ধর্মে অবিচল হয়ে বসেছে, যুক্তি তর্কের ভাষায় তাদের সঙ্গে আদান প্রদান আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়, এমন সন্দেহাতীত তাদের বিশ্বাস যে গণ্ডারের চামড়ার মতো প্রশ্নের বা সেখানে লেগে শুধু ঠিকরে যায়, দাগ কাটতে পারে না। কার্লমার্কস্ নিজে ছিলেন নির্ভয় তথ্যসন্ধানী ; বৈজ্ঞানিকের মন নিয়ে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন আপ্তবাক্যে আস্থা তাঁর ছিল না, যুগযুগান্তের অজ্ঞান, প্রমাদ, অন্যায় ও আশঙ্কা যে সমাজ সত্যকে তমসাবৃত করে রেখেছে তাকে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করার অবিচল সংকল্প হল তাঁর জীবনের ইতিহাস। এমন চিন্তা নিশ্চয়ই তাঁর মনে স্থান পায় নি যে সর্ববিষয়ে চরম সত্য তিনি আবিষ্কার করে যাচ্ছেন এবং তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসায় পূর্ণচ্ছেদ ঘটবে, তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করেই সকল চিন্তার উপসংহার মিলবে, সকল সন্দেহের নিরসন হবে। অবশ্য মার্কস্ শুধু যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম ছিলেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন প্রথম 'ইণ্টারন্যাশনালের' পুরোধা, সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সর্বাগ্রগণ্য হয়েও (এবং হয়তো ঠিক সেই কারণেই) আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগ্রামের পথ পরিচায়ক। এজন্য তাঁকে আন্দোলন সম্পর্কে নির্দেশ দিতে হত, যে নির্দেশ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে বহুজনের বিপুল দুঃখক্লেশের আশঙ্কা। সন্দেহাতীত না হলে অটল পথনির্দেশ সম্ভব নয় ; তিনি সন্দেহাতীত না হয়ে নির্দেশও দিতেন না। তাই বিপ্লবী মার্কসের অখণ্ড, অনাবিল আত্মবিশ্বাস সমসাময়িক অনেকের কাছে অহমিকা বলে মনে হয়েছে ; মার্কসের কথায় সারা ইয়োরোপে জুজুর ভয় পাওয়া সমাজপতির দল তাঁকে আবার অহঙ্কারী বলে ধিক্কার দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে চেয়েছে। কিন্তু জোর করে বলা যায় যে তৎকালীন

অবস্থায়, সব দিক পর্যালোচনা করে, জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী যা নির্ভুল মনে হয়েছে তাকেই মার্ক্‌স্‌ নির্ভুল বলেছেন—সর্বকালের জন্য সর্ববিষয়ে চরম, অকাট্য সত্যবাক্য উচ্চারণ করে যাচ্ছেন মনে করার মতো মানসিক ক্ষুদ্রতা তাঁর ছিল না। সত্যদ্রষ্টা ঋষির জ্ঞানচক্ষুর কাছে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয় তাকে সত্য বলতে কুণ্ঠিত হওয়া তো সম্ভব নয়—এজন্যই তো "শৃণ্বন্তু বিশ্বে" বলে সম্পূর্ণ অন্তস্তরের উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে। এরই সঙ্গে তুলনীয় হল মার্ক্‌সের সাধনা, যদিও তার ক্ষেত্র কল্পিত তুরীয় রাজ্য না হয়ে ছিল আমাদেরই এই একান্ত প্রিয় অথচ বহুবিড়ম্বিত মানবজগৎ।

তবু শুনতে হয় যে মার্ক্‌সবাদীরা নিজেদের সর্বজ্ঞ ভাবে, আর মনে করে যারা মার্ক্‌সবাদ মানে না তারা অজ্ঞান, সুতরাং উভয়পক্ষে কথোপকথন (dialogue) অসম্ভব। যে জানে না, সে কেমন করে যে জানে তার সঙ্গে তর্ক করবে? যাকে বলা হয় 'ইডিয়লজি', যে মতবাদ শুধু সাময়িক ও প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত নয়। যার সঙ্গে সযত্ন-আহৃত বিশ্ববীক্ষার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, সেই 'ইডিয়লজি'-র ক্ষেত্রে সহঅবস্থান অচল, এই কথার অর্থ কঠোরভাবে করলে হয়তো অভিযোগ মানতে হবে। কিন্তু চলমান জীবনে, সতত সঞ্চরমান্‌ এই বিশ্বে কোন সিদ্ধান্তই সূত্রাকারে কণ্ঠস্থ ও স্থাণু অবস্থায় থাকার জন্য অভিপ্রেত নয়। মার্ক্‌স্‌বাদী যা কিছু জ্ঞাতব্য তা আয়ত্ত করে বসে আছে আর অপর সকলে শুধু অন্বেষণ করছে, এ কথা বল্‌লে মার্ক্‌স্‌বাদেরই অসম্মান ঘটে। সত্যের সন্ধানে কি সমাপ্তি কখনও আসে? মার্ক্‌স্‌ কি এই শিক্ষা দিয়েছেন যে আগামী দিনের সূর্যোদয়ের মতোই নিশ্চিতভাবে শ্রেণীসমাজের অবসান হয়ে সাম্যবাদের আবির্ভাব ঘটবে, সুতরাং ইতিমধ্যে, সাম্যবাদের বিজয় পূর্বনির্দিষ্ট বলে, শুধু কালাতিপাত করে গেলেই তো যথেষ্ট, কায়মনোবাক্যে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা না করলেও তো চলবে? এই চলার পথেই তো কত নতুন জ্ঞান, নতুন ধারণা, নতুন অনুভূতি আহরণ সম্ভব, আর তা হবে কেমন করে যদি মননের ক্ষেত্রে আদানপ্রদানের সম্ভাবনা ও সার্থকতাকে আমরা অস্বীকার করি? শোষণের কারাগার থেকে মানুষ যখন মুক্তি পাবে, শ্রেণীহীন সমাজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র ও তদনুরূপ শাসনপ্রকরণের অস্তিত্ব যখন নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়বে, তখন কি ইতিহাসে পূর্ণচ্ছেদ দেখা দেবে। মানুষের এত যুগের অশান্ত অস্থির পরিক্রমা কি তখন স্তব্ধ হয়ে যাবে, বিশ্বের গতিচ্ছন্দ কি তখন একেবারে মৌন? বরঞ্চ আমরা কি বলব না যে ইতিহাস অবশ্যই

থামবে না। তবে আমাদের কর্ম হল আজকের জীবনে সঙ্গতি-অসঙ্গতির দ্বন্দ্ব মিটিয়ে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। পরে তার বিকাশ হলে মানুষ আর তার সমাজ কি নতুন প্রশ্ন তুলবে আর কি ভাবে তার সামঞ্জস্য ঘটাবে তা ভবিষ্যৎকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত? ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মনের মুক্তি সম্বন্ধে গভীর আস্থা রাখতেন বলেই বোধ হয় মার্ক্‌স্‌ একবার "মার্ক্‌স্‌বাদী" আখ্যা সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। আরেকবার তো ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে বীজ পুঁতেছিলেন এই ভেবে যে দানব জন্মাবে কিন্তু জন্মেছে একপাল পোকা!

* * *

মননশীল সমালোচনার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে হলেও অন্য মত ও পথ সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা মার্কসীয় চিন্তায় অনস্বীকার্য বলে মাঝে মাঝে ধর্মের সঙ্গে মার্ক্‌স্‌বাদের তুলনা হয়ে থাকে। ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক মঁনেরো (Monnerot) সম্প্রতি বলেছেন যে বিংশ শতকের ইসলাম হল মার্ক্‌স্‌বাদ; সিদ্ধান্তের ঋজুতা ও প্রখরতার কথা ভেবেই অবশ্য এই অচল উপমা দিয়েছেন তবে বলতে সংকোচ বোধ করা উচিত নয় যে কয়েকটি গৌণ ব্যাপারে ধর্মের সঙ্গে মার্কস-বাদের সৌসাদৃশ্য আছে বৈকি। সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে বলতে হবে যে মুখ্য ব্যাপারে, মূলগত যুক্তি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, আধার ভূত তত্ত্বের বিচারে, প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে মার্ক্‌স্‌বাদের যে প্রভেদ তা অপরিমেয়।

"ক্যাপিটাল" গ্রন্থের ঐতিহাসিক পরিচ্ছেদগুলিতে অপূর্ব উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে মার্ক্‌স্‌ মানবসমাজের বিকাশের বিবরণ দিয়েছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমাজের আদ্যরূপ বিবৃত করতে গিয়ে তিনি এক ধরণের সহজ, সরল সমানাধিকার ভিত্তিক জীবনের কথা বলেছেন, আর দেখিয়েছেন কেমন ভাবে সে জীবন বিকৃত ও খণ্ডিত হল বহুজনের শ্রমসৃষ্ট সম্পত্তি ব্যক্তি বিশেষের অধিকারে চলে যেতে লাগল বলে। একে তিনি অভিহিত করেছেন "আদিম পাপ" বলে, যে আখ্যা খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বে সুপরিচিত। ওলন্দাজ বিদ্বান্‌ অধ্যাপক কোয়ার্ন্ট এরই উল্লেখ করে মার্কসের চিন্তায় খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বের ধারা প্রতিফলিত হয়েছে বলে এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে মার্ক্‌স্‌-এর সমাজ বিচারণায় ধর্ম দর্শনের অনুরূপ কয়েকটি ধারণা রয়েছে—যথা, ইতিহাসের আদিতে মানুষের সমাজ জীবনে সারল্য ও কল্যাণের ভূমিকা, তারপর পূর্বোক্ত "আদিম পাপ"-এর ফলে বৈষম্য ও তজ্জনিত বহুবিধ দুঃখ যন্ত্রণার আবির্ভাব, বিপরীত শক্তির সংগ্রামে যুগ থেকে যুগে বিবর্তন, এবং পরিশেষে সর্বজনের দুঃখ মোচন। তিনি অবশ্য বলেছেন যে

মার্কসের দৃষ্টিতে কোথাও অলৌকিক, অনুভবাতীত, ব্যাখ্যাতিরিক্ত, মানবিক বিচারের উর্ধ্বে অবস্থিত কোন কিছু স্বীকৃত নয়—আরও বলেছেন যে ধর্মকে মার্কস্‌ যে মানুষের দুঃখ দুর্দশা থেকে সঞ্জাত এক স্বপ্ন বলেছেন, তা তাঁর সমগ্র সমাজ দৃষ্টির সঙ্গে সুসমঞ্জস। মার্কসের মতে সমাজে মানুষের "মূলীভূত দুঃখ" (essential misery"-এর সহজ লোকায়ত অনুবাদ হল 'মূলে হা-ভাত') এই যে উৎপাদন ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও অন্যায় তাকে সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ("alienation") করে রাখে ; সে যা উৎপাদন করে, তা সে ভোগ করে না,(ভোগ করে সংখ্যাল্প পরশ্রমজীবী। অনেকের মনে পড়বে "পুঁজি আর মজুরী" শীর্ষক রচনায় মার্কসের প্রজ্জলন্ত বর্ণনা :

"মজুর কাজ করে শুধু বেঁচে থাকার জন্য। যখন সে মেহনৎ করে, তখন মনে হয় না সে বেঁচে রয়েছে। বরঞ্চ মনে হয় যে জীবনের খানিকটা অংশ তাকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে। তার মেহনৎ যেন একটা জিনিস যা সে অপর একজনকে নীলামে বিক্রয় করে দিয়েছে। তাই তার খাটুনির লক্ষ্য সেই খাটুনির ফলে যা উৎপন্ন হচ্ছে তা নয়। যে রেশম সে বুনছে, খনিগর্ভে ঢুকে যে সোনার তাল সে তুলে আনছে, যে অট্টালিকা সে নির্মাণ করছে, তা সে নিজের জন্য উৎপাদন করছে না। নিজের জন্য সে উৎপাদন করছে তার মজুরী। আর তার কাছে রেশম, সোনা আর অট্টালিকা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক কতকগুলি জিনিসে, হয়তো একটা সূতীর জামায়, তামার কয়েকটি পয়সায় আর এঁদোপড়া একটা বাসায়। তার জীবন আরম্ভ হয় যখন তার মেহনৎ শেষ হয়েছে—খাবার টেবিলে বা শুঁড়িখানায় বা বিছানায়। গুটিপোকা যখন রেশম কাটতে থাকে তখন তার উদ্দেশ্য যদি হত শুধু গুটিপোকা হিসাবেই নিজের আয়ু বাড়িয়ে যাওয়া, তাহ'লে আমরা ঐ গুঁটিপোকাতে দেখতে পেতাম মজুরের চমৎকার দৃষ্টান্ত।"

মানুষের নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবেই মার্কস ধর্মকে দেখেছেন। ইহজীবনেই মানুষের স্বস্তি পাওয়া উচিত, কিন্তু সে স্বস্তি থেকে বঞ্চিত বলে সে স্বর্গসুখের স্বপ্ন দেখে। সংসারে মানুষ লক্ষ্য করে বিশৃঙ্খলা আর অন্যায় আর অবিচার ; তাই সে স্বপ্নে ভাবে এক পরমপিতার কথা যিনি অপর এক জীবনে এর প্রতিকার করবেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে সে জীবনের অস্তিত্ব। মানুষ দারিদ্র্যের গ্লানিভরা জীবন যাপন করে বলেই কল্পনা করে যে ঈশ্বরের প্রসাদে পৃথিবীর বাইরে সে শান্তি পাবে। তাই ধর্মচিন্তাকে

অবলম্বন করে মানুষ তার স্বকীয় সত্তা থেকে বিচ্ছেদকে ভুলতে চায়, কিন্তু তার চেষ্টা হয় ব্যর্থ, কারণ তখন সে প্রবেশ করে অলীক স্বপ্নের জগতে। যাইহোক, মার্কসের শিক্ষা হল এই যে একে নির্দোষ স্বপ্ন মনে করা চলে না। এতে বিপদ আছে অনেক, স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে বলে দরিদ্রেরা ইহজীবনে দারিদ্র্যকে দূর করতে ব্যগ্র না হয়ে বরঞ্চ তাকে মেনে নেয়, সমাজের কাছে মাথা পেতে থাকে। ধর্ম বিশ্বাস তাই বাস্তবিকই হল মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি থেকে বিচ্যুতি, কারণ তখন কল্পনায় বশ হয়ে মানুষ মন্দকে ভাবে ভালো, অবিচারের মধ্যে দেখে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি আর দৈন্যের মধ্যে দেখে সম্পদ। মানুষের দুঃখদৈন্য এবং তজ্জনিত আত্মবিচ্ছেদ দূর হলেই আর ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি থাকবে না। মার্কস্‌ তাই চেয়েছিলেন সরাসরি ধর্মকে আক্রমণের পরিবর্তে সমাজে যে উপাদানের ভিত্তিভূমিতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা তাকে সরিয়ে দেওয়া। ধর্মের অসারতা সম্বন্ধে যুক্তি তথ্যাদি অবশ্যই প্রচার হোক, কিন্তু মার্কসের মতে ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসীদের নিপীড়ন না করেই লক্ষ্য সিদ্ধি সম্ভব ও সমুচিত।

মার্ক্স্‌বাদের সঙ্গে ধর্মের মূলগত বিরোধ সত্ত্বেও কোন কোন দিক থেকে ধর্মের সঙ্গে তার তুলনা কেন ঘটেছে তা জানা দরকার। ত্রিশের দশকে জগৎ জোড়া অর্থনৈতিক মন্দা যখন শুধু সোভিয়েত দেশকে স্পর্শ করতে পারেনি, পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ও অগণিত বৈরীর অবিরাম আঘাত সত্ত্বেও সাফল্য যখন সর্বত্র স্বীকৃত না হয়ে পারছে না, ধনিক সমাজে আশাভঙ্গ, অবসাদ ও অসার্থকতাবোধ যখন মননশীল মানুষকে অজ্ঞাতপূর্ব গ্লানিতে অভিভূত করছিল, তখন সকৌতুকে হলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবেই বলা হত—এই নৈরাশ্যের পরিবেশে তিনটি রাস্তা খোলা আছে। ক্যাথলিক ধর্ম অবলম্বন, কমিউনিস্টদলে যোগদান কিম্বা আত্মহত্যা! কমিউনিস্ট পার্টি এবং ক্যাথলিক চার্চে তফাৎ হল এক মেরু থেকে অন্য মেরুর প্রভেদের মতো, কিন্তু মূলগতভাবে গৌণ হলেও কিছু সাদৃশ্য যে আছে তা অস্বীকার করার অর্থ হয় না। দুইয়েরই যে তত্ত্ব, তা সামগ্রিকভাবে মানুষের আনুগত্য দাবী করে। মার্ক্স্‌, এঙ্গেল্স্‌ লেনিন এবং স্টালিন (জীবদ্দশায়) অনুগামী শিষ্যদের কাছে যে মর্যাদা পেয়েছেন, তত্ত্ব, সম্বন্ধে তাঁদের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ অভ্রান্ত ও অবশ্যগ্রাহ্য বলে যে ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তা যে কোন ধর্মগুরু পোপ-এর মনে হিংসার উদ্রেক ঘটালে বিস্মিত হওয়ার নয়। ক্যাথলিকদের (এবং সর্ব ধর্মেরই) আছে 'dogma' যা হল নির্দেশক, যা অবশ্য মান্য, যাকে যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ নিষিদ্ধ, যাকে বিশ্বাস করা হল ভক্তের

কর্তব্য। এর সব চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল কোন পুরুষের অঙ্গস্পর্শ না করে, যীশু-জননী মেরীর গর্ভবতী হওয়া সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের ধারণা। ভিন্নস্তরের নির্দেশক বিশ্বাস হল পোপ-এর অভ্রান্ততা। এমন ধরনের ব্যাপার কমিউনিস্টদের মধ্যে অবশ্য নেই, কিন্তু মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌, লেনিন এবং (জীবদ্দশায়) স্টালিনের সতত অমোঘ ও অভ্রান্ত বিচার শক্তিতে কার্যত যে বিশ্বাস কমিউনিস্ট মহলে প্রচলিত ছিল এবং এখনও অনেকটা আছে, তাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের কথঞ্চিৎ সন্নিকটবর্তী ভাবলে খুব বেশি অন্যায় হয় কি ? ক্যাথলিক চার্চে পোপ, কার্ডিন্যালদের সংঘ এবং বিভিন্ন স্তরের পুরোহিতদের নিয়ে যেন এক ধর্ম-পদ সোপান নির্মিত হয়েছে। কমিউনিস্ট-বিরোধীরা যখন বলেন যে সাম্যবাদীদের মধ্যে একই ধরনের না হলেও অনেকটা অনুরূপ সোপান-ভেদ ("hierarchy".) আছে, তখন প্রকৃত তথ্য দিয়ে সে কথা অপ্রমাণ করা যায়, "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রশাসন" -এর ('democratic centralism') নীতি ব্যাখ্যা করে কোথায় ঐ অপবাদের ভ্রান্তি তা দেখানো যায় বটে, কিন্তু যে চোখে সাধারণ মানুষ বিচার করে থাকে সে চোখে অপবাদকে একেবারে অমূলক ও অভিসন্ধিজাত বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়।

কিন্তু 'এ হ বাহ্যঃ', এ হল বাইরের কথা ; যাকে সাদৃশ্য বলা হচ্ছে, তা প্রকৃতই অত্যন্ত গৌণ। ধর্মের মূল কথা, তার মর্মবস্তু হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বহির্ভূত অথচ তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এক ঐশী শক্তির উপস্থাপনা, যাকে কখনও বাক্য ও মনের অগোচর বলা হয়, কখনও বা ঈশ্বর বলে উপাসনা চলে, কখনও বা প্রেমের ঠাকুর বলে কল্পনা বিলাসের মধ্যে মানুষ তার সর্ব আবেগ নিয়ে অপার্থিব এক সত্তায় নিজেকে নিমজ্জিত করে। আর মানুষ সম্বন্ধে ধর্ম দেহনিরপেক্ষ আত্মার অস্তিত্ব ঘোষণা করে, আত্মার অবিনশ্বরতার কথা বলে, ইহলোকে শিষ্ট ও আচারনিষ্ঠ হয়ে থাকলে পরলোকে সকল আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা ঘটবে জানায়, জন্মান্তরবাদ বা স্বর্গবাস বা অনুরূপ বহু অলীক আশ্বাসের ছটায় বিশ্বাসী হৃদয়কে মুগ্ধ করে। অপর পক্ষে মার্কস্‌বাদ কোথাও তার একান্ত মানবিক ভিত্তিভূমিকে ত্যাগ করে না ; অলৌকিকত্বের সম্মোহন থেকে মার্কস্‌বাদ সম্পূর্ণ মুক্ত ; গূঢ়ার্থবাদে তার লেশমাত্র আস্থা নেই ; মানুষের স্বোপার্জিত জ্ঞান তার অবলম্বন, যে জ্ঞানের সম্ভাবনা হল অপরিসীম, যা আজ বহুক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হলেও এমন শক্তি রাখে যে ত্রিভুবনের সর্ব বস্তু বিষয়েই মানুষ একদিন অবহিত হতে পারে। এই গ্রহবাসী, রক্তমাংসে গড়া, সমাজ-

ভুক্ত, শ্রমশক্তিমান, চিত্তবৃত্তিকুশল মানুষকে নিয়েই মার্কস্‌বাদের সকল চিন্তা, সকল আগ্রহ, সকল আবেগ, সকল কর্ম, সকল সার্থকতা। মার্কস্‌বাদের শত্রুরা ধর্মের সঙ্গে তুলনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে করুক; তাতে মার্কস্‌-বাদের গায়ে আঁচড় পড়ে না।

শুধু বলা হয়তো দরকার যে মার্কসীয় ধারায় যখন মাঝে মাঝে (সম্ভবত অনিবার্য পারিপার্শিক প্রভাবে) যেন একপ্রকার গুরুবাদের আবির্ভাব হয়েছে, যখন বিচার বিশ্লেষণকে পূর্ণ মর্যাদা না দিয়ে নির্দেশক সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক-ভাবে কখনও কখনও আন্দোলনকে বিকৃত করেছে, যখন মুক্ত আলোচনার পথে বাধা সর্বদা অপসৃত এখনও হয়নি, যখন ধর্মধারার অনুরূপ বিকার সমাজ বিপ্লবের পথে কণ্টক হয়ে দেখা যে দেয়নি তা নয়, তখন সচেতন ও সতর্ক থাকার প্রয়োজন বুঝে চলা নিশ্চয়ই অপরাধ বোধ ও মার্কস্‌বাদে অনাস্থা বলে ধিক্কৃত হবে না।

* * *

মার্কসের মূলমন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে তাঁর অবিস্মরণীয় উক্তিতে: "দর্শনশাস্ত্রীরা নানা পদ্ধতিতে জগতের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সব চেয়ে বড় কাজ আমাদের হল এই জগৎকে বদলে দেওয়া"। এ কাজ যে সোজা নয় তা বলাই বাহুল্য; কয়েক হাজার বৎসরের জঞ্জাল সাফ করা কম কথা নয়, আর মাটির পৃথিবীকে একেবারে ধূলিশূন্য যে কখনও করা যাবে বা করলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তাও নয়। যাই হোক, দুনিয়া যে বদলাচ্ছে আর মার্কসের শিক্ষা অনুযায়ী মার্কসবাদী বলে আত্মপরিচয় যারা দেয় তাদেরই উদ্যোগে ও সংগ্রাম ফলে দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ আজ ধনতন্ত্রের বাঁধন ভেঙেছে, আর সদ্যস্বাধীন বহু দেশ পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে বুঝেছে যে স্বাধীনতার পরিপূর্তি একমাত্র সমসুযোগের আয়োজনে, সর্বগুণরাজিনাশী দারিদ্র্যের অপসৃতিতে, সমাজবাদী জীবনে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ থেকে দ্বাবিংশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে, একাধিকবার বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিনিধিরা সম্মেলন করেছেন। বিশদ পর্যালোচনার পর কমিউনিস্টরা প্রাক্তন একটি সিদ্ধান্ত পরিহার করেছেন। সোশালিজম এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীশত্রুর বহুরূপী ষড়যন্ত্র আরও বিকট হবে বলে যারা সোজাসুজি সমাজবাদ-সাম্যবাদের শত্রু কিম্বা যারা ভ্রান্ত আদর্শের বশে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শত্রুপক্ষে সম্মিলিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রাখে ক্ষমাহীন আগ্রহ নিয়ে. তাদের সকলকে

দমন করা উচিত বলে যে সিদ্ধান্ত একদা প্রচলিত ছিল তা পরিত্যক্ত হয়েছে। বরঞ্চ এখন মনে করা হয় যে সোশালিজমের অগ্রগতির আনুষঙ্গিক ফল হল শ্রেণীসংঘর্ষ কঠোরতর না হয়ে ক্রমে হ্রাস পাওয়ারই সম্ভাবনা, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে, কোন বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে সে সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়াও অসম্ভব নয়। এই ধারণা যদি ঠিক হয় তো এর গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণীসংগ্রামের পূর্বতন অবস্থান ও চরিত্রে যদি এমন পরিবর্তন বহু স্থলে এনে থাকে, তাহলে মার্কসবাদী আন্দোলনের সমরনীতি ও ব্যূহকৌশলে যথাযোগ্য রূপভেদ অবশ্য বিচার্য।

ধর্ম এবং ধর্মবিশ্বাসীদের সম্পর্কে মার্কসীয় চিন্তা ও কর্মের নতুন দিক্‌নির্ণয়ের তাই আজ প্রয়োজন আছে। মনে পড়ে ১৯০৮-১০ সালে ম্যাক্সিম গোর্কি, বগদানভ্ এবং লুনাচার্সকি যখন ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় মনোভাব বিচারে নেমে ধর্মকেই সুসংস্কৃত করে নেওয়ার কথা বলেন, ঈশ্বরবিশ্বাসের সারবস্তুর সঙ্গে মানবিক গুণের বিবাদ নেই বলে সাম্যবাদের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যের চিন্তা করতে থাকেন, তখন লেনিন বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করে গোর্কির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু একটা চিঠিতে একথাও বলেছিলেন যে গোর্কি বা লুনাচার্সকির মতো প্রকৃত বিপ্লবের স্বপক্ষীয় এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষ বাস্তব কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্যের যে ব্যাখ্যা করেন, সাধারণ লোক তা করবেন না। তারা সোজাসুজি আবার পুরোনো ধর্মবিশ্বাসেরই মেরামত করা ঘরে ঢুকে বসবেন। বিপ্লবের পথে বাধা বাড়বে। বর্তমানকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিবেচনা করা দরকার যে ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে কার্যক্ষেত্রে বহুজনের সহযোগিতা আন্তরিক ও সার্থকরূপে সোশালিষ্ট সমাজ নির্মাণ এবং তাকে সাম্যবাদী পর্যায়ে এগিয়ে নেওয়ার অভিযানে উপযোজিত করা যায় কিনা। পোল্যাণ্ডের ন্যায় ক্যাথলিকপ্রধান দেশে সেখানকার কমিউনিষ্ট নেতা গোমুলকা কয়েক বৎসর আগে পার্টির সভাতেই বলতে পেরেছিলেন: "ধর্মবিশ্বাস ব্যাপারে রোমান ক্যাথলিক পথে যদি চার্চ চলে তো আমরা আপত্তি করি না। তবে আমরা চাই যে পোলাণ্ডের জনতা তার স্বকীয় গণতন্ত্রকে বিকশিত করার জন্য যে পথে চলেছে, চার্চও সেই পথ অনুসরণ করুক।" এর কদর্থ ঘটবে যদি কেউ মনে করেন যে কমিউনিজম্ আর ক্যাথলিজম্ মিলে যাচ্ছে, কিম্বা পোলাণ্ডের কমিউনিস্টরা বোধ হয় ক্যাথলিকদের ভাঁওতা দিয়ে কার্য সিদ্ধির এক নতুন চাল চেলেছে। যে কমিউনিস্ট এবং যে ক্যাথলিক, তাদের ধ্যান-ধারণার মূলে রয়েছে একেবারে বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন গুণের অনুপ্রেরণা।

কিন্তু বিভেদ সত্ত্বেও যদি কর্মক্ষেত্রে মিলন সম্ভব হয়, এবং তার ফলে নবসমাজের প্রকৃতি বিকৃত ও আদর্শ খণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তো মিলিত প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা করাই সঙ্গত। ধর্মব্যাপারে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস নির্বিশেষে যদি মোটামুটি সমাজ সম্বন্ধে ঐক্য বোধ দেখা যায়, যদি সকলে মিলে সুখী, সুসম্বদ্ধ, সুসমঞ্জস জীবন যাপন করতে হলে সোশালিস্ট ব্যবস্থাকেই প্রকৃষ্ট বলে চেতনা দেখে লক্ষ্য করা যায় তো বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী বা অজ্ঞেয়বাদী সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলা অসম্ভব নয়, অনাকাঙ্ক্ষিতও নয়।

কিছুদিন আগে আলজীরিয়ার বিপ্লবী নেতা বেন বেল্লা সহসা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে পর্যন্ত সেদেশে ইসলামের সঙ্গে সাম্যবাদের একটা সঙ্গতি খুঁজে বার করে তাকে সামাজিক অগ্রগতির কাজে লাগানোর কথা খাস কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল। যে মুসলমান তার ধর্মে বিশ্বাস করে, ধর্মের দৈনন্দিন অনুশাসনও পালন করে, সে শুধু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে পূর্ণ আয়ত্ত করে কায়মনোবাক্যে তাকে গ্রহণ করতে পারে নি বলে তাকে সাম্যবাদী সংগ্রামে অংশীদারী থেকে বঞ্চিত করা দূরে যাক। সেই সংগ্রামে ওতপ্রোতভাবে তাকে জড়িত করার সম্ভাবনা ও ঔচিত্য সম্বন্ধেই আলজীরিয়ার মতো সদ্য বিপ্লবী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে সজাগ দেশে কথা উঠেছে। আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম ও নীতির সঙ্গে বিরোধের পরিবর্তে মিলনের মাধ্যমে সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছে। ইতিহাসের রায় এ-ধরনের চেষ্টার বিরুদ্ধে যেতে পারে ভয় করে এই দুঃসাহসী পরীক্ষা থেকে নিবৃত্ত হওয়া নীতিনিষ্ঠা হতে পারে কিন্তু সার্থক মার্কস্‌বাদ সম্ভবত নয়।

পোলাণ্ডে কয়েক বৎসর পূর্বে বহু যুবকযুবতীকে প্রশ্ন করায় তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন বলে তারা ক্যাথলিক, কিন্তু তাদের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন?" তখন জবাব আসেনি। ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব পূর্বের তুলনায় কমে থাকলেও তার সংগঠন পূর্বের চেয়ে বেড়েছে, পাদরী, ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর সংখ্যা বেড়েছে। ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার উচ্চ প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি; ল্যুকলিনে আছে ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে ছাত্র সংখ্যা ১৬০০ এবং ৪১ জন অধ্যাপক। ১৯৫৬ পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কে খারাপ ছিল, কিন্তু তারপর থেকে পর পর সম্বন্ধ মোটামুটি বন্ধুতা না হলেও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষীয়দের ব্যবহারে যাকে স্টালিন যুগ বলা হয়

সেই সময় যে কঠোরতা ছিল, শ্রেণীবৈরিতার সংজ্ঞা অতিরিক্ত ব্যাপক হওয়ায় ধর্মবিশ্বাসীদের সোশালিস্ট ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে প্রখর সন্দেহ পোষণের যে রীতি ছিল, তা ১৯৫৬ সাল থেকেই হ্রাস পেয়ে এসেছে।

অপরপক্ষে দেখা গেছে ক্যাথালিকদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল তারা কমিউনিস্ট দর্শন ও কর্মধারার সঙ্গে যোগসূত্রেরও সন্ধান করছেন, উভয় শিবিরের মধ্যে চিন্তা বিনিময়ের ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন। পোলাণ্ডের ক্যাথলিক মহলে ফ্রান্স, ইতালী ও অন্যান্য ক্যাথলিক প্রধান দেশে খ্রীষ্টীয় চিন্তায় নতুন সমাজ সচেতন বিকাশ নিয়ে সাড়া পড়েছে—"Polish Perspectives"-এর মতো অতি মূল্যবান মাসিকে প্রায়ই এর উল্লেখ থাকে। ফ্রান্সে আধুনিক যুগে ক্যাথলিক চিন্তার বিখ্যাত নায়ক জাক্ মারিতঁ্যা (Jacques Maritain) মার্ক্‌স্‌বাদের একান্ত বিরোধী, মার্ক্‌সীয় চিন্তার সঙ্গে সকল সংস্পর্শ পরিহার করা উচিত, এই তাঁর বক্তব্য। কিন্তু আবার মূনিয়ে-র (Mounier) ন্যায় ব্যক্তি মার্ক্‌সের প্রশস্তি করেছেন এই বলে যে ধনতন্ত্রে মানুষকে জড়বস্তুর মতো দেখা কতবড় পাপ তা ধার্মিকদের চেয়ে মার্ক্‌স্‌ই তো প্রথম আবিষ্কার করলেন—মানুষের মহিমার কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এমন ভাবে যে ধর্মতাত্ত্বিকদের লজ্জা হওয়া উচিত। মূনিয়ে তাই চেয়েছেন খ্রীস্টান আর মার্কস্‌বাদী একত্রে কাজ করুক, বিপ্লব শুধু সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ঘটুক। "নীতি, শীল, আচরণে বিপ্লব আসবে না যদি না তা সঙ্গে সঙ্গে অর্থব্যবস্থাতেও আসে। আর অর্থব্যবস্থায় বিপ্লব নীতিসঙ্গত না হলে তার কোন দাম নেই।" অনেকটা এই ধরণের কথা আমাদের দেশে আচার্য বিনোবাভাবে বলে থাকেন; কিছুকাল আগে তিনি যা বলেছিলেন তা বহুজনের মুখে মুখে ঘুরেছে—"বর্তমান জগতে প্রয়োজন হল রাজনীতি আর ধর্মকে পরিহার করে বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতাকে ("spirituality") বরণ করা।" এরকম কথা বেশ খানিকটা ধোঁয়াটে নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলে একে 'নস্যাৎ' করতে চাইলেও হয়তো পারা যায় না।

ফরাসী জেস্যুইট পিয়ের তাইল্‌হার দ্য শার্দ্যাঁ (Pierre Teilhard de Chardin) প্রায় বছর দশেক আগে মারা যান, কিন্তু তাঁর চিন্তা নিয়ে ক্যাথলিক মহলে অনেক আলোড়ন হয়েছে, যদিও সাধারণ বিশ্বাসী ভক্তের দল এ-বিষয়ে খবর রাখে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োগের ফলে মানুষের চেতনায় এক নতুন সংকেন্দ্রন ("concentration") ঘটেছে, নানা

দেশে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে, ক্রমে সকল মানুষের মধ্যে মমতা বোধ আরও বৃদ্ধি পাবে, প্রেম তখন তার ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ী শক্তির পরিচয় দেবে। মানুষের "সামূহিক চেতনা" এমন স্তরে উঠবে একমাত্র যেখানেই ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব—এ-ধরণের কথা শাঁর্দ্যাঁ বলেছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতায় পূর্ণ বিকাশ, বস্তু সম্পদে মানুষের অগ্রগতি এবং মমতার ভিত্তিতে সর্বজনের "সামূহিক চেতনা" বিবর্তনের চরম পর্যায়কে এনে দেবে। মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবধান দূর হবে, নতুবা স্বয়ং ঈশ্বরও তখন সিদ্ধিলাভ করবেন না, এই সব কথার মধ্য দিয়ে ধর্মশীল ক্যাথলিকের সমাজ বোধ প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি, ক্যাথলিক ধর্মগৌরব ও পরম্পরার পীঠস্থান রোম এবং পোপতন্ত্রে (বিশেষত পোপ ২৩শ জন-এর আমলে) পূর্বের তুলনায় যে অগ্রাভিমুখিতা দেখা গেছে, তার পিছনে আছে এই ধরণের ভাবধারা যা খ্রীস্টান ইতিহাসের প্রথম যুগের বহু সাধুসন্তের সামাজিক চিন্তাকে বর্তমান যুগের পরিবেশে নতুন করে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেছে।

প্রকৃতই যদি ইতিহাসের চাপে সমাজবাদ-সাম্যবাদের ঘোর বৈরী ক্যাথলিক চার্চের রোষ ও উষ্মা প্রশমিত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে তো তার তাৎপর্য প্রভূত। পোলাণ্ডে তো কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় সমাজ চলেছে। কিন্তু ইতালী এবং কিছুটা ফ্রান্সের মতো দেশেও ক্যাথলিক চার্চের মতিগতিতে বর্তমান যুগের প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসীরা পোলাণ্ডের জনসংখ্যার সমধিক অংশ; কিন্তু সাম্যবাদী বিশ্বদীক্ষা গ্রহণ না করলেও ক্রমশ সমাজের অগ্রগতিতে তাদের আন্তরিক অংশীদারী দেখা যাচ্ছে। এর জন্য সাম্যবাদকে খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বকে গ্রহণ করতে হচ্ছে না; বরঞ্চ আনুষ্ঠানিক এবং বিশ্বাসী খ্রীষ্টানরাই সাম্যবাদকে ইতিহাসের সব্যসাচী সারথিরূপে ক্রমশ স্বীকৃতি না দিয়ে পারছে না। মেহনতী মানুষ আজ যে যুগ নিঃশেষ হয়ে গেছে তা থেকে যুগান্তরে অতিক্রমণ করছে; ইতিহাসের এক অঙ্ক থেকে অন্য অঙ্কে যাবার সেতু আজ দেশে দেশে নির্মিত হচ্ছে বা হতে চলেছে—এই সেতু-বন্ধের কাজে ধর্মবিশ্বাসী অবশ্যই যোগ দেবে। ক্রমশ তার চিন্তার তমিস্রা হয়তো দূর হবে। ধর্মাবেগের স্থলে হয়তো আসবে অন্য অনুভূতি হয়তো তখনই বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকল মানুষ তার আকাশ আর তার নীড়কে একত্র দেখার অপরিমেয় হর্ষ আত্মশক্তিবলে অর্জন করতে পারবে।

*　　*　　*

মার্কস্‌বাদের মহিমা আজ জল্পনাকল্পনার ব্যাপার নয়। জগতের এক-তৃতীয়াংশে মেহনতী মানুষের মনে আজ সে মহিমা সত্যের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই এক-তৃতীয়াংশে যে সকল দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটেছে, তা অবশ্যই নয়; অপরাপর দেশের তুলনায় সেখানকার মানুষ যে বিশেষ কোন গুণের অধিকারী তা নিশ্চয়ই বলা চলে না। তাদের কাজে যে ভুলভ্রান্তি ঘটে না তা নয়; তাদের জীবনব্যবস্থা যে সর্বতোভাবে ক্রটিহীন, তা নয়; তারা যে সবাই চলেছে একই ধরণের বাঁধা রাস্তা দিয়ে যার অবিকল নকল আমরাও একদিন করব তা তো নয়ই। কিন্তু মার্কস্‌বাদের শিক্ষা ও শক্তি যে সেখানকার মানুষের প্রাণে নব সঞ্জীবন এনে দিয়েছে, তা কি অস্বীকার করা যায়? অনেক এগিয়ে যাওয়া সোভিয়েটের কথা না হয় থাক্, হো চি মিন্-এর ভিয়েৎনাম কিম্বা কাস্ট্রোর কিউবা-র দিকে তাকালে কি মনে হয় না যে মানুষ হিসাবে আমরা আজ মাথা তুলে আকাশের তারা পেড়ে আনারও শক্তি রাখি? সঙ্গে সঙ্গে এ-ও কি ভাবব না যে বোখারা-সমরখন্দে যদি সোভিয়েত সমাজ স্থাপিত হয়ে থাকে তো কাশী-কাঞ্চীই কি শুধু মান্ধাতার যুগে মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসে থাকতে পারে? ধর্মের প্রবোধ, বিশ্বাসের প্রলেপ আর বিত্তবানদের মোহময় প্রচারের জোরে আমাদের দেশের মানুষের বহুযুগব্যাপী দুঃখ ও লাঞ্ছনা কি কখনও চিরস্থায়ী হয়ে থাকার সম্ভাবনা রাখে? দরিদ্র নারায়ণের সেবা আর হরিজনের প্রশস্তি পরকালের মহিমা কীর্তন করে ইহকালের প্রবঞ্চনাকে ধামাচাপা দেওয়া ইত্যাদি মার্জিত ধাপ্পাবাজি কি খুব বেশিকাল এ যুগে সবাইকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারে? আমাদের ঐতিহ্যে মহার্ঘ সম্পদ আছে অনেক। কিন্তু পুরোনো কালের নোংরা বোঝার ভার তো কম নয়—তাকে ঝেড়ে ফেলে এদেশকে তো এগিয়ে যেতে হবে?

এই এগিয়ে যাওয়ার যে অভিযান, ইতিহাসের বিধানেই মেহনতী মানুষ যার সংগঠক আর সাম্যবাদ যার দিগ্‌দর্শন, সেই অভিযানে অসঙ্গতিপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় চিন্তা ও ঐতিহ্যের বহু জাজ্বল্যমান ধারাকে লিপ্ত করে দেওয়ার প্রয়াস মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসীদের কাছ থেকে আশা করা একেবারে বাতুলতা নয় বলে ভরসা আছে। সেজন্য একান্ত প্রয়োজন এদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা, আর সেই ইতিহাসে ধর্মচিন্তার স্থান অল্প নয়। মার্কস্ স্বয়ং শিখিয়েছেন যে জনগণের চিত্ত জয় করে যদি কোন ভাবনা, তো তাকে বাস্তব শক্তি বলে পরিগণিত করতে হবে। দেশে দেশে ধর্ম তাই শুধু মনসিজ,

কাল্পনিক, নিরবয়ব রূপে দেখা দেয়নি, সমাজে বিপুল শক্তিধর রূপেই তাকে দেখা গিয়েছে। কেবল ধর্মতত্ত্বের প্রখর বস্তুবাদী সমালোচনা (যা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজন) আর সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে ধর্মবিশ্বাসের অলীকতা ও অসঙ্গতি ক্রমশ পূর্ণ প্রতিভাত হওয়ার উপর ভরসা করে থাকা যায়, সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের মন যখন নানা বাস্তব কারণে সমাজবাদ-সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, ধর্মবিশ্বাসী হয়েও সমাজের নবরূপায়ণে সহযোগিতা দেওয়ার প্রস্তুতি যখন বহু অপ্রত্যাশিত আকারে দেখা যাচ্ছে, তখন মার্কসীয় ভাবনার সিদ্ধিকে দ্রুততর হয় তো করা যায় এই ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে কতকটা বোঝাপড়ার ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে অগণিত তরুণ বৈমানিক প্রাণাহুতি দিয়েছেন তাদের অন্যতম, "The Last Enemy" শীর্ষক অতি সংবেদনশীল গ্রন্থের রচয়িতা, রিচার্ড হিলরি একবার যা লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করতে ইচ্ছা করছে: "ধর্মের অত্যাচার মাঝে মাঝে ঘটেছে, কিন্তু ইতিহাসে অর্থের অত্যাচার চলে এসেছে নিয়ত, কোথাও তাতে ছেদ পড়েনি, আর তার সমাপ্তিও যেন নেই। কোন সাক্ষ্য ইতিহাসে নেই যে অর্থগত কারণে মানুষের মনের দাক্ষিণ্য বেড়েছে, কিন্তু অন্তত কিছু সাক্ষ্য আছে যা বলে যে ধর্ম মানুষের চরিত্রকে ভালোর দিকে টেনেছে।" এই উদ্ধৃতিতে ভুল বার করা শক্ত নয়। কিন্তু এই মনোভাবকে তাচ্ছিল করাও ঠিক হবে না।

মহাভারতের বনপর্বে আছে যে ধর্ম নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি যে করে, সেই "ধর্মবাণিজ্যক" অতি "হীন ও জঘন্য"। আরও বলা হয়েছে: "এক এব চরেদ ধর্মং ন ধর্মধ্বজিকো ভবেৎ", ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্মকে ধ্বজার মতো ব্যবহার অনুচিত। এর বহু কাল পরে সম্প্রদায় ভেদ সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে অভেদ দর্শনের প্রবক্তা মহাত্মা কবির ধর্মের নামে নীচতা চলছে দেখে "অধিকসয়ানী", অতি-সেয়ানা, অতি-বিজ্ঞের দলকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, বলেছিলেন তারা যতই ধর্ম সঞ্চয় করুক না কেন, নরকেই তাদের যেতে হবে! আরও পরে বাঙালী মুসলমান বাউল ধর্মধ্বজীদের ঝগড়া আর নোংরামী দেখে গেয়ে ওঠেন:

ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায়,
তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়।
বল্ তো গুরু দাঁড়াই কোথায়,
অভেদ-সাধন মরলো ভেদে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগের ভারতীয় সাধুসন্তদের কথা এবং "হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা" প্রভৃতি রচনায় কত সম্ভার উপস্থিত করেছেন যা হয়তো অনেকেরই মনে পড়বে। ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তাকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বিচার করলে আমাদের ধ্যানধারণা অনেক দিক থেকে স্পষ্ট ও পুষ্ট হতে পারে। সে চেষ্টার ফলে আজকের কর্তব্য সম্বন্ধেও হয়তো অধিক অবহিত হতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতবর্ষের ধর্ম নিয়ে আলোচনার স্থান এটা নয়।

তবে কয়েকটা কথা মার্কস্‌বাদের দৃষ্টিপট থেকে মূল্যবান্ মনে হয়। হিন্দু ধর্মের কোন প্রতিষ্ঠাতা নেই, আর ধর্মের সংজ্ঞা এমনই ব্যাপক যে কোন বিশেষ বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানে তা নিবদ্ধ নয়। বৈদিক যুগের মানুষ জীবন সম্বন্ধে পরম আসক্তি রাখত—তার প্রার্থনা হল, আমরা যেন একশো বছর বাঁচি, "পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্, প্রব্রবাম শরদঃ শতম্, অদীনাস্যাম শরদঃ শতম্, ভূয়শ্চ শরদঃ শতম্"—শতাধিক বর্ষ যেন বাঁচি, দীনহীন অবস্থায় নয়। চক্ষু, কর্ণ, বাক্‌শক্তি সকল ইন্দ্রিয় অটুট রেখে যেন বাঁচি। উপনিষদে গূঢ়ার্থবাদী ও আকাশচারী কথার অভাব নেই, কিন্তু তাতেও আছে অনেক উদ্ভট জিনিষ, অনেক জাদুবিদ্যার কথা, এমন কি প্রজননতত্ত্ব পর্যন্ত আছে। ভারতে যা কিছু আছে, তা সবই মিলবে মহাভারতে, কিন্তু ঐ অপূর্ব মহাকাব্যে ধর্মকথা বিস্তর থাকলেও তার প্রেরণা প্রচলিত অর্থে ধর্মতত্ত্ব থেকে একেবারে আলাদা, কোন কোন বিদেশী বিদ্বান্ (যেমন Louis Renou) তাকে ধর্মনিরপেক্ষ ("secular") বলতে ইতস্তত বোধ করেন নি। মহাভারতে চিরজীবী বলে বর্ণিত বক ঋষিকে যখন প্রশ্ন করা হয় "কিং দুঃখম্ চিরজীবিনাম্?" তখন তিনি বলেন: "ধনহীন ব্যক্তিকে অন্যে যে তিরস্কার করে তার চেয়ে দুঃখজনক কিছু জগতে নেই। দরিদ্রেরা ধনী কর্তৃক অবজ্ঞাত হয়ে যে ক্লেশ বোধ করে, তার চেয়ে বড় দুঃখ কি আছে?" আবার চিরজীবী জনের সুখ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে বলেন: "দুষ্ট বন্ধুকে অবলম্বন না করে আপন গৃহে দিনের অষ্টম বা দ্বাদশ মুহূর্তেও শাক মাত্র পাক করে জীবন ধারণের চেয়ে অধিক সুখ নেই। কারও মুখাপেক্ষী না থেকে আপন ক্ষমতায় অর্জিত ফল বা শাকও নিজ গৃহে বিনা গ্লানিতে ভোজন করতে পারাই ভালো।" শম্বর মুনি বলেছেন, পতিপুত্রের মৃত্যুর চেয়েও স্ত্রীলোকের পক্ষে দারিদ্র্য আরও দুঃখজনক, কারণ তাহল "পর্যায় মরণ", তিলে তিলে মরার শামিল।

"আত্মানমবমন্যস্ব নৈনমন্নেন বীভবঃ—নিজেকে অবজ্ঞা কোরো না, অন্নের দ্বারা মনকে পোষণ কোরো না, এই হল তাঁর শিক্ষা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দুন্দুভিনাদ "দ দ দ দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্" কবি এলিয়টের কল্যাণে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত—দান, দয়া, সংযমের বাণী ইন্দ্রজাল মিশ্রিত হলেও স্পষ্ট। আর বহু পরে ব্রহ্মপুরাণ বলছে "জীবিতং সফলং তস্য যঃ পরার্থোদ্যতঃ সদা"—যে সর্বদা পরের মঙ্গলসাধনে লিপ্ত, তার জীবন সার্থক। ভাগবতপুরাণে রয়েছে সুবিখ্যাত শ্লোক :

যাবদ্ ভ্রিয়েৎ জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোহভিমন্যেত সস্তেনোদণ্ডমর্হতি ॥

ক্ষুধার ও প্রয়োজনের অনুরূপ অন্ন মানুষ পেতে পারে, কিন্তু যারা তার বেশি দখল করে বসে তারা দণ্ডার্হ। এ যেন ঋগ্বেদের এক সূক্তেরই প্রতিধ্বনি, "কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি"—যে মানুষ একা নিজের জন্য রান্না করে খায় সে তো পাপী।

কত কথা বলে যেতে পারা যায়, যার শেষ নেই। কিন্তু বেদ উপনিষদ্ থেকে আরম্ভ করে ভারতে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মচিন্তা ও অগণিত সাধুসন্তের জীবন ও উপদেশে রত্ন ছড়িয়ে আছে এত বেশি যে বলে যেতে লোভ হয়। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি আশঙ্কা করে লেখার রাশ টেনে ধরতে হবে।

মানুষকে নতুন স্বাধীন সুখী জীবন গড়তে হলে ধর্মের মায়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে নিশ্চয়ই, ধর্মের আনুষঙ্গিক হাজার বাঁধন তো ভাঙ্‌তে হবেই। মোঙ্গোলিয়াতে সম্প্রতি দেখেছি, বৌদ্ধমঠ রয়েছে, ধূপধুনো জেলে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে তারস্বরে মন্ত্রপাঠ করে বিশ্বাসী মনকে অভিভূত করার প্রাচীন কায়দাকে খতম করা হয় নি। কিন্তু মানুষের মনোযোগ সরে এসেছে অন্যত্র—পুরোনো, পিছিয়ে-পড়া, ঘুমন্ত দেশ জেগে ভবিষ্যতকে নির্মাণ করছে, জনতা এগিয়ে চলেছে সব দিক থেকে—সে বাস্তবিকই এক অবাক্ কাণ্ড, এমনই এক বিস্ময় যার কাছে ধর্মের মোহকে পর্যন্ত হেরে যেতে হয়েছে। আবার ভেবেছি, যাদের মনকে ধর্ম গভীর ভাবে টান্‌ত তাদের মনের পুরো খোরাক সমাজবাদী পরিবেশে মিলছে কি? মানুষের চিত্তবৃত্তিতে যে নভোচারিতা বহু যুগ ধরে বাস্তব কালাতিপাতের মধ্য দিয়েই সঞ্চারিত হয়ে এসেছে, সোশালিস্ট সমাজে তার চেহারা কি দাঁড়াচ্ছে, না তা একেবারেই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে? মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, নিষিদ্ধ ফলের

মতোই বিমূর্ত শিল্পকলার চর্চার দিকে সোভিয়েত দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ঝোঁকের মধ্যে এই বস্তুর সাক্ষাৎ হয়তো মিলছে। একেবারে অবিশ্বাস করা শক্ত একটা কথা, যা সোভিয়েত সম্বন্ধে শুনেছি। সেখানে শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে অনেকে নাকি দর্শন-শাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট নয়, কারণ দর্শন অধ্যয়ন করতে হলে চরম বলে স্বীকার করে নিতে হয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে, মনের লাগামকে এক জায়গায় পৌঁছে চেপে আটকে রাখতে হয় আর সেজন্য বিশুদ্ধ গণিত বা পদার্থবিদ্যার দিকে তাদের ঝোঁক বাড়ছে, এখনও সেখানে মনের আকাশ এত বিস্তীর্ণ যে তাকে সীমিত করে রাখা যায় না। শিল্পসৃষ্টি ও রসোপলব্ধির অপার আনন্দকে এদেশের ঋষিরা বলেছিলেন "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর", যা হল ব্রহ্মের মতো অনির্বচনীয় তার আস্বাদের সঙ্গে শিল্পস্বাদ তুলনীয়। সত্তাকে সম্যক্‌ জানতে হলে সত্তার বাইরে কিঞ্চিৎ বিবরণ হয়তো জীবনকে এক বিশেষ বিভূতিতে মণ্ডিত করে, আর এ জন্যই কি ধর্ম কিম্বা তদনুরূপ অনুভূতি এবং উপলব্ধিকে একেবারে বহিষ্কৃত করতে মানুষ চাইছে না কিম্বা পারছে না?

রবীন্দ্রনাথ "সেই স্বর্গের" কথা বলেছিলেন—

> "চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
> জ্ঞান যেথা মুক্ত···
> ··· ··· ···
> ···যেথা নির্ধারিত স্রোতে
> দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
> অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—"

নরকের ভয় আর স্বর্গের লোভ দেখিয়ে যে "ধর্ম" মানুষের অবমাননা করেছে, ধর্মধ্বজীদের কর্তৃত্বে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সহযোগিতা করে এসেছে, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মানুষকে "দুঃখ-উপত্যকায়" গ্লানিময় জীবনযাপনে অভ্যস্ত করেছে, অলৌকিক অতীন্দ্রিয় মায়াপাশে মানুষকে বন্দী করে রেখেছে, সে "ধর্ম" আজ ইতিহাস আর মানুষের চোখে অন্তঃসার শূন্য, অলীক প্রতারণা বলে ধিক্কৃত। তবে হয় তো ধর্মানুভূতির অন্য একটা দিক আছে, যা বহু মানুষেরই অন্তরের ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার পানীয়, যা অর্থব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। হয়তো এ জন্যই ধর্মকে

সম্পূর্ণ পরিহার যারা করছেন না এবং যারা ধর্মাবেগকে ভবিষ্যৎ মানব সমাজের পথে কণ্টক স্বরূপ মনে করেন, তাদের মধ্যে প্রয়োজন প্রকৃত কথোপকথন, যুক্তি ও চিন্তার আদানপ্রদান; তাদের মধ্যে প্রয়োজন সেই দ্বন্দ্ব যা যথাসময়ে আনবে সংশ্লেষণ, সৎ ও স্বচ্ছ বিতর্কের পর হয়তো আসবে সম্বোধি, আর ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সম্ভব ও সহজ ও সৌষ্ঠবপূর্ণ হবে সকল শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সহযোগিতা।

লেনিন ও বর্তমান যুগ

বিংশ শতকের প্রথম বৎসর ১৯০০ সালে জার্মানিতে প্রবাসকালে লেনিন প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসক্রা' সংবাদপত্র এবং বিপ্লবী সাথীদের সহায়তায় গোপনে আইনের বেড়াজাল এড়িয়ে রুশদেশে তার প্রচারের ব্যবস্থা করেন। 'ইস্ক্রা' শব্দটির অর্থ হলো 'স্ফুলিঙ্গ'—কাগজের নাম যেখানে ছাপা, ঠিক তার নিচে লেখা থাকত: "এই স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলবে"। জার্মানিতে 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকার স্থাপনা ; শত্রুর তাড়নায় তাঁকে ১৯০২ সালে যেতে হয়েছিল লণ্ডনে, আর সেখানেও বিঘ্ন দেখা দিলে যেতে হলো জেনিভা। মার্কস-এঙ্গেলস-এর উত্তরাধিকারে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন লেনিন তাঁর বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় প্রতিভার অনন্ত পরিচয় দিয়ে—মার্কসবাদের অমোঘ শক্তিবলে মেহনতী মানুষের বিশ্ববিজয়কেতন উড্ডীন রেখেছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রাম্যমান এই তুলনাহীন মানুষটি।

'ইসক্রা' প্রকাশিত হওয়ার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে রুশ দেশে আগুন জ্বলল। জনতার রক্তে নির্বাপিত হয়েও আবার দাবানল এল ১৯১৭ সালে। ফেব্রুয়ারি মাসে যার সূচনা, নভেম্বরে দেখা গেল তার সার্থকতা। অন্ধ বিনা সকলের কাছেই স্পষ্ট বোধ হলো—অকাট্যভাবেই নভেম্বর বিপ্লবের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে। তার জয়যাত্রাকে রোধ করা কারও সাধ্য নয়। মার্কস-এর জন্মের (১৮১৮) পর একশো বৎসর কাটার আগেই ঘটেছে প্রথম বিপুল সফল সোশালিস্ট বিপ্লব। আজ গোটা দুনিয়ার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বাস করছে সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থায়। মার্কস-এর মৃত্যুর (১৮৮৩) পর একশো বৎসর যখন কাটবে, তখন জনতার এই জগৎজোড়া জয়যাত্রা কোন স্তরে হাজির হবে তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়াসে প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলো লেনিনের জন্ম-শতাব্দী পরিপূরণ উপলক্ষে ঐ বিপ্লবী মহানায়কের জীবনকাব্য বিষয়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—প্রয়োজন আমাদের যুগের যিনি যুগন্ধর, তাঁর শিক্ষা আত্মস্থ করে আজকের পরিস্থিতিতে সমাজ রূপান্তরের কাজে এগিয়ে যাওয়া।

মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে মহামনস্বী হেগেল-এর সংজ্ঞা বোধহয় সবচেয়ে গ্রহণ-যোগ্য। অতি-মানবের আবির্ভাব বিষয়ে যে-ধরনের কথা শোনা যায়, তা নিয়ে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক প্রয়োগের এখানে প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিপূজা মাঝে মাঝে যে ইতিহাসকে কিছু পরিমাণে বিকৃত করেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। প্রকৃত শক্তিধর ব্যক্তির ভূমিকাও নিঃসন্দিগ্ধ। আকস্মিকভাবে তাঁরা যে ইতিহাসের স্বাভাবিক ও সঙ্গত গতিচ্ছন্দে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য এনে থাকেন, তা মনে করারও যথাযথ কারণ নেই। হেগেল-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো এক যুগের প্রকৃত মহৎ প্রতিনিধি হলেন তিনি যিনি সেই যুগের কামনাকে বাক্যে প্রকাশ করতে পারেন, যিনি নিজের যুগকে বলতে পারেন তার ঈপ্সিত উদ্দেশ্য কি, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনেও নামতে পারেন। "যা তিনি করেন তা হলো তাঁর যুগের মর্ম ; তাঁর যুগের সত্তার গভীরে নিহিত। মহৎ ব্যক্তি হলেন নিজের যুগের বাস্তব মূর্তি।" এই সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলা যায়, লেনিন হলেন বিংশ শতাব্দীর নায়ক, বিংশ শতাব্দীর প্রতিভূ, বিংশ শতাব্দীর ভাবধারা—রূপকের ভাষায় যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সম্বন্ধে "দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে" বলা সাজে, তাঁদেরই একজন সর্বাগ্রগণ্য।

জওয়াহরলাল নেহরু আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন যে তাঁর চেনা কমিউ-নিস্টদের প্রায়ই কেমন যেন বেখাপ্পা ধরনের মানুষ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটা বৈশিষ্ট্য মহার্ঘ বলে মানতে সঙ্কোচ হয়নি। লেনিনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল সবচেয়ে জাজ্জ্বল্যমান, আর কম-বেশি পরিমাণে সব কমিউনিস্টের মধ্যেই একে তিনি দেখেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য হলো "ইতিহাসের সঙ্গে তাল রেখে পা ফেলে চলা" বিষয়ে ভরসা। এর চেয়ে দামী প্রশংসাপত্র কমিউনিস্টদের বোধহয় প্রায় নেই।

ইতিহাসের গতিচ্ছন্দ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা লেনিন আয়ত্ত করেছিলেন মার্কস-এঙ্গেলস-এর শিক্ষা থেকে। সকল অনন্যসাধারণ ব্যক্তির মতোই তিনি একযোগে ছিলেন ইতিহাস কর্তৃক গঠিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের নির্মাতা—যে-সামাজিক শক্তিপুঞ্জ দুনিয়ার চেহারা আর মানুষের চিন্তাধারাকে পালটে দেয়, একাধারে তার প্রতিনিধি এবং তার স্রষ্টা ছিলেন। চিন্তাশীল এবং তীক্ষ্ণধী ইংরেজ ইতিহাসবিদ ঈ-এচ-কার মহৎ ব্যক্তির ভূমিকা আলোচনা ব্যপদেশে যথার্থই বলেছেন যে, লেনিন মহতের মধ্যে মহীয়ান এই কারণে যে শুধু পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত শক্তির তরঙ্গে ভাসমান থেকে মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হননি (যা বলা

যায় নেপোলিয়ন কিম্বা বিসমার্ক সম্বন্ধে), তিনি সমাজে বিবর্তনের সংসাধক শক্তির একজন স্রষ্টাও ছিলেন। এ-কথার যাথার্থ্য অনস্বীকার্য, কারণ লেনিন শুধুমাত্র মার্কস-কথিত সুসমাচারের প্রবল প্রবক্তা ছিলেন না, শুধুমাত্র ফলিত মার্কসবাদের উত্তরসাধক ছিলেন না—সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজ-শক্তি বিশ্লেষণে মার্কসবাদে গুণগতভাবে নূতন সংযোজনা দেবার মতো সৃষ্টিক্ষমতা রাখতেন। যাগযজ্ঞে যারা কেবল ব্যাপৃত, তাদের চেয়ে বহু উচ্চে স্থান হলো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির।

বলশেভিক পার্টি গঠনের মধ্য দিয়ে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন বলেই লেনিন সাম্যবাদী আন্দোলনে স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। 'ইসক্রা' প্রকাশ হওয়ার পূর্বে রুশ দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ; ১৯০২ সালে প্রকাশিত হলো বিখ্যাত বই 'কি করা যায়' ? যা আজও সকলের অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু তখন মার্কসবাদীদের শিরোমণি ছিলেন অগাধ পণ্ডিত বলে পরিচিত কার্ল কাউটস্কি। ১৮৯৯-১৯০০ সালে আর এক বিরাট পণ্ডিত বের্নস্টাইন যখন পার্লামেণ্টারি রাজনীতির সঙ্গে মালাবদল ঘটিয়ে মার্কসবাদকে ঘষে-মেজে "ভদ্রস্থ" করতে লাগলেন, তখন সেই 'সংশোধনবাদ'-এর বিপক্ষে কণ্ঠ উত্তোলন করেছিলেন এঙ্গেলস-এর স্থলাভিষিক্ত কাউটস্কি। পরে আবার এই কাউটস্কি প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের যুগে নির্বিত্ত মানুষের বিপ্লবী অভিযানকে অস্বীকার করলেন, যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে দাঁড়ালেন এবং সোভিয়েত বিপ্লব ঘটার অব্যবহিত পরে তার প্রখর বিরোধিতা করলেন। কাউটস্কির মতো বিশ্ববিদিত তাত্ত্বিকের বক্তব্য খণ্ডন করলেন লেনিন—এটা স্বাভাবিক ঘটনা, কারণ ইতিমধ্যে স্টুটগার্ট, কীম্থাল, ৎসিমেরভালড এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমাবেশে রুশ-বলশেভিকদের এই ক্লান্তিহীন, ক্ষুরধার, তেজস্বী অথচ সতত স্থিতধী প্রবক্তাকে দেখা গিয়েছিল এবং তাঁরই অনুপম নেতৃত্বে জগতের এক-ষষ্ঠাংশব্যাপী যে-জারসাম্রাজ্য, সেখানে বিপ্লব সংসাধিত হলো। একদিকে যেমন লেনিন দলত্যাগী কাউটস্কিকে ধিক্কার দিলেন (১৯১৮), যেমন দেখা গেল ১৯০৫ সালে লেখা 'সোশাল-ডেমক্রাসির দুই কৌশল' শীর্ষক রচনার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ, যেমন সবাই পেল 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা (১৯১৭), তেমনই পরে বামপন্থী বাক্যবাগীশপনার উগ্র আতিশয্যকে তিনি তীক্ষ্ণ গভীর ভঙ্গিতে নিন্দা করলেন। লেনিন-রচনাবলী নিয়ে আলোচনা এটা নয়, কিন্তু বলে রাখা ভালো যে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-রাজনীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভাগে অসামান্য ব্যুৎপত্তি এবং তত্ত্ববিচারের ভিত্তিতে বৈপ্লবিক

কর্মপদ্ধতি সংগঠন ও পরিচালনার নীতি ও কৌশল বাস্তবে রূপায়িত করার প্রতিভা একীভূত হয়ে লেনিন চরিত্রকে একটা বিশেষ গরিমা দিয়েছিল বলেই ইতিহাস আজ তাঁকে স্মরণ করে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের গুরু ও নেতা বলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য সংগঠক বলে, জগতের প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে, একাধারে মনীষী ও বিপ্লবী বলে, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত নিরহঙ্কার ও সহৃদয় মানুষ বলে।

গত বৎসর ক্যানাডার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা টিম্ বাক্ একটি প্রবন্ধের নাম দেন—'আমাদের কালের সমস্যা বিষয়ে লেনিনের পরামর্শ গ্রহণ'। আজকের যুগের প্রধান স্রষ্টা বলে লেনিনের কথা স্মরণ করলে বাস্তবিকই পথের সন্ধান মিলতে সাহায্য পাওয়া যায়। অটল বিশ্বাসের সঙ্গে সমীচীন বিনয় চরিত্রে অঙ্গীভূত ছিল বলে একেবারে শেষ দিকের লেখা 'Better less but Better' রচনাতে লেনিন বলেন যে সব চেয়ে খারাপ হলো নিজেদের একেবারে সব বিষয়ে "সব জানতা" ধরে নেওয়া। মার্কস ঘৃণা করতেন সেই মনোবৃত্তিকে যার ফলে মানুষ বলেঃ "এই হল সার সত্য, এর সামনে হাঁটু গেড়ে থাকো!" কিন্তু সন্দেহ নেই যে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা অবান্তর হওয়া দূরে থাকুক, তার প্রাসঙ্গিকতা, তার যাথার্থ্য, তার বাস্তব প্রয়োজন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আজ অচল ও অবান্তর প্রমাণ করার জন্য বহু তীক্ষ্নবুদ্ধি পণ্ডিত বুর্জোয়া জগতে ব্যস্ত; মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনকে একটু প্রশংসা জানিয়ে বাতিল করার কাজে নেমেছেন তথাকথিত Marxologist এবং Kremlinologist-এর দল। আজকের ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্র, জটিল যুযুৎসু জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে অপারগ কিম্বা অনিচ্ছুক গবেষণা লেনিনের শিক্ষার মূল সত্যকে স্বীকার করতে অক্ষম — এ-হলো লেনিনবাদের বিরোধিতা করে ম্রিয়মাণ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় প্রাণ সঞ্চার করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। অবশ্য সকল প্রশ্নের যে সহজ উত্তর অবিলম্বে মিলবে তা নয়। মনে রাখতে হবে লেনিনের মন্তব্য যে "বহু আভ্যন্তরীণ বিরোধ ব্যতিরেকেই ইতিহাসের অনুগ্রহে আমরা নূতন চরিত্রের এক গণতন্ত্র পেয়ে যাব" মনে করা বাস্তবিকই অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসেরই সমতুল্য।

মস্কোতে• গত বৎসর জুন মাসে বহু দেশের কমিউনিস্ট পার্টির যে-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে লেনিন জন্মশতাব্দী সম্বন্ধে বিশেষ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল

"অনেকগুলি দেশে সোশালিস্ট বিপ্লব জয়ী হয়েছে; জগদ্ব্যাপী একটা সোশালিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, ধনবাদী দেশসমূহেও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে, পূর্বতন পরাধীন ও অর্ধ-পরাধীন দেশের জনতা আত্মশক্তি বলে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে স্থান নিচ্ছে; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভূতপূর্ব অভিযান ঘটছে। এ-সবই হলো প্রমাণ যে ইতিহাসের পরীক্ষায় লেনিনবাদ নির্ভুল এবং বর্তমান যুগের মৌলিক প্রয়োজনগুলি লেনিনবাদেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

বুর্জোয়া বিদ্বানেরা অবশ্য এ-কথা মানবেন না। লেনিনকে তাঁদের পক্ষে 'নস্যাৎ' করা সম্ভব নয়, তাই কথার ম্যারপ্যাঁচ খেলিয়ে, লেনিনকে যেন দু-একটা 'সার্টিফিকেট' দিয়ে, তাঁরা বলে থাকেন যে প্রতিভাবান মানুষ হলেও লেনিনের হিসাবে মস্ত ভুল ইতিহাস ঘটিয়ে দিয়েছে (যেমন তাঁরা বলেন মার্কস-এর ক্ষেত্রেও নাকি ঘটেছে)! এঁদের কাছে শুনি যে লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ' সম্বন্ধে দামী কথা কিছু লিখেছিলেন বটে, কিন্তু আজ বেঁচে থাকলে তিনি নাকি বলতেন যে 'সাম্রাজ্য' ব্যাপারটাই তো উঠে গেছে! তিনি নাকি আরও দেখতেন যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং বুর্জোয়া দুনিয়ার অন্যান্য আগুয়ান দেশে শ্রমিকরা এমনই সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছে যে বিপ্লবের কথা ঘুণাক্ষরে তাদের মনে আর নেই। এমন কি, সোশালিস্ট নামধেয় দেশগুলি দেখে আজ লেনিন খুব অপ্রতিভ না হয়ে পারতেন না — 'সাম্রাজ্যের অবসান' এবং অন্যান্য রচনায় জন স্টেচি এ-বিষয়ে বলছেন: "কমিউনিস্টরা ভয়ঙ্কর উপায় অবলম্বন করে ফল যা পেয়েছে তা হলো অকিঞ্চিৎকর!" স্ট্রেচি তাঁর বিচিত্র জীবনে অনেক ঘাটের জল খেয়েছিলেন, কিছুকাল গোঁড়া কমিউনিস্টের নামাবলীও ধারণ করেছিলেন। এ-ধরনের বেসামাল কথা তাঁর কাছ থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিত অবশ্য নয়।

লেনিন বলেছিলেন যে সমাজবাদে উত্তরণ করবে মানুষ "একটা গোটা ঐতিহাসিক অধ্যায়" জুড়ে সংগ্রামের ফলে, এবং সেই অধ্যায়ে ক্রমাগত এবং সহজে জয়লাভ ঘটার কথা নয়, হরেকরকম মুশকিলের আহ্‌সান করে তবেই সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং আজ দেশে-বিদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মত এবং পথ নিয়ে পার্থক্য, পরস্পর সম্পর্কে কটূক্তি এবং মাঝে মাঝে খেদকর সংঘর্ষ আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যের সঞ্চার ঘটালেও ঐজন্য হাল

ছেড়ে দেওয়া হবে একান্ত অকর্তব্য। স্বয়ং মার্কস একবার এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সর্বদা অনায়াস বিজয় প্রতীক্ষা করলে কখনও ইতিহাস সৃষ্টি সম্ভব হবে না—নিজেদেরই মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে যুগের পরিবর্তন সাধন সোজা কাজ নয়। বর্তমানের বহু সঙ্কট ও সমস্যাকে ছোট করে না দেখেই অবশ্য বলা যায় যে লেনিন যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেই পথে চলাই আজকের কর্তব্য। লেনিনের শিক্ষাকে যাঁরা বাতিল প্রমাণ করতে কোমর বেঁধে লেগেছেন, তাঁদের হিসাবেই খুব বড় দরের ভুল রয়ে গেছে, সমাজবাদের অমোঘ অগ্রগতি রোধ করতে তাঁরা পারবেন না, ঐরাবতকেও স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে হয়।

প্রধান যে-কথা লেনিন শিখিয়ে গেছেন, তার কিয়দংশের উল্লেখ করলেই হবে। সোশালিজম-এর জন্য লড়াই, আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শক্তির শ্রেণীগত সংগ্রাম এবং পরাধীন দেশসমূহের মুক্তি প্রচেষ্টা, এই ত্রিবেণীকে লেনিন যুক্ত করেছিলেন। পাশ্চাত্যের অগ্রগামী দেশে সোশালিস্ট বিপ্লব না ঘটে জার সাম্রাজ্যে তা ঘটায় বিচলিত হওয়া দূরে থাক রীতিমতো আশান্বিত হয়ে তিনি বলেছিলেন আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় ঐ এক দেশেই সোশালিজম প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সমীচীন, সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিলেন যে সোভিয়েতের কর্মকাণ্ড দুনিয়ার বুর্জোয়া শক্তির সমবেত ও ঐকান্তিক শত্রুতাকে পরাভূত করে দেশ থেকে দেশান্তরে সমাজবাদের জয়যাত্রা আনতে প্রচণ্ড সহায়তা করবে। সাম্রাজ্যশাসনে পীড়িত পরাধীন দেশগুলির অবশ্যম্ভাবী মুক্তি সম্বন্ধে একাগ্র অভিনিবেশবলে লেনিন সিদ্ধান্ত করেন যে সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল ছিন্ন করে তারা অচিরে বুঝবে যে স্বাধীনতার প্রকৃত পরিণতি হলো সমাজবাদ এবং সেজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যন্ত্রণাকে এড়িয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা তাদের করতে হবে—পৃথিবীর কতিপয় দেশে সোশালিজম জয়ী হওয়ার কল্যাণে ধনবাদী পথ পরিহার করেই তারা স্বকীয় বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে। আজকের যুগ সম্বন্ধে বলা যায় যে লেনিনের ঋষিনেত্রে যা গোচরীভূত হয়েছিল, তা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদ বস্তুটি আজ প্রায় পৃথিবীর কোথাও নেই, এ-কথা দুনিয়া যেমন মানবে না—তেমনই ধনতন্ত্রের প্রসাদে অগ্রসর দেশগুলো বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে বলে বিপ্লব বাতিল, একথাও মানা চলে না। লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ধনতন্ত্রের চরম স্তর' হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ আজও নির্মূল হয়নি।

প্রত্যক্ষভাবে আজ সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া হয়েও মাটি আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছে পর্তুগীজ, আঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি-বিসু প্রভৃতি দেশে আর দক্ষিণআফ্রিকা, রোডীশিয়ার মতো এলাকায়। পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদ আজ ব্যস্ত দুনিয়ার সর্বত্র—সোশালিজমকে ধ্বংস করার হাজার পরিকল্পনা ছাড়াও নির্লজ্জ নোংরা লড়াই চালাচ্ছে ভিয়েতনামে, কোরিয়ায়, কিউবার বিপক্ষে, গোটা মধ্যপ্রাচ্য আর সবকটা সদ্যস্বাধীন দেশে। যত পুরু বোরখা পরিধান করুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদের নবরূপ দেখিয়ে কাউকে ভোলানো চলছে না—তার শঠতা, তার ক্রূরতা, তার বীভৎসতা ঢেকে রাখবাব নয়।

একচেটিয়া কারবার সম্বন্ধে লেনিনের সিদ্ধান্ত আজ অচল বলার মতো বাতুলতা নেই। বেশি কথার দরকার নেই—হয়তো যথেষ্ট হবে দু-একটি মার্কিন দৃষ্টান্ত। এই শতাব্দীর প্রথমে U. S. Steel Corporation সবচেয়ে বড়ো শিল্পসংস্থা বলে যখন বিখ্যাত ছিল, তখন তার শ্রমিক ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ২,১০,১৮০। আজকের সবচেয়ে প্রকাণ্ড ব্যবসা হলো General Motors, যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলো বিড়লার হিন্দুস্থান মোটরসের মুরুব্বি। এই 'জেনারেল মোটরস'-এর কর্মীসংখ্যা হলো ৭,৬০,০০০; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আঠারোটি রাজ্যের মোট রাজস্বের বেশি এই শিল্পসংস্থার নীট মুনাফা—নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফর্নিয়া ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যেরই রাজস্ব পরিমাণে 'জেনারেল মোটরস'-এর নীট লাভের কাছাকাছি আসতে পারেনি ১৯৫৫ সালের হিসাব অনুযায়ী। দু-লক্ষের মধ্যে দুশো কোম্পানি সেখানে দেশের শতকরা শিল্পোৎপাদনে ষাটভাগ কবুল করে রেখেছে। আমেরিকার ধনপতিদের বিদেশে লগ্নি করা পুঁজির পরিমাণ ৫০০০ কোটি ডলার (প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা)। একে বাঁচানো এবং বাড়ানোর জন্য তার যুদ্ধায়োজন—ভিয়েতনামে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যত্র হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে চলা, নৃশংসতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখানো, মানুষ মারার অভিনব উপায় উদ্ভাবন, পরমাণু যুদ্ধের আতঙ্কে জগৎকে অভিভূত করে রাখা ইত্যাদি নয়া-সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অপরিহার্য। খুব উচ্চস্তরের এক সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে যুদ্ধের জন্য এই অপরিসীম অপব্যয়কে সংযত করার উপায় অবলম্বন করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়—করতে গেলেই অর্থনীতির বনিয়াদ ভেঙে পড়বে। 'Report from the Iron Mountain' শীর্ষক গ্রন্থটি পড়লে আতঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। সোশালিস্ট দুনিয়া চায় শান্তি,

যাতে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও সর্ববিধ উৎকর্ষ সাধনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ধনবাদী দুনিয়া শান্তিকে ভয় করে—বিপুল ব্যবসা এবং তদনুপাতে প্রত্যাশিত মুনাফাকে নিশ্চিত করার জন্ত যুদ্ধসম্ভাবনা এবং যুদ্ধায়োজনের উপর নির্ভর তাকে করতেই হবে। উপায়ান্তর নেই। এরই বিপক্ষে আমেরিকার মতো দেশের মধ্যেই প্রচণ্ড প্রশ্নের ঝড় উঠেছে—সেখানকার তরুণ মনে জিজ্ঞাসা: 'আমরা কেন ভিয়েতনামের জঙ্গলে যুদ্ধ করতে যাব, কার স্বার্থে যাব, কেনই বা যাব?' অনেকে সেখানে সমাজকে পরিহার করে উদ্ভট উৎকট জীবনের দিকে যাচ্ছে, আর অনেকে বুঝছে লেনিনের শিক্ষার সত্যতা—ধনতন্ত্র সঙ্কটাপন্ন, একান্ত রুগ্ন, প্রায় মুমূর্ষু, এর রূপান্তর ঘটাবার দায়িত্ব আজকের সমাজের।

'The Year 2000' নামে এক গ্রন্থ সম্প্রতি লিখেছেন দুই মার্কিন পণ্ডিত Hermann Kahn ও Anthony J. Wiener. এঁদের হিসাব হলো যে ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য হবে আনুমানিক তিন লক্ষ তেইশ হাজার একশো কোটি ডলার, আর তখন ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য হবে আনুমানিক ২৬ হাজার কোটি ডলার। এঁরা আরও হিসাব করেছেন যে মাথাপিছু আয় ২০০০ সালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের হবে ভারতের চল্লিশ গুণ বেশি!

ধনতন্ত্র দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান করে ফেলেছে বলে যে রূপকথা প্রায়ই প্রচারিত হয়ে থাকে, তার ফাঁদে পা দেওয়া সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা আমাদের সতর্ক করে রেখেছে। আমেরিকার কিম্বা পশ্চিম ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে জীবনের মান বেড়েছে সন্দেহ নেই—তারা দারিদ্র্যকে রপ্তানী করতে পেরেছে আমাদের মতো মন্দভাগ্য দেশে আর পেরেছে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের কৌশল প্রয়োগ করে। সেই কৌশলকে বজায় রাখারই আপ্রাণ চেষ্টা তারা আজ করছে। ঐসব দেশেও সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার পরিমাণ কম নয়, সামাজিক বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা সেখানে যথেষ্ট প্রকট—বহু লক্ষ শ্রমিকের সমবেত দীর্ঘায়ত সংগ্রামী ধর্মঘট তাই প্রায়ই সেখানে ঘটে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো অধিবাসীদের বিপুল যে অভ্যুদয় গত দশকের অবিস্মরণীয় ঘটনা, তার অনুধাবন করার প্রয়োজন তাই এত বেশি। কিউবার সোশালিস্ট বিপ্লব যে গোটা দক্ষিণ আমেরিকায় ভূমিকম্পের সঙ্কেত, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিদারুণ দুশ্চিন্তা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। আমাদের মতো পিছিয়ে-পড়া দেশগুলোকে

কুক্ষিগত করে অনাহারে অশিক্ষায় আটক না রাখতে পারলে ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই। গরীব দুনিয়া মূল্য দিচ্ছে আর পাশ্চাত্যের সচ্ছল দেশগুলি খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে থাকছে—এই স্ববিরোধী ব্যবস্থা বাঁচতে পারে না। তার সংহার ঘটিয়ে নব সমাজের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র সফল করার মূলসূত্র রয়েছে লেনিনের শিক্ষায়, লেনিনের নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলার সঙ্কল্পে, লেনিনের নায়কত্বে স্থাপিত সমাজবাদী ব্যবস্থার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত নীতি এবং কৌশলগত সিদ্ধান্তে।

"সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু"—ভারতবর্ষের এই চিরন্তন আকুলতা নিহিত ছিল লেনিনের মানসে। পরাধীনতার অভিশাপ লুপ্ত হোক, মুক্ত মানুষ সম-সুযোগের সমাজে সার্থকতার সন্ধানে চলতে সমর্থ হোক, মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থান বিশ্বব্যাপী শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাক, এই ছিল লেনিনের কামনা। মার্কস-এর মতোই তিনি বলতে পারতেন যে ষাঁড়ের চামড়া যখন আমাদের নয় তখন মানুষের দুর্দশা দেখে পিঠ ফিরিয়ে থাকি কেমন করে? চিন্তা ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। আমরা দেখলাম তাঁকে শুধু মনীষী রূপে নয়—দেখলাম অমিততেজ, অক্লান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, সমাহিতপ্রাণ কর্মবীর রূপে।

কাউটস্কির সোভিয়েত-বিরোধী বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন (১৯১৮) যে "সর্বহারার একাধিপত্য সবচেয়ে অগ্রসর গণতন্ত্রের চেয়ে হাজার গুণ শ্রেয়।" সোশালিজম সম্বন্ধে তাঁর মনের নিশ্চিতি ছিল অটল, অকাট্য, অমোঘ। সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে বহু বাধা বহু প্রতিবন্ধক তিনি জানতেন; বিপ্লবের মূল্য যে মর্মান্তিক হতে পারে তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। কিন্তু সোশালিজমকে যেন তিনি বলেছিলেন প্রাচীন ভারত-ঋষির ভাষায়:

"প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়তমম্ হবামহে।
নিধীনাম্ ত্বা নিধিতমম্ হবামহে।"

তিনি তাই সসাগরা ধরিত্রীর সর্বত্র মানুষকে জাগিয়ে তোলার ডাক দিয়েছিলেন—অণুক্ষণের জন্যও ভোলেননি ইয়োরোপের বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মুক্তি-প্রয়াসের সম্পর্ক, সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মতো দেশ নিয়ে তিনি এত অনুশীলন করেছিলেন, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সর্বদা

সহায়তায় উদগ্রীব ছিলেন। তাই আন্তর্জাতিকতা ছিল এই মানুষটির স্বাভাবিক ভূষণ, জাতিবৈরের স্পর্শ মাত্র থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন।

তরুণ বয়সে কার্ল মার্কস-এর জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত করে নিয়ে এই ভাস্বর মনস্বী কর্মক্ষেত্রে উত্তুঙ্গ বিপ্লবী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ইতিহাসকে প্রদীপ্ত করে রেখেছেন। লেনিনের মরদেহ আজও মস্কো শহরে রক্ষিত, প্রতিদিন সেখানে অবিরাম জনসমাগম। কিন্তু শুধু সেখানে তাঁর অবস্থিতি নয়—তিনি আজ সর্বব্যাপ্ত। শিবহীন যজ্ঞ অসম্ভব বলা হতো এককালে, তেমনই লেনিনের জাগ্রত প্রেরণা বিনা নব-সমাজ আজও অচিন্তনীয়। শোষণের অবলুপ্তি যে ঘটবে, তা আগামী প্রভাতের সূর্যোদয়ের মতো অকাট্য। তেমনই অকাট্য হলো ঐ অবলুপ্তিকরণের সঠিকতম অস্ত্র রূপে লেনিনের শিক্ষা, লেনিনের দীক্ষা।

সোভিয়েট বিপ্লব ও আমরা

সোভিয়েট বিপ্লব ঘটার পর থেকে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কেটে এল। কাল নিরবধি এবং পৃথ্বী বিপুলা এই আপ্তবাক্য আমরা জানি। কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লবের অর্ধশত অব্দপূর্তি এমন এক সুগভীর ব্যঞ্জনাময় ঘটনা যে সেই উপলক্ষে যেন সতত সঞ্চরমান এই বিশ্ব মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে তাকে অভিবাদন করবে। হয়তো কোন এক ভবিষ্যতে সূর্যরশ্মি নির্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীর জীবনাবসান ঘটবে, কিন্তু যতদিন পৃথিবী আর মানুষের অস্তিত্ব থাকছে ততদিন সোভিয়েট বিপ্লবের স্মৃতি ও তার মহিমা যে দেদীপ্যমান হয়ে বিরাজ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট শাসনের জীবৎকাল যখন ত্রয়োদশ বৎসরও পূর্ণ হয়নি, বিশ্বের তাবৎ রাজ্য মিলে তাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় বিফল হয়েও যখন হাল ছেড়ে দেয় নি, বহুতর উপায়ে তার পতন সাধনের প্রযত্নে যখন তারা লিপ্ত, শত্রু-পরিবৃত হয়ে থেকে যখন সোভিয়েটের পক্ষে তার দৈন্যাবস্থা মোচন করা সম্ভব হয়নি, আপাতদৃষ্টিতে যখন মনে হওয়া অসঙ্গত ছিল না যে ধনিক বেষ্টনীর চাপে তার সাম্যবাদী সত্তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া প্রায় অনিবার্য, তখনই আমাদের রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সোভিয়েট দেশে, অনেক বন্ধুজনের আতংকিত সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই গিয়েছিলেন। যা দেখেছিলেন, তার সবই যে পূর্ণ মনঃপূত হয়েছিল তা নয়, তখনই বন্ধুভাবে সোভিয়েট ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা জানিয়ে দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু তাঁর সত্যসন্ধ অন্তর পুলকিত হয়েছিল ইতিহাসে মানুষের সম্পূর্ণ নূতন এক অভিযান দেখতে পেয়ে। আমাদের দেশের লোক রবীন্দ্রনাথকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'ঋষি' বলে অভিহিত করেছে—প্রকৃতই যেন তাঁর ছিল তৃতীয় নেত্র—যা ঘটনার বহিরাবরণ ভেদ করে অন্তঃস্থিত সত্যকে আবিষ্কারের শক্তি রাখত। তাই মনের কথার দ্ব্যর্থহীন অভিব্যক্তি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় ভাস্বর ভাষায়:

"সভ্যতায় ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে

হয়েছিল নরমাংসজীবি রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচ্‌ব।...মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রচণ্ড এক বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব।...নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তুলবার সাধনা করছে, যেটাকে বলে লোভ।... তাদের এই সাধনা সফল হোক।"

শিল্পীর হাতে থাকে জাদুদণ্ড, যার স্পর্শে এই কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত পংক্তিতে আছে শুভবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির এমন সংমিশ্রণ যা হল রাজনীতির নাগালের বাইরে। সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে রাশিয়া থেকে আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার ঐশ্বর্যের চাকচিক্য তাঁকে পীড়িত করেছিল, এবং তিনি বলেছিলেন যে কুবেরের সম্পদের মতোই তাহ'ল অন্তঃসারশূন্য, আর সোভিয়েটের কথাই কেবল তাঁর মনকে তখন ভরে রেখেছিল, "সর্বমানবের লক্ষ্মীলাভ" অসম্ভব ও অবাস্তব নয় জেনে তাঁর হৃদয় উল্লসিত হয়েছিল।

"যত্র বিশ্বম্‌ ভবত্যেকনীড়ম্‌" এই বেদবাক্য স্মরণ করে আমাদের যে কবি শান্তিনিকেতনে সর্ববিশ্বকে আহ্বান করেছিলেন সর্ববিধ বীভৎসাকে ধিক্কার জানিয়ে আজীবন সাধনা করেছিলেন যাতে হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতেই মহা-মানবের আবাহন ঘটাতে পারে, তাঁরই মুখ থেকে আমরা শুনেছি যে ভারতবর্ষের চারণ-কবি তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়েছেন, কিন্তু যেখানে হচ্ছিল "ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ" সেখানে না গেলে যে তাঁর তীর্থপরিক্রমা অসম্পূর্ণ থাকত! তাই যখন কবি মৃত্যুশয্যায়, এবং অসম যুদ্ধে সোভিয়েটের সম্পূর্ণ বিপর্যয় আসন্ন এই আশার ছলনে যখন তার চিরাভ্যস্ত শত্রুবৃন্দ সমুৎফুল্ল, তখনও তিনি শুশ্রূষারত আত্মীয়বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতেন যুদ্ধের সংবাদ এবং বলতেন, বার বার বলতেন যে তিনি নিশ্চিত সোভিয়েট জিত্‌বে-ই। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে ইতিহাসে জন্ম পেয়েছে এমন এক শক্তি যা হল অপরাজেয়, যা ভবিষ্যতকে গড়বে, মানুষকে নূতন পথের নিশানা দেবে, প্রকৃত কালান্তর ঘটাবে। সোভিয়েট বিষয়ে ভারতবর্ষের মানসিকতা সব চেয়ে ঋজু ও সত্য মূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের অতুলন বিবৃতির মধ্য দিয়ে।

*

বিপ্লব বিষয়ে অধীর, অশান্ত, এমনকি উগ্র আগ্রহকেও সর্বদা অশ্রদ্ধেয় মনে করার কোন হেতু নেই। অবাস্তব আতিশয্য অবশ্যই বর্জনীয়, কিন্তু বিপ্লবের বিস্তার শ্লথগতিতে হতে থাকলে ব্যাকুল বিচলিত মনকে অধিকার করে বসা অস্বাভাবিক নয়, বিপ্লবের গতিকে ত্বরিৎ ও প্রকৃতিকে আরও স্বার্থক করার প্রয়োচনা সেই বিচলিতি থেকেও আসতে পারে। সোভিয়েট বিপ্লবের মতো ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনার কাছে প্রত্যাশাও বহুজনের মনে সুবিপুল রূপ নিয়েছে, আর সোভিয়েট বৃত্তান্তের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখা গেছে যে এই প্রত্যাশার পরিপূর্ণ পরিতুষ্টির অভাবে খেদ এসেছে, খেদ থেকে কোন ক্ষেত্রে আবার এসেছে অধৈর্য আর ক্রোধ, আশাভঙ্গ আর অভিমানে যার শুরু, সুকৌশলে তার পরিণতি ঘটিয়েছে বহুরূপী শত্রুশক্তি সোভিয়েট-বিরোধিতার মধ্যে। বাস্তব যেখানে কঠোর, জীবন যেখানে জটিল, বিপ্লব রূপায়ণের পথে সঞ্চিত ও বৈরী-নিক্ষিপ্ত প্রতিবন্ধক যেখানে অজস্র এবং সেইজন্যই বিপ্লবের পদচারণায় যখন অনিবার্য ভাবেই কখনও অগ্রগমন ও কখনও পশ্চাদপসরণের প্রয়োজন তখন বিপ্লবী চেতনা যাদের অপরিণত কিম্বা আবেগের সাময়িক প্রাবল্যে যারা বিপ্লবের সহজ মোহে আবিষ্ট, তাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা হল বিপ্লববিরোধী শক্তির এক মুখ্য লক্ষ্য। এর পরিচয় মিলেছে বারবার সোভিয়েট ইতিহাসে—এমন কোন পর্যায় যায়নি যখন বিপ্লবের বিশুদ্ধির নামে সোভিয়েট কর্মকাণ্ডকে অভিশপ্ত করা হয়নি।

বিপ্লবেরই নামে বিপ্লবকে পর্যুদস্ত করার প্রয়াস তাই ক্রমাগত হয়েছে এবং তাতে কিছু ব্যক্তি অশুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়েও অন্ধ ও অচেতন অবস্থায় যোগদান করেছে সন্দেহ নেই। শুধু মাত্র জারের প্রাক্তন সাম্রাজ্যে সোশালিস্ট সমাজ গড়তে নেমে সোভিয়েট বিশ্ববিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, গোটা ইউরোপে সোশালিজ্‌ম না এলে "এক দেশে সমাজবাদ" নির্মাণের পরিকল্পনা হল বিপ্লবের পরিপন্থী, এমন ধরনের অতিবিপ্লবী বাগাড়ম্বর, একদা বড় কম শোনা যায়নি। যে মহামতি লেনিন সম্বন্ধে ইতিহাসের সিদ্ধান্তে কোন দ্বিধা আছে বলে কেউ আজ বলার সাহস রাখে না, সেই লেনিনকে শুধু যে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা নয় (সমালোচনায় ক্ষতি নেই যদি তা হয় প্রকৃতপক্ষে সৎ সমালোচনা), তাঁকে আরও শুনতে হয়েছে যে তাঁর 'নূতন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা' হল নিছক বিপ্লবের সর্বনাশ ঘটিয়ে ধনতন্ত্রের

পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভূমিকা! তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু উপলক্ষ্য দেখা দিয়েছে যার সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের নামেই সোভিয়েট বিপ্লবকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে, সোভিয়েট ব্যবস্থাকে পর্যন্ত সংকটাপন্ন করে তোলা হয়েছে। আজকের পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় বহুভাবে পরিবর্তিত; জগতের এক-তৃতীয়াংশ এখন বিভিন্ন স্তরের সমাজবাদী পরিবেশে বাস করছে। কিন্তু আজও বৈপ্লবিকতার আতিশয্যের প্রকোপে বা উল্লাসে সোভিয়েটকে শোধনবাদী আখ্যা কোন কোন মহল থেকে দেওয়া হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নামে বিপ্লবকে বর্জন করা হচ্ছে বলে তিরস্কার করা হচ্ছে। অতি-উৎসাহীদের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে যে বিপ্লবী বিচারে সোভিয়েত এখন বাতিল, বিপ্লবের তত্ত্বকথা রয়েছে শুধু মাও সেতুংয়ের চিন্তায় আর কাজে। এভাবের কথাকে প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত যদি পৃথিবীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকত। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। মরেও মরতে চায় না এমন বৈরী হল নয়া সাম্রাজ্যবাদ, যা নিজের নোংরা স্বার্থকে জীইয়ে রাখার মতলবে সারা দুনিয়াকে পর্যন্ত মরণ কামড় দিতে পিছপাও নয়, যুদ্ধের অমানুষিক বীভৎসা যার হাতিয়ার, সমাজবাদী অভিযানে পৃথিবীর পুরোধা সোভিয়েটকে বিপর্যস্ত করে ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করাই যার অন্তিম সংকল্প সোভিয়েটের বিরুদ্ধে উগ্র বিপ্লবী উষ্মাকে আজ এই নয়া-সাম্রাজ্যবাদই কাজে লাগাতে ব্যগ্র। অতীতে যেমন অসামান্য তীক্ষ্ণধী, বিপ্লবী বাক্য বিন্যাসশক্তিতে অদ্বিতীয়, প্রভূত প্রতিভার অধিকারী অথচ অহঙ্কার, অভিমান ও আক্রোশবশে চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রণিধানে অসমর্থ এবং ভারসাম্যরহিত ট্রট্স্কি সদলবলে ও সর্ববিধ প্রকল্পে তদানীন্তন সোভিয়েট বিরোধী প্রচার ও কার্যক্রমে সহায়ক হয়েছিলেন, আজও তেমনই বিপ্লবমুখিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে অথচ কার্যত সমাজবাদের অমোঘ অগ্রগমনকে ব্যবহৃত করে এক ধরনের অসুস্থ আতিশয্য ও মানসিক উত্তপ্তি হয়তো বা কিছু সদ্বুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করছে। এই মারাত্মক ঝোঁক বিপ্লবের ইতিবৃত্তে অদৃষ্টপূর্ব নয়, কিন্তু আজ ব্যাধিরই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে কতিপয় সংস্থা ও ব্যক্তির অমূলক, অসংযত ও অশালীন সোভিয়েট বিদ্বেষে। নভেম্বর বিপ্লবের অর্ধশতাব্দীপূর্তি সমসাময়িক ইতিহাসচর্চার যে আহ্বান এনেছে তাতে সাড়া দিলে অবশ্যই চোখ খোলা উচিত, কিন্তু জেনেশুনে চোখ বুজে যারা থাকে তাদের কাছে প্রত্যাশা না রাখাই সমুচিত।

১৯৬৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট ত্রয়োবিংশ কংগ্রেসে হাঙ্গেরির প্রধান

নেতা কাদার যে কথা বলেছিলেন তা অত্যন্ত শোভন ও হৃদয়গ্রাহী বলে মনে পড়ে যাচ্ছে : "সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে নীতিসম্মত ভ্রাতৃত্ববোধকে সর্বদা আন্তর্জাতিকতার কষ্টিপাথর বলে আমরা ভেবে এসেছি, আজও তাই ভাবি। সোভিয়েট-বিরোধী কমিউনিজ্‌ম্ বলে কোন বস্তু কখনও ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও কোন কালে থাকবে না।"

বিপ্লবী মুখোস চাপিয়ে সোভিয়েটের মুণ্ডপাত করে বেড়ানো আজ যাদের অভ্যাস, তারা বেমালুম ডাহা মিথ্যা বলা হচ্ছে জেনেও চীৎকার করে থাকে যে ভিয়েৎনামের অসমসাহস মুক্তিযোদ্ধারা সোভিয়েট সহায়তা পাচ্ছে না। তারা জানে যে উপরোক্ত সোভিয়েট পার্টি-কংগ্রেসে ভিয়েৎনাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক লে হুয়ান বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি হো চি মিন্-এর বাণী পড়েছিলেন, যাতে সোভিয়েটের "মহামূল্য, সর্বমুখী ও অকাতর" সাহায্যের জন্য "আন্তরিক কৃতজ্ঞতা" প্রকাশে কোন কুণ্ঠা ছিল না। হো চি মিনের চিঠি শেষ করে তিনি বলেছিলেন অবিস্মরণীয় একটি কথা : "ভিয়েতনামী কমিউনিস্টদের কাছে মাতৃভূমি যেন দুটি—প্রথমত, ভিয়েৎনাম এবং দ্বিতীয়ত, যেদেশে সমাজবাদ প্রথম দিগ্বিজয়ী হয় সেই সোভিয়েট ইউনিয়ন। আমার দেশবাসীর ঐকান্তিক বিশ্বাস যে সোভিয়েট জনগণ কখনও আমাদের বিপদে ফেলে চলে যাবে না, কারণ, আমরা সবাই তো হলাম মার্কসের সন্তান, আমরা সবাই যে লেনিনের সন্তান।"

একথা অবশ্য মাঝে মাঝে মনে হওয়া অসঙ্গত বা বিস্ময়কর নয় যে ভিয়েৎনামের বীর জনশক্তিকে আরও বেশি সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন ও দায়িত্ব সকলের রয়েছে। মদমত্ত মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর উৎকট অমানুষিকতার সংবাদ মনকে যখন অসম্ভব রকম তিক্ত করে তোলে তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা করে তার বিরুদ্ধে সামগ্রিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে, আর সোভিয়েটের কাছেই পৃথিবীর জনতার প্রত্যাশা সবচেয়ে বেশি বলে মন চায় যে সোভিয়েট যেন আরও কঠোর হস্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে বিলম্ব না করে। ভিয়েৎনামের মানুষ আজ শুধু তার নিজের দেশের মাটির জন্য লড়ছে না, লড়ছে সারা দুনিয়ার ভবিষ্যৎকে বাঁচাবার জন্য —তাই মাঝে মাঝে শান্তি ও সহ-অবস্থানের কথাকে ব্যর্থ মনে হয়, হ্যানয়ে বোমা পড়ছে দেখে ক্রুদ্ধ মন চীৎকার করে উঠতে চায় যে আগুন ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র, যাতে পৃথিবীর যত ক্ষয়-ক্ষতি হোক্ না কেন। নয়া সাম্রাজ্যবাদ

তো অন্তত ছারখার হয়ে যাবে। এই অনুভূতিরই উদগ্র প্রকাশ দেখা গিয়েছে চীনের প্রচণ্ড উন্মাদনায়—পারমাণবিক যুদ্ধ বাধে বাধুক, জগতের অধিকাংশ মানুষ মরলেও অবশিষ্ট যারা থাকবে তারা নতুন সমাজ গড়বে। হাইড্রোজেন যুদ্ধের আতংক "কাগুজে বাঘ" ছাড়া কিছু নয়, এমন কথা শোনা গিয়েছে।

কে যেন সম্প্রতি বলেছিলেন যে আজকের রণসম্ভার নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বাধে তো যারা মরবে তারাই হবে সৌভাগ্যবান্, কারণ যারা বাঁচ্‌বে তাদের হাল যে কি নিদারুণ হবে ভাবতেই পারা যাবে না। সে যাই হোক, যুদ্ধ একটা অসম্ভব ভীতিজনক কাণ্ড এ-কথা শুধু বলে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ বলা যায় জোর করে—এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রায় দুনিয়ার সবদেশ মিলে দু'বার ঘোষণা করা হয়েছে—যে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ আজ সোশালিস্ট এবং বহুদেশে প্রখর মুক্তি আন্দোলন চলছে বলে সাম্রাজ্যবাদ এখনও টিঁকে থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ একেবারে অমোঘভাবে অনিবার্য নয়, এবং ঠিক সেজন্যই সর্বদেশের অগ্রগামী শক্তিকে অপরাজেয় করে তুলে শান্তি, মুক্তি এবং সমাজবাদের লক্ষ্যভেদ করাই হল সব চেয়ে বড় কাজ। এর মানে এই নয় যে কোথাও যুদ্ধ বিগ্রহ হবে না, সর্বত্র ধীরে সুস্থে জনতা এগিয়ে চলবে, শ্রেণীসংঘর্ষের তীব্রতা দেখা যাবে না, অনেকটা যেন রেশমের দস্তানা পরে আর গোলাপজল ছড়িয়ে বিপ্লবকে অভ্যর্থনা করা যাবে। এর মানে এই যে কমিউনিস্টদের বিশেষ করে তৈরী থাকতে হবে সকল অবস্থার জন্য, শুধু সতর্ক থাকতে হবে যে চিন্তারহিত আবেগের উচ্ছ্বাসে হঠকারিতা না ঘটে যায়, শত্রুশক্তি জিতবার কোন সম্ভাবনা না রাখে আর উপায়ান্তর থাকলে যেন আধুনিক যুগের যুদ্ধের অবিমিশ্র অমানুষিকতা থেকে পৃথিবীকে যথাসম্ভব রেহাই দেওয়া যায়। দুটো বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব আর ১৯৪৯ সালের চীনা বিপ্লব, তাছাড়া বিজয়ী সমাজবাদের ব্যাপ্তি এবং জাতীয় স্বাধীনতার প্রসার, সব মিলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে যার প্রকৃত সুযোগ সৃজনশীল মার্কসবাদের সহায়তায় নিতে পারলে সর্বধ্বংসী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতাকে নিশ্চয়ই রোধ করা যায়।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রসূত এই বিশ্বাস সোভিয়েট দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছে এবং সেইজন্য বর্তমান পৃথিবীর জটিল পরিস্থিতিতে সাম্যবাদী শিবিরের প্রমুখ শক্তিরূপে ইতিহাসের প্রতি দায়িত্ব পালন এবং সর্বমানবের কল্যাণসাধনে সোভিয়েত একান্ত কৃতসংকল্প।

ভিয়েৎনামের অসমসাহসিক মুক্তিযোদ্ধারা একথা জানেন বলেই তাঁরা বলতে কুণ্ঠিত নন যে সোভিয়েট তাঁদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি। এজন্যই বহু খুঁটিনাটি ব্যাপারে সোভিয়েট নীতি ও কার্যক্রমে সন্তুষ্ট না হয়েও, এবং বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে গেরিলাযুদ্ধের কায়দায় কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনা নিয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে মতদ্বৈধ থাকা সত্ত্বেও, কিউবার জনগণমন-অধিনায়ক নেতা ফিদেল কাস্ত্রো সোভিয়েটের কাছে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ইতস্তত বোধ করেন নি, এবং বুঝেছিলেন ও প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে গোটা কিউবার সমগ্র লোক সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি মানুষকে হারিয়েছে সোভিয়েট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, তবুও কিউবার সবচেয়ে দুর্দিনে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সোভিয়েট সংকোচ করেনি, কমিউনিস্ট ভ্রাতৃত্ববোধের এই হল জাজ্বল্যমান নিদর্শন। অবশ্য ভিয়েৎনাম এবং কিউবার বকলমে সোভিয়েটের মুণ্ডপাত করার মতো দুর্মতিসম্পন্ন কিছু লোকের চেহারা এদেশে আমরা যে দেখছি না তা নয়। এদের ক্ষেত্রে কে কোথা থেকে কলকাঠি নাড়ছে বলা শক্ত; এদের পিছনে কিছু নোংরা ব্যাপারও হয়তো আছে। সে যাই হোক না কেন, বিপ্লব নিয়ে এদের দম্ভ আর দাপাদাপি দেখে মনে পড়ে যায় মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ সম্বন্ধে আমাদের প্রবাদ বাক্য।

* * *

নয়া সাম্রাজ্যবাদের আর এক সোভিয়েটবিরোধী কৌশল অবলম্বন এবং প্রয়োগ করে চলেছে এই অতি উগ্র এবং তাজ্জব 'বিপ্লবী'রা। তাই উভয় মহল থেকে প্রায় একই সুরে শোনা যাচ্ছে যে সোভিয়েট এখন সমাজবাদ ছেড়ে ধনিকব্যবস্থা থেকে অনেক কিছু ধার করতে লেগেছে এবং সেজন্যই সোভিয়েট আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঝগড়ার চেয়ে গলাগলি হল বেশি, কথাকাটা-কাটির একটা ভাণ তাদের মধ্যে চলেছে বটে কিন্তু তারা হল একই পথের পথিক। চীনের মাও-গোষ্ঠী তো খোলাখুলি বলছেন যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আর সোভিয়েট শোধনবাদী হল কোন এক বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। আর মার্কসকে ছেড়ে মাও-য়ের শরণ নিয়ে উদ্ভট উদ্দামতায় এদেশে যারা গা ভাসিয়েছেন তারা উৎকট উল্লাসেই এ-কথা বলে বেড়াচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েটবিরোধী গবেষণাসংস্থা 'র‍্যাণ্ড কর্পোরেশন'-এর মোটা মাইনে পাওয়া 'পণ্ডিত'-দের প্রতিধ্বনি করছেন এদেশের কিছু 'বিপ্লবী'। অবশ্য এতে অতিরিক্ত বিস্মিত বা বিচলিত হওয়ার নেই, কারণ এ রকম ঘটনা বিপ্লবের ইতিবৃত্তে আকছার

দেখা গিয়েছে। আর এই বিপ্লবীপুঙ্গবদের বোঝার সাধ্য বা প্রবৃত্তি নেই কাদার-এর কথা যে সোভিয়েটবিরোধী কমিউনিজ্‌ম্ বলে কোন বস্তু ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।

লেখা ফেঁপে উঠছে বলে সংক্ষেপে কয়েকটা জিনিস উল্লেখ করলেই হয়তো চলবে। এই নয়াপণ্ডিতেরা বলতে চাইছেন যে সোভিয়েট ব্যবস্থায় অর্থ নৈতিক অগ্রগতি অনেকটা হয়েছে বটে। (এটা অস্বীকার করা আর আগের মতন সম্ভব নয়) কিন্তু অগ্রগতির পর দেখা যাচ্ছে সোভিয়েট সমাজবাদ এবং মার্কিন মুল্লুকের বিকশিত ধনিকবাদের মধ্যে ব্যবধান কমছে, প্রায় যেন একটা সামঞ্জস্য ঘটতে চলেছে, দুটো ধারা এক এক জায়গায় এসে যেন পাশাপাশি দাঁড়াচ্ছে ('Convergence')। ধনবাদী পণ্ডিতদের মতলব অবশ্য হল প্রমাণ করা যে ইতিহাস মার্কসের প্রতীক্ষিত পথ নেয়নি, মার্কসের মন্ত্র নিয়ে রুশ দেশে যে বিপ্লব ঘটেছিল তা শেষ পর্যন্ত ধনবাদী ধারার উৎকর্ষ ও সামাজিক সঙ্গতি মানতে বাধ্য হয়েছে, আর কতকগুলো ভুলচুক শুধরে নিয়ে ধনবাদী ব্যবস্থাই আবার দুনিয়াকে রাস্তা দেখিয়ে চলছে এবং চলবে। উগ্র বিপ্লবীরা অবশ্য মার্কসবাদের নামাবলী জড়িয়ে আছেন বলে এসব কথা উগরে বেড়ান না, শুধু সোভিয়েট যে এখন ধনবাদী পথে চলেছে এই কুৎসায় আকাশ তোলপাড় করে তোলাই তাদের মতলব।

এই সুবাদে প্রায়ই শোনা যায় সোভিয়েট অধ্যাপক লিবেরমান্-এর নাম। তিনিই নাকি সোভিয়েট অর্থনীতিতে ধনিক ধারণা যারা ঢুকিয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান! তিনিই নাকি উৎপাদন ব্যবস্থায় মুনাফার ভূমিকা সম্বন্ধে ধনবাদী চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছেন এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষও তাতে সায় দিয়েছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি! এরকম কথা না বলে চলছে না এজন্য যে সোভিয়েট অর্থনীতির বিকাশ এমনই অনস্বীকার্য যে তাকে ধনতন্ত্রেরই সংস্করণ বলে জনসাধারণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন না করতে পারলে চলছে না—যা কিছু অর্থনীতি ব্যাপারে মূল্যবান তা ধনবাদেরই অবদান একটা 'যেন তেন-প্রকারেণ' বলার বিরাট তাগিদ এসেছে। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় বলে সম্প্রতি 'সোভিয়েত সমীক্ষা' (১৪ আগস্ট ১৯৫৭) পত্রিকায় স্বয়ং অধ্যাপক লিবেরমান্-এর একটি রচনার উল্লেখ করা যায়। অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকী যতই কাছে আসছে ততই এই কুৎসার ঝড় কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হচ্ছে কারণ তা না হলে কেমন করে ঐ যুগান্তকারী ঘটনার

কদর্থ করে জনতার মন বিষিয়ে দেওয়া যাবে? শান্ত, সংযত ভাষায় লিবেরমান সমাজবাদের 'মারাত্মক দুর্বলতা' এবং সোভিয়েট ব্যবস্থায় 'মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি' এই দুই অভিযোগের সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। আলোচনাকে তথ্যভিত্তিক করার জন্য প্রথমেই তাই কয়েকটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন: অসম্ভব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সোভিয়েট যুগে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে ৬৬ গুণ (১৯১৩-র তুলনায় ১৯৫৬-এ), শিল্পব্যবস্থার মেরুদণ্ডবৎ ইঞ্জিনিয়ারিং উদ্যোগে প্রসার ঘটেছে ৫৩৮ গুণ; ১৯২৯-৫৬ সালে সোভিয়েট দেশে শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১১.১ ভাগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৪ ভাগ, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে শতকরা ২.৫ ভাগ; ১৯৫৩-৬৫ সালে সোভিয়েটের জাতীয় আয় বাড়ে শতকরা ২৬৪ ভাগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬৬ ভাগ; একই কালে সোভিয়েটে জনপ্রতি জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা ১৮৫ ভাগ, মার্কিন দেশে শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ। লিবেরমান্ তারপর বলছেন যে কোথাও হালে পানি না পেয়ে রেমণ্ড অ্যারন্ প্রমুখ 'ক্রেম্‌লিন-বিদ্' পশ্চিমী তাত্ত্বিক বলছেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ থেকে ২৮ ভাগ বিনিয়োগে ব্যয় করছে, অর্থাৎ সম্ভোগ নিয়ন্ত্রিত করে অত্যধিক সঞ্চয়ের নীতি অবলম্বন করেছে, বিপুল বিনিয়োগের জোরেই নির্মাণ ও উৎপাদনের বিকাশ সাধন করতে পেরেছে, অর্থাৎ প্রকারান্তরে মুনাফার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করে ধনবাদের বাঁধানো রাস্তায় পা দেওয়ার উপক্রম করছে!

এই সমালোচকদের আশ্বস্ত করেছেন লিবেরমান্। সোভিয়েট কোন অর্থনৈতিক ইন্দ্রজালে বিশ্বাস করে না। গোটা পৃথিবীর শত্রুতাকে ঠেকিয়ে, বিদেশ থেকে ঋণ না এনে, দেশবাসীর অসম্ভব আত্মত্যাগ ও সংকল্পশক্তির জোরে সোভিয়েট আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থব্যবস্থায় পদ্ধতি-গত যে পরিবর্তন মাঝে মাঝে হয়েছে, তা কোন গোপন রহস্যে আবৃত নয়—বিভিন্ন পার্টি কংগ্রেসে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সে-আলোচনা সারা দুনিয়াকেও জানাতে ত্রুটি ঘটেনি। সোভিয়েট ধনবাদী বনে যাচ্ছে বলে যারা সোচ্চার, তাদের অজানা থাকার কথা নয় যে উৎপাদনের সর্ববিধ উপায় ও উপকরণের মালিকানা কোন ব্যক্তি কিম্বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত সংস্থার হাতে নেই—সেখানকার শ্রমজীবী মানুষ (এবং পরশ্রমজীবী ব্যক্তির অস্তিত্ব সে দেশে নেই) জানেন যে নিজেদের সাধারণ সামাজিক লক্ষ্য সাধনের

জন্যই তাঁরা কাজ করছেন। তাছাড়া মার্কসবাদের নীতি এবং নির্ধারণ (যা কোন গুহ্য মন্ত্র নয়, যা এই পরিবর্তমান জীবনে প্রযোজ্য কারণ বাস্তব সমাজ-ধারার সঙ্গে তার সঙ্গতি) অনুযায়ী কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের উদ্যোগ চলছে উৎপাদনের সম্ভাব্য বিকাশের চরম সংঘটনেরই আয়োজন হচ্ছে, সমাজের যৌথ সম্পদের প্রতিটি ধারাকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চলছে, ক্রমশ সেইদিন এগিয়ে আনার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে যখন প্রতিটি মানুষকে তার পূর্ণ আয়োজন বণ্টন করতে পারবে উৎপাদন ব্যবস্থার সাফল্য। এরই এক প্রাক্তন অধ্যায় দেখেই তো রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়েছিলেন 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ'। সেই যজ্ঞফল সমাজবাদী দেশে সর্বজনের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা আজ নিকট বলেই তো ধনতান্ত্রিক জগতে এত চিত্তচাঞ্চল্য। পরিতাপ শুধু এই যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ক্ষুদ্র হলেও একটি অংশ আজ এই বিপুল ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারছে না বা চাইছে না। অবশ্য খেদ করে লাভ নেই, আর সাফল্য তো সর্বদাই সংগ্রামেরই উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

চীন থেকে প্রধানত যে অপতত্ত্বের অভ্যুদয় হয়েছে, তারই প্রসঙ্গে লিবেরমান বলেছেন যে বিপ্লবের আদর্শে যথার্থ আত্মনিবেদিত-প্রাণ হওয়ার সঙ্গে বিপ্লব সফল হলে জনসাধারণের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার অভিলাষের বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি নেই। সোভিয়েটের যে কাহিনী তাতে বিপ্লবী আত্মত্যাগের অগণিত ও অবিস্মরণীয় উদাহরণ রয়েছে, কিন্তু স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে শুধু আত্মত্যাগেই বিপ্লবী চেতনা যে প্রকাশ পাবে তা নয়। বিপ্লব শুধু বহ্ন্যুৎসব নয়, তাতে কঠিন অনলস প্রয়াসের প্রচণ্ড দায়িত্ব রয়েছে। 'ছোট বড় সব কিছুতেই বিপ্লবী আত্মনিয়োগ মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত দাবী। সমাজবাদী দেশগুলির প্রধান বৈপ্লবিক দায়িত্ব পুরাতন জগতের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় জয়ী হওয়া, সামগ্রিকভাবে সমাজের এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক নাগরিকের সমুন্নত নৈতিক ও বৈষয়িক মান অর্জন করেই জয়যুক্ত হওয়া।'

সোভিয়েটের কাছে সর্বদেশবাসীর প্রত্যাশা অবশ্য এমনই বিপুল যে সবদা তার পরিতুষ্টি সম্ভব হয় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিম্বা পরস্পর সহায়তার ব্যাপারে হয়তো তাই মাঝে মাঝে আমাদের মনে কিছু নৈরাশ্যেরও সঞ্চার অস্বাভাবিক নয়। দুনিয়ার বঞ্চিততম দেশগুলিতে আমরা যারা বাস করি, তারা যদি কখনও কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ বোধ করি, ভিয়েৎনামের স্বপক্ষে কিম্বা

ইজ্‌রেল-এর মতো অশুভ শক্তির বিপক্ষে সোভিয়েটের কার্যকারিতা আশানুরূপ না হওয়ায় বেদনাবোধ করি, হয়তো বা সেই বেদনাকে প্রকাশ্যে জ্ঞাপনও করি, তাতে সোভিয়েটের পক্ষ থেকে কোন প্রকার ভুল বোঝাবুঝি হবে না আশা করব। কিন্তু কিছুতেই ক্ষমার্হ নয় তারা, যারা সোভিয়েট সতত এবং সর্ব অবস্থায় বঞ্চিত বহু দেশের পরিপূর্ণ ইচ্ছাপূরণের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা এখনও রাখে না বলে সোভিয়েট বিরোধিতার কলঙ্কাঙ্কিত ধ্বজা তুলে বেড়াতে কুণ্ঠা বোধ করে না। সোভিয়েটকে যারা ভালোবাসে, সোভিয়েটের কাজ সম্বন্ধে অতৃপ্তি এবং অভিমানের অধিকার তাদের নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু কমিউনিজমের আল্‌খাল্লা পরে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নিছক মতলবী বিষোদ্‌গার আজ যাদের পেশা, তাদের মার্জনা নেই।

* * *

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে, হিটলারী আক্রমণে সোভিয়েটের নাভিশ্বাস উঠছে কল্পনা করে পুঁজিবাদী দুনিয়া যখন উল্লসিত, কলকাতায় যখন আমরা অনেকে মিলে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি গঠন করে ক্ষুদ্র সাধ্য সত্ত্বেও তৎকালীন কর্তব্য পালনের প্রয়াসে নেমেছি, তখন সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মর্মস্পর্শী সমাবেশে হঠাৎ মনের মধ্যে ঘুরতে লেগেছিল একটি কথা: 'সোভিয়েট আমারও দেশ!' কিছু পরে ঐ আখ্যা দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে কারও কারও কাছে বিদ্রূপের ভাগী হয়েছি—এমন কি বহুদিন কেটে গেলেও খ্যাতিমান এবং অধুনা মন্ত্রীপদারূঢ় এক বন্ধু সকৌতুকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সেই প্রবন্ধের কথা যখন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে স্টালিনের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সমালোচনায় মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখে আমরা কেউ কেউ পীড়িত ও বিচলিত বোধ করি। কিন্তু সোভিয়েট সম্বন্ধে ঐ উক্তি করে কখনও নিজেকে অপ্রতিভ মনে হয়নি, লেশমাত্র লজ্জিত বা বিব্রত অনুভব করিনি। তাই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেসে ভিয়েৎনামী কমিউনিস্ট নেতার পূর্বোদ্ধৃত বাক্য বিশেষ রকম ভালো লেগেছিল।

সোভিয়েট বিষয়ে এই মনোভাবকে ব্যক্তিগত মানসিক প্রতিক্রিয়া বলে ধারণা করা ভুল হবে। বেশ মনে আছে (এবং বাংলায় ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতি সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধরণী গোস্বামীকে সেদিন বলছিলাম) ২২শে জুন ১৯৪১ তারিখের একটি ঘটনা। সোভিয়েট ভূমি সেদিনই অতর্কিতে এবং অত্যন্ত মারাত্মকভাবে হিটলার-বাহিনী অভূতপূর্ব অস্ত্র সমাবেশ নিয়ে আক্রমণ

করেছে। প্রথম আচমকা আঘাতের প্রচণ্ড প্রকোপে লাল ফৌজকে নিদারুণ ক্ষতি এবং পশ্চাদপসরণের গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে। এই আকস্মিক ও পরাক্রান্ত ফ্যাশিস্ট তাণ্ডবের সংবাদ জগৎকে স্তম্ভিত করেছিল, আর আমাদের মনের গভীরে, অন্তরের অন্তস্তলে সঞ্চারিত হয়েছিল সোভিয়েট ভূমি সম্বন্ধে নূতন এবং আত্মীয় এক অনুভূতি। ইতিহাসের প্রথম শোষণমুক্ত সমাজবাদী দেশ সম্বন্ধে একান্ত স্বজনবোধ। মনে আছে সেদিন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত দেশভক্তদের মধ্যে অন্যতম এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপের কথা। বহু গুণান্বিত এই মানুষটি গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে ছিলেন, পরে প্রভূত অনুশীলন ও আত্মপরীক্ষার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন, স্বল্পকালের জন্য হলেও বিপ্লবী আন্দোলনে প্রকৃষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন, অসামান্য বাগ্মিতার গুণে বক্তব্যকে জনসমক্ষে অগ্নিশিখার মতো প্রোজ্জ্বল করতে পারতেন এক কালে, অথচ কিছুটা প্রতিকূল এবং কিছুটা স্বয়ংসৃষ্ট পরিস্থিতির প্রভাবে প্রায় অজ্ঞাতবাস আজও করছেন, কমিউনিস্ট পার্টির কাজে একদা সাময়িকভাবে অথচ বিপুল নিষ্ঠা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেও জ্ঞাতসারেই একক ও অসার্থকভাবে কালাতিপাত করছেন। সেদিন, ১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখে সোভিয়েট দেশ আক্রান্ত হয়েছে শুনে তাঁর চোখে আগুন ফুটে উঠেছিল—বলেছিলেন সোভিয়েটকে জিততেই হবে। তা নইলে আমাদের ভারতবর্ষকেও যে কত দীর্ঘদিন ধরে পরাধীনতার জ্বালা সইতে হবে!

আমাদের স্বদেশ তখন পরাধীন। সকল আবেগকে ছাপিয়ে তখন ছিল স্বদেশের মুক্তি-কামনা। জননী জন্মভূমির শৃঙ্খলমোচন তখন দিবারাত্রির স্বপ্ন। স্বাধীনতার চিন্তা তখন দেহে-মনে রোমাঞ্চ আনত, শিরায় শিরায় তড়িৎপ্রবাহ ঘটিয়ে দিত—আমাদের সত্তার সর্ববিধ সার্থকতা তখন দেশের মুক্তির প্রতীক্ষায়। কিন্তু তখনই দেশপ্রেম ও সাম্যবাদের মূলগত সামঞ্জস্য সাধ্যানুযায়ী আমরা হৃদয়ঙ্গম করেছি—ভুলভ্রান্তি যে হয়নি তা নয়, কিন্তু দেশাভিমান ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়াসে নেমেছি। এ শুধু আমাদের কথা নয়, যেখানেই মানুষের অধিকার অস্বীকৃত, যেখানেই জনজীবনে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা, সেখানেই দেখা গেছে প্রথম সমাজবাদী দেশ সোভিয়েট সম্বন্ধে আত্মীয় অনুভূতি। সোভিয়েট বিপ্লবের অব্যবহিত পরে কয়েক বৎসর ধরে যে দুর্দিন ও সর্বাত্মক সংকট চলেছিল তাকে পরাজিত করার রসদ সোভিয়েট পেয়েছিল

বিভিন্ন দেশের জনতার সমর্থন থেকে। সোভিয়েটের নিজস্ব শক্তি ইতিহাসকে দীপান্বিত করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু জগজ্জনের এই মৈত্রী ও সহায়তার আগ্রহ হল সোভিয়েটের অক্ষয় সম্পদ। সেদিনের প্রকৃত বিপন্ন সোভিয়েট আত্মবিশ্বাস হারায় নি, এই ঐশ্বর্যের অস্তিত্ব তার অজানা ছিল না বলে।

ভারতবর্ষের মুক্তি-প্রচেষ্টা সোভিয়েট বিপ্লবকে যেন স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই তার সহায়ক মনে করে এসেছে। তাই মস্কো যখন বিপ্লবের তীর্থস্বরূপ তখন সেখানে লেনিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেছেন তদানীন্তন ভারতীয় বিপ্লবীরা—গেছেন মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লাহ্, হরদয়াল, ওবেদুল্লাহ সিন্ধী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরে গেছেন কমিউনিজমের আবেদনে সাড়া দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের রেশ নিয়ে গেছেন মুসলিম 'মুহজারিন'-এর দল, যাদেরই উদ্যোগে সোভিয়েট ভূমিতে ভারতবর্ষের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ঘটে। যে ভারতবর্ষের মতো দেশে বিপ্লব না হলে ছোট্ট ইয়োরোপে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলেছিলেন কার্ল মার্কস, যে ভারতবর্ষ সম্ভবত শীঘ্রই বিপ্লব সংঘটিত করতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন এঙ্গেল্‌স্, সেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ১৯২৪ সালে বাকু শহরে প্রাচ্য দেশবাসীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত জনবিশ্ববিদ্যালয়ে স্টালিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যে যেমন সাম্রাজ্যবাদের শিকল বিকল হয়ে গেছে, তেমনই অসম্ভব নয় যে অচিরে ভারতবর্ষেও সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে।

সোভিয়েট বিপ্লব দেশে দেশে সংক্রামিত হয়ে যাবে এই আশংকা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম থেকেই ছিল। তাই হিমালয়ের প্রাচীর অতিক্রম করে বলশেভিক ছোঁয়াচ যাতে এদেশে না ঢুকে পড়ে সেজন্য আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না। লাহোর, পেশোয়ার, কানপুর ও সর্বোপরি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কথা সবাই জানি। তা ছাড়া সোভিয়েট সম্পর্কে বিকৃত ও মিথ্যা তথ্য প্রচার চলত অবিরত। লেনিন এবং তাঁর বলশেভিক পার্টিকে দুর্দান্ত দুর্বৃত্ত বলেই পরিচয় দেওয়া হত। সোভিয়েট সমাজ সম্বন্ধে অকথ্য অপবাদ রটনা করা হত। সোশালিজম সম্বন্ধে সবচেয়ে সৌজন্যপূর্ণ আলোচনাতেও বলা হত যে আদর্শ হিসাবে তা যাই হোক না কেন, স্বর্গের এপারে তার সাক্ষাৎ মিলবার নয়! ধনী-দরিদ্রে ভেদাভেদ আর মুনাফা-ব্যবস্থাকে একেবারে সনাতন ও শাশ্বত বলে জন-সমুক্ষে প্রচার চলত। আর আমাদের মান্ধাতাগন্ধী দেশে

প্রাচীন পন্থার প্রতি বহু জনের নিবিড় মায়া বর্তমান বলে ক্রমাগত জানানো হত যে সোভিয়েট কিম্বা তদনুরূপ সোশালিস্ট সমাজে এদেশের ঐতিহ্য-সম্পদ ও বহু শতাব্দীর পরম্পরা-ঐশ্বর্য—দলিত, মথিত ও অচিরে অপনীত হতে বাধ্য।

কিন্তু ইতিহাসে যে নব অভ্যুদয়ের প্রদীপ্ত প্রতীক হল সোভিয়েট বিপ্লব, তাকে তো কুৎসা, মিথ্যা আর অর্থ এবং অস্ত্রবল দিয়ে মুছে দেওয়া সম্ভব নয়— তাই দেশে দেশে নূতন রোল উঠল "ইনকলাব জিন্দাবাদ," ছড়িয়ে পড়ল "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" এই ধ্বনি—জন-মানসে এল নব উদ্দীপনা, "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে।" সাম্রাজ্যবাদের উদ্যত দণ্ড এবং প্রাচীনপন্থার প্রাণহীন জাড্য, উভয় প্রতিবন্ধককেই ক্রমশ পরাজয় স্বীকার করতে হল। ক্রমশ সোভিয়েট বিপ্লবের মহিমা প্রকাশমান হতে লাগল, সত্য বস্তুর সন্ধান এল রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে, জওয়াহরলাল নেহরুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার রচনায় আর বিপ্লবের ক্রান্তিকারী প্রভাব প্রস্ফুটিত হল ভারতবর্ষে সংগ্রামের ব্যাপকতায়, মুক্তির বহুমুখী প্রয়াসে, শ্রমিক-কৃষকের সংগঠনে, অজস্র বিঘ্ন ও বিপদ অতিক্রম করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আবির্ভাবে। আতংকিত হয়ে শত্রুপক্ষ তারস্বরে প্রচার শুরু করল যে মস্কো থেকে পাঠানো "সোনা" এদেশের রাজনীতিকে দূষিত করছে। মিথ্যার আশ্রয় এবং দমননীতির উপর নির্ভরতা ভিন্ন উপায়ান্তর তাদের আর রইল না। তারা জানত না কিম্বা জানবার সম্ভাবনা রাখলেও বিশ্বাসের সাহস ছিল না যে সমাজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই মার্কসবাদী তত্ত্বভিত্তিক বিপ্লবের অগ্রগতি অমোঘ ও অপ্রতিরোধ্য।

দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে যে অসঙ্গতি ও অন্তরায় নেই, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে ও কর্মে এবং সোভিয়েট বিপ্লবের কীর্তিকথায় তার জাজ্বল্যমান পরিণাম। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে ফ্যাশিস্টবিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েটের সাফল্যসাধনে সহায়তার মধ্য দিয়ে সকল পরাধীন দেশের দ্রুত বন্ধন মোচনের পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন তখন হয়তো কর্মকৌশলের দিক থেকে কিছু ভুল করেছিল, আমাদের মতো দেশের বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে বহির্বিশ্বের প্রতি প্রায় দৃকপাতহীন জাতীয়তাবোধের গভীরতা পরিমাপে গলদ ঘটেছিল, কিন্তু মূলগত কোন ভ্রান্তি আমাদের হয়নি এবং ঠিক সেজন্যই সেদিন "ভারত ছাড়ো" লড়াইয়ের মাদকতা এড়িয়েও আমরা তৎকালীন আপাতকঠোর প্রচেষ্টায় কখনও উদ্দীপনা ও আত্ম-

বিশ্বাস হারিয়ে বসিনি। তারই জোরে যুদ্ধোত্তর যুগে বিদেশ থেকে অনুপ্রেরণা পাই বলে যে সস্তা আর অসার কটু প্রচার চলেছে তার কাছে আমাদের হার মানতে হয়নি। এরই সঙ্গে স্মরণীয় যে সেই যুদ্ধের দুর্দিনে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষ সোভিয়েট সম্পর্কে বিপুল মৈত্রী অনুভব করেছে, সর্বান্তঃকরণে শুভকামনা জানিয়েছে। ভুলে যাওয়া যাবে না গান্ধীজীর কথা যে ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন বিষয়ে জওয়াহরলাল নেহরুর মনে দ্বিধা ছিল প্রচুর, কারণ রুশ ও চীন (উভয় দেশ তখন ফ্যাশিস্ট আঘাতে বিপন্ন) সম্বন্ধে তাঁর আবেগ ছিল এমন যে গান্ধীজীর কথায় "তা আমার বর্ণনা করার শক্তি নেই।" আরও স্মরণীয় যে সুভাষচন্দ্র বসু হিটলারী জার্মানীতে থাকাকালে আজাদ হিন্দ রেডিও মারফৎ সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাবার সাহস দেখিয়েছিলেন এবং ফ্যাশিস্ট চাপ সত্ত্বেও নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন এ কথাও তো বহুল প্রচারিত যে ব্রিটিশবিরোধী যুদ্ধে জাপানের অসাফল্য এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানের পক্ষ থেকে প্রয়োজনানুরূপ সহায়তা দিতে অনিচ্ছার তিক্ত অভিজ্ঞতা পেয়ে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন সোভিয়েট ভূমিতে গিয়ে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে নূতন পথে চালিত করবেন।

ভারতবর্ষে অবশ্য কঠোর সোভিয়েট বিরোধীর অভাব ছিল না, আজও নেই; এই পরম্পরা বর্তমানে স্বতন্ত্র পার্টির মতো প্রতিষ্ঠানে প্রকট, অন্যত্রও যথেষ্ট উপস্থিত। এ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী; শ্রেণীবিভক্ত সমাজে স্বার্থের সংঘাত এর মূলগত হেতু। কিন্তু দেশকে প্রকৃত ভালোবাসলে এবং কিছু পরিমাণে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন থাকলে কোনও ভারতবর্ষীয়ের পক্ষে সোভিয়েট বিদ্বেষ বোধ করি সম্ভব নয়। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সোভিয়েটে এদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত হয়ে যান, তবে সমাজরাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ নেই। কিন্তু তিনিই বলেছেন যে ১৯৪৫ সালে যখন সানফ্রান্সিস্‌কোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ("ইউনাইটেড্ নেশনস্") উদ্বোধনী সভা হয় তখন পরাধীন ভারতের বেসরকারী প্রতিনিধিরূপে তিনি শুনেছিলেন সোভিয়েট মুখপাত্র মলোটভের কথা যে অচিরে স্বাধীন ভারত জাতিপুঞ্জে তার যথাযথ স্থান অধিকার করবে—এবং তখন শ্রীমতী পণ্ডিতের চোখে জল আসে, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত মৈত্রীসম্পর্ক রয়েছে বলে নানা ব্যাপারে মতান্তরের অবকাশ সত্ত্বেও উভয় দেশ

আজ বাস্তবিকই পরস্পরকে আন্তরিক বন্ধু বলে জানে। এ-প্রবন্ধে সব কথা বলা যায় না, বলার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু কে না জানে ভারতের আর্থিক বিকাশ ও আত্মনির্ভরতার দৃষ্টিকোণ থেকে কী অকাতরে ও প্রকৃত বিশ্বস্ত শুভানুধ্যায়ীর মতো সোভিয়েট আমাদের সাহায্য করেছে—আর কে না জানে নয়া-সাম্রাজ্যবাদের অজগর চক্রান্ত যখন ভারতকে বিপন্ন করেছে এবং পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমাদের বিপক্ষে ব্যবহার করতে চেয়েছে, তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন বহুভাবে এবং বিশেষত তাশখন্দের চুক্তির মতো সমুজ্জ্বল প্রকল্প দিয়ে সংকট নিবারণ করেছে। সোভিয়েট যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা বিশেষ সামীপ্য ও সৌহার্দ্যের অনুভূতি পোষণ করে, এ হল ইতিহাসেরই সাক্ষ্য। আজ মহাচীনের উগ্র উদ্দাম মূর্তি অবশ্য দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়েছে, কিন্তু সোভিয়েট তো কোন কালে ভুলতে পারে না মহামতি লেনিনের সেই কথা যে রুশ, চীন এবং ভারত যখন এক পথের পথিক হবে, তখন আর সমাজবাদের জগজ্জয় রোধ করা তো সম্ভব থাকবে না।

*

নভেম্বর বিপ্লব (৭-১৭ নভেম্বর ১৯১৭) দশ দিনে দুনিয়াকে কাঁপিয়েছিল, জন্ রীড-এর রচনায় তার মনোজ্ঞ বিবরণ অনেকে পড়েছেন। তারপর ক্রমাগত প্রায় অসম্ভব দুর্বিপাকে দমে না গিয়ে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে ইয়োরোপ আর এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নূতন সমাজ রচিত হয়েছে। অজস্র তারতম্যের মধ্যে যেখানে বহু জাতি জার-শাসনের কদাকার কারাগারে বঞ্চিত, শোষিত, লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত জীবনযাপনে বাধ্য ছিল, সেখানে প্রকৃত সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমাজবাদের বিকাশ ঘটেছে—যার পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণের পর সিড্‌নী ও বিয়াট্রিস্ ওয়েব (সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় অদ্বিতীয় বলে যাঁদের খ্যাতি) ত্রিশের দশকে বলেছিলেন যে বাস্তবিকই সেখানে নূতন সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে, আরও বলেছিলেন যে সেখানকার ব্যবস্থা হল প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক ও সাম্যভিত্তিক গণতন্ত্র। যে দেশে আগেকার সরকারী হিসাব অনুসারে সকলের শিক্ষার আয়োজন করতে হলে ১৮০ থেকে ৩০০ বৎসর লাগার কথা, সেখানে কিঞ্চিদধিক দশবৎসরে শিক্ষার প্রসার রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলেন যখন দেখেন যে জাতি ধর্ম গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে অগণিত মানুষের সামনে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির পরিপূর্ণ সুযোগ উন্মুক্ত, নবজাগ্রত

মনের জিজ্ঞাসা ও বহুকাল ধরে তৃষ্ণার্ত অন্তরের পিপাসা নিয়ে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে তারা প্রবৃত্ত হয়েছে। স্বর্গরাজ্য সেখানে এসেছে ভাবা নিতান্ত বাতুলতা, কিন্তু আমাদের পরিচিত জগতের ভেদাভেদ আর সামাজিক বঞ্চনা দূর করার, এত বড় প্রচেষ্টা তো ইতিহাসে কখনও হয়নি। এজন্যই ত্রিশ বৎসরেরও পূর্বে, সোভিয়েটকে বিধ্বস্ত করার বিশ্বব্যাপী চক্রান্ত যখন শক্তিশালী তখন মনীষীশ্রেষ্ঠ রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন: "সোভিয়েট দেশে মানুষের জয় জয়কার দেখছি, আমার বুড়ো চোখে কান্না আসে না, তবু আনন্দাশ্রু যেন ঠেলে উঠ্‌তে চাইছে। আর যখন দেখি সোভিয়েটকে মেরে ফেলার আয়োজন চলছে তখন বলি: 'হয় সোভিয়েটকে রক্ষা আমরা করব'ই, নয় তো মরব।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রাবলীতে সোভিয়েটের কিছু দোষত্রুটিরও উল্লেখ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন এগুলো চাঁদের কলঙ্কের মতো, "তোমরা নিখুঁত হও দেখতে চাই বলে জানাচ্ছি"। ফরাসী ভাষায় "গীতাঞ্জলি"র যিনি অনুবাদ করেছিলেন, সেই যশস্বী লেখক আঁদ্রে জিদ্‌ সোভিয়েটদেশ থেকে ফিরে কয়েক ব্যাপারে হতাশ হয়ে যে বই লেখেন, তা নিয়ে বুর্জোয়া মহলে এককালে খুব উল্লাস দেখা গিয়েছিল। কিন্তু জিদ্‌-এর "সোভিয়েট থেকে প্রত্যাবর্তন" পুস্তকের মুখবন্ধে আছে: "আমি সোভিয়েটের অনুরাগী এবং সোভিয়েটের বিস্ময়কর কৃতিত্বে মুগ্ধ বলেই সমালোচনা করতে বসেছি।··· আমি নিজের কাছে এ-কথা গোপন করছি না যে সোভিয়েটের শত্রুপক্ষ আমার লেখা থেকে আপাতবিচারে সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে। এজন্য এ-বই আমি ছাপাতাম না, এমন কি লিখতামও না—কিন্তু আমার সুদৃঢ় ও অটল বিশ্বাস আছে যে আমার দেখানো দোষগুলি সোভিয়েট ইউনিয়ন অবশেষে পরিহার করবে। তাছাড়া আরও গুরুতর কথা হল এই যে কোন এক দেশের বিশেষ কয়েকটা ভুলের দরুন তো আন্তর্জাতিক ও বিশ্বব্যাপী এক লক্ষ্য সিদ্ধিতে বাধা পড়তে পারে না।···আমি আরও জানি যে সত্য যখন আঘাত করে তখন তা বেদনাদায়ক হলেও ব্যাধিকেই নির্মূল করে থাকে।"

জিদ্‌ যেমন অনুমান করেছিলেন, তেমনই শত্রুপক্ষ তাঁর সমালোচনাকে সোভিয়েটবিরোধী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল। সে যুগে আমরা অনেকেই সর্ববিষয়ে সোভিয়েটের পক্ষাবলম্বন করেছি—যখন সংশয় জেগেছে (যেমন ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি সম্পর্কে) তখনও অকুণ্ঠ

পরিস্থিতি সম্বন্ধে সোভিয়েটের সাক্ষাৎ জ্ঞানের উপর ভরসা রেখেছি, সোভিয়েটের সুবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ আস্থা রেখেছি, সোভিয়েট ভুল করছে বা অন্যায় কিছু করছে ভাব্‌তেই অস্বীকৃত হয়েছি এবং কোথাও প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগলেও (যেমন বুখারিন প্রভৃতির বিচার ব্যাপারে) প্রকাশ্যে সোভিয়েটের সমালোচনা করি নি, ঘটনার যে ব্যাখ্যা সোভিয়েট সূত্র থেকে এসেছে তাকেই অসংকোচে বিশ্বাস করেছি। এজন্য লজ্জিত নই, বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ বোধ করার কোন কারণ ঘটেছে বলে আজও মানি না। বর্তমানে সমাজবাদী শক্তি এমন স্তরে উঠেছে যে সোভিয়েট সম্বন্ধে বিচক্ষণ যে সাংবাদিকরা কেবল সংকট তার পতনোন্মুখ অবস্থার বিবরণে অভ্যস্ত, তাদেরই মুখে-মুখে চলছে এই কথা যে সোভিয়েট হল এক সেরা শক্তি (Super-power)! দশ বৎসর আগে স্পুটনিকের মহাকাশ বিচরণের পর থেকে সমাজবাদের নিন্দা নানারকম কাঠখড় না পুড়িয়ে করা তেমন সহজ নয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনও আজ এমন পর্যায়ে যে কোন একটি দেশের পার্টি—তা সে সোভিয়েট হোক্‌ বা চীন বা অন্য যে কোন দেশ হোক—আর সবাইকে পথের নির্দেশ দেওয়ার মতো অবস্থিতিতে নেই। আজ তাই তেমন প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ-প্রয়োজন ঘটলে সোভিয়েট বা অন্য কোন সমাজবাদী দেশের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রকাশ্য সমালোচনা অসঙ্গত নয়, যদিও সর্বদা মনে রাখা দরকার যে সমাজবাদবিরোধী নয়া সাম্রাজ্যবাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা সমুচিত। আর যেখানে ঐ ধরনের বিপদের সম্ভাবনা নেই কিম্বা খুবই অল্প সে-বিষয়ে অবশ্যই বাধা নেই প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পথে।

কেউ কেউ বলবেন সন্দেহ নেই যে আজকে ছাড়া পূর্বের আমরা যারা কমিউনিস্ট তাদের উচিত ছিল সংশয় দেখা দিলেই অকুণ্ঠে সোভিয়েটের সমালোচনা করা। কিন্তু এ কথায় সায় দেওয়া সম্ভব নয়, অনুচিত বলেই সম্ভব নয়। যখন সোভিয়েটকে একা দুনিয়ার মালিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, যখন সেই অসম সংগ্রামে সোভিয়েটের সাহস ও কৃতিত্ব অসাধ্য-সাধন দেখিয়ে দুনিয়ার মেহনতী মানুষের মনোবলকে বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, তখন খুঁতখুঁতে মনোবৃত্তি নিয়ে জগতের শ্রমজীবী আন্দোলনে বিভ্রম ও ফাটল ধরিয়ে তথা-কথিত আধ্যাত্মিক সততার গর্বে আত্মরতি কিঞ্চিৎ সম্ভব হত, কিন্তু জনজীবনের রূপান্তর সাধনের কর্তব্য পালনে বাধা পড়ত। তা ছাড়া ঘটনা ঘটে যাওয়ার

পরে সব কিছু জেনে বুঝে জ্ঞানী সাজা সহজ, কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল পরিস্থিতির মধ্যে যাদের কাজ করে যেতে হয়েছে এবং করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি এবং অচেতনে (বা হয় তো সচেতনেও) কিছু অন্যায়, এমন কি অপরাধও ঘটেছে, তাদের সম্বন্ধে অতি বিজ্ঞ সমালোচনা সহজ হলেও সঙ্গত নয়। বিপ্লবের মূল্য কি ভাবে দিতে হয় ইতিহাস তা আমাদের জানায়। বিপ্লবকালে এমন বহু ঘটনা ঘটে থাকে যার স্বাভাবিক জীবনে প্রচলিত ব্যাখ্যা অনেক সময় অসম্ভব। মানুষের মনের গভীরে কত এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাহাড় আছে, তা একটু বোঝা যায় সংকট সময়ে—তাই বিপ্লবের বিভিন্ন কঠোর ও জটিল অধ্যায়ে মানুষের ব্যবহারেও ভালোমন্দে মিশে কত বৈচিত্র্য ও অদ্ভুতত্ব দেখা যায় কে জানে? স্টালিন যুগের শেষদিকে যে অন্যায় ও অপকর্ম হয়েছিল বলে সোভিয়েট সমাজ যেমন অসম্ভব সৎসাহস নিয়ে আত্মসমালোচনা করেছে, তারও তো পূর্ণ নিষ্পত্তি হয় নি, হয়তো সম্ভব নয়—বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োজন কতটা অতিক্রান্ত হয়েছিল (বা হয় নি) সেই অধ্যায়ের আতিশয্য ও অপরাধে, তা স্থিরীকৃত হয় নি। এই আতিশয্য ও অপরাধের কথা তুলে বিপ্লবের মহিমাকে ম্লান করবে কে? করতে চাইবে শুধু তারা যাদের কাছে বিপ্লব বস্তুরই কোন সার্থকতা নেই—যারা সমাজ রূপান্তরের অতিরিক্ত মূল্য নিয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, অথচ পূতিগন্ধময় শ্রেণীসমাজ অপরিবর্তিত রাখার যে জঘন্য মূল্য নিয়ত মানুষকে দিতে হচ্ছে, সে বিষয়ে উদাসীন। তাদের কাছে অর্থহীন লাগবে বের্টোল্‌ট্‌ ব্রেখ্‌টের কথা :

As if we did not know
Even hatred against
baseness
Distorts the features.
Even wrath at injustice
Makes the voice hoarse, Oh, we
Who wanted to prepare the ground
for friendliness
Could not be friendly
ourselves.

*　　　*　　　*

শিক্ষিত মহলে অনেকে আছেন যাদের কাছে ইতিহাসে নানা কাণ্ডের মধ্যে সোভিয়েট বিপ্লব হল এক, আর বর্তমান জগতে দুই প্রধান শক্তির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এক বলেই ধর্তব্যের মধ্যে। এদের চিন্তার পরিধির মধ্যে এ-বোধ নেই যে গুণগতভাবে সোভিয়েট বিপ্লব ইতিহাসের চেহারা ও চরিত্র বদলাচ্ছে এবং আরও বদলাবে। এখনও তাদের চেতনায় ঢোকেনি এই ধারণা যে মানুষকে বাঁচাবে, বড় করবে সোশালিজ্‌ম্‌—ধনতন্ত্র নয়। তাদের চিন্তার মধ্যে নেই এ-কথা যে ভারতবর্ষের মতো দেশে, যেখানে অনাহারে মানুষ কাতারে কাতারে মরে থাকে, সেখানে ধনতন্ত্র তাদের বাঁচাবার রাস্তা জানে না, কিন্তু সোশালিজ্‌ম্‌ জানে। মার্কিন মুল্লুকে যখন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোরা বিদ্রোহ করে, সেই কুবেরের দেশে যখন আর্থিক বঞ্চনা আর জাতিবিদ্বেষের পাপ মিলে আগুন জ্বালায়, তখন অনেকে ভাবেন এ একটা সাময়িক ঘটনামাত্র, ধনতন্ত্রের কোন অপরাধ বা দায়িত্ব নেই—প্রদীপের জৌলুসে মুগ্ধ হয়ে তার নীচেই যে অন্ধকার তা চোখে পড়ে না বলে সমাজ সত্য তাদের অজানা থেকে যায়। জাতিবিদ্বেষ দূর হবে, শোষণ আর দুঃশাসনের যন্ত্রণা শেষ হবে কবে, কিভাবে? মানুষ কতকাল ধরে যে মুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখে আসছে তা সার্থক হবে কবে, কিভাবে—ধনতন্ত্রের আনুকূল্যে না সমাজবাদের মধ্য দিয়ে? এসব প্রশ্ন যাদের আকুল করে না তারা খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে নিজস্ব আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের আসন থেকে দেখেন সোভিয়েট বিপ্লবের পঞ্চাশৎ বার্ষিকীকে। তাদের কাছে প্রত্যাশা রাখার মতো কিছু নেই।

আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা চিন্তাশীল হয়তো, কিন্তু চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ব্যাপারে দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। মনের মুক্তি সম্পর্কে এদের আগ্রহ, কিন্তু "ততঃ কিম্‌" এ-চিন্তা ব্যাকুল করে না। বিদগ্ধ মনের খোরাক কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করতে পারলে নিজের সীমিত পরিবেশের বাইরে কি ঘটে না ঘটে, শিক্ষা মানুষ পায় কি না পায়, সমাজে সংস্কৃতির বিকীরণ হয় কি না হয়, দুঃখ কষ্ট বঞ্চনার মধ্যে অধিকাংশ দেশবাসী কি ভাবে কালাতিপাত করে কি না করে, ব্যাপকভাবে সমাজের রুচি বিকৃত ও প্রগতি ব্যাহত হয় কি না হয়, এবম্বিধ সমস্যা তাদের শিরঃপীড়া ঘটায় না। এদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অভাব নেই, কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লবের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী অন্তত তাদের স্মরণ করিয়ে দিক্‌ ইতিহাস কত এগিয়েছে, সেজন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু

ইতিহাসের এই অগ্রগতির মধ্যে দোষে গুণে গড়া মানুষের যে মহিমা প্রকাশ পেয়েছে তা'হল অমূল্য। ক্যানাডার মন্ট্রেয়াল শহরে বিশ্ব মেলাতে সোভিয়েট প্রদর্শনীদ্বারে খোদিত রয়েছে : "Everything for Man, for the good of Man!" ("সব কিছু মানুষের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য") সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীগোপাল হালদার স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছেন সোভিয়েট সম্বন্ধে : "সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সোভিয়েট মানুষের মানবিক চেতনা—সকল জাতির, সকল বর্ণেব মানুষের প্রতি তাদের মানবীয় প্রীতি, মানবীয় শ্রদ্ধা, সকলের মুক্তি চেষ্টার সহায়তা সকলের ভাষার সকলের সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সমাদর। মানতেই হবে, সমাজতন্ত্র বিকাশের পূর্বে পৃথিবীর কোনো অগ্রগণ্য দেশে সাধারণভাবে এ সবের চিহ্নও দেখা যেত না।" এ-কথার যাথার্থ্য স্বীকার করবেন যিনিই সোভিয়েট দেশের সামীপ্যে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এটা ঘটেছে শুধু শুভবুদ্ধির জোরে নয়, ঘটেছে বিপুল, বিপর্যয়ী, জ্যোতিষ্মান বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, যে বিপ্লবের মন্ত্র সাধন করেছিলেন কর্মযোগে সতত নিরত থেকে মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিনের মতো মহাভাগ, যে-বিপ্লবকে সফল করেছে অগণিত মানুষ কমিউনিস্ট আন্দোলনের কঠিন, কঠোর, স্বেচ্ছাস্বীকৃত শৃংখলা ও পূর্ণ আত্মনিবেদনের জোরে। (যখন সোভিয়েত রাষ্ট্র ছিল শিশু তখনই) যশস্বী মার্কিন লেখক লিঙ্কন স্টীভ্‌ন্‌স্‌ সে দেশ থেকে ফিরে বলেছিলেন : "ভবিষ্যৎকে দেখে এলাম, আর তা বেশ চলছে।" সেদিন ইংরেজ লেখক জেম্‌স্‌ অল্‌ড্রিজ্‌ সোভিয়েট দেশকে আখ্যা দিয়েছেন "ভবিষ্যতের জন্মভূমি"। সমাজবাদের উষাকিরণ যে ভূখণ্ডকে প্রথমে স্পর্শ করেছে তার দীপ্তি আজ বিশ্বসংসারকে উদ্ভাসিত করুক।

যে মন্ত্রকে ভয় দেখে নাই দেখা

সেদিন কাগজে খবর দেখা গেল, আমেরিকার হুকুমবরদার কোনো দেশে একজন সাংবাদিকের জেল হয়েছে। অপরাধ, তিনি লিখেছিলেন যে ছোট্ট ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আমেরিকা যে ভাবে যুদ্ধ চালাচ্ছে, তাতে আমেরিকান হলে তিনি একান্ত লজ্জিত বোধ করতেন। অবশ্য আমেরিকাতে বহুজনের মনে ভিয়েৎনাম সম্পর্কে শুধু লজ্জা নয়, একটা প্রচণ্ড ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই অত্যন্ত বিচলিত ; সেদেশের বঞ্চিত নিগ্রো জনসাধারণের কাছে ভিয়েৎনামের তাৎপর্য স্পষ্ট ; বাঘা-বাঘা রাজনীতিক ও সাংবাদিকদের মধ্যেও অনেকে কর্তৃপক্ষের অবিমৃষ্যকারিতার কঠোর সমালোচক। কিন্তু এখনও এই ভোলবদলানো সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েৎনামে বৎসরের পর বৎসর ধরে যে সুপরিকল্পিত দানবিকতার অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সর্বদেশের মানুষের অভিশাপ যথোচিতভাবে উচ্চারিত হয় নি। এখনও এই দানবিকতাকে পরাভূত করার প্রতিজ্ঞা যথাযুক্তভাবে ঘোষিত হয় নি। এখনও বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশ থেকে এই নিদারুন বীভৎসতাকে ধিক্কার জানাতে কর্তৃপক্ষীয়েরা কুণ্ঠিত, আমেরিকার রোষ উৎপাদনের আশঙ্কায় তারা সংকুচিত, মানবিকতার আহ্বানে সাড়া দিতেও যেন পরাঙ্মুখ। ইতিমধ্যে অকুতোভয় সংকল্প নিয়ে ভিয়েৎনামের মানুষ সীমাহীন শক্তিসজ্জায় সজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘায়ত সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে, সাহস ও সংহতির নতুন রেখাঙ্কনে ইতিহাসের পাতা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

*　　　*　　　*

একেবারে বেপরোয়া হয়ে, হিটলারী কায়দায় মনুষ্যত্বের সব বালাই ঘুচিয়ে উত্তর ভিয়েৎনামে অবস্থিত স্বাধীন, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজধানী হানয় এবং প্রধান বন্দর হাইফং-এ বোমা বর্ষণ করে আমেরিকা আজ দুনিয়ার সর্বত্র নিন্দিত হচ্ছে—এমনকি, যে ব্রিটেনের সরকার তার একান্ত অনুগত, তাকেও বলতে হয়েছে এ-ব্যাপারে তার সমর্থন নেই। কিন্তু একে বাদ দিয়ে

রাখলেও ভিয়েৎনামে আমেরিকার কুকীর্তির ফিরিস্তি এত দীর্ঘ যে একটা প্রবন্ধের মধ্যে তাকে ধরানো যায় না। শুধু কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই অবশ্য অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধারণা মিলবে।

১৪ই এপ্রিল (১৯৫৬) তারিখে আমেরিকার "দেশরক্ষা"-সচিব ম্যাক্‌না-মারা (ইনি ছিলেন পূর্বে ফোর্ড মোটর কোম্পানির বড় কর্তা) সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে শুধু মার্চ মাসে ৫০,০০০-টন আমেরিকান বোমা ভিয়েৎনামে ফেলা হয়েছে! তেরো-চৌদ্দ বছর আগে কোরিয়াতে যখন জোর কদমে লড়াই চলছিল তখন সেখানে প্রতি মাসে গড়ে যত বোমা ফেলা হয়েছিল, তার তুলনায় এ হল তিনগুণ বেশি। মাত্র এই '৫৬ সালে ভিয়েৎনামে মার্কিণ বোমাবর্ষণের পরিমাণ হল, ৬, ৪০,০০০ টন—অর্থাৎ তিন বছর ধরে কোরিয়ার যুদ্ধে যত বোমা পড়ে প্রায় তার সমান, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারা ইয়োরোপের সর্বত্র যে বোমাবর্ষণ ঘটেছিল, তার মোট পরিমাণের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যয় বাবদে আমেরিকাকে খরচ করতে হয়েছে ১৪৮০ কোটি ডলার (প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকা)—আর আমেরিকান সৈন্য সংখ্যা যদি আজকের ২,৭০,০০০ থেকে চার লক্ষে বাড়ানো হয় (যা করা হবে বলে হুমকি শোনা গিয়েছে) তাহলে খরচের পরিমাণ দাঁড়াবে ২১০০ কোটি ডলার (প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা)। যে দেশকে তাঁবে রাখার জন্য এত আয়োজন, সেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের লোক সংখ্যা হল মাত্র দেড় কোটি—এই দেড় কোটির মধ্যে এক কোটি লোক বাস করে যে সমস্ত অঞ্চলে সেখানে আমেরিকার দাসানুদাস সরকার ঢুকতে সাহস করে না, সেখানে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম মুক্তি ফ্রন্ট প্রকৃত জনপ্রিয় শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, আমাদের ভারতরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ কোটিরও (অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের তুলনায় ত্রিশ গুণেরও) বেশি, আর আমাদের গোটা দেশের জাতীয় আয় হল ১৫,০০০ কোটি টাকা। অথচ তত টাকা কিংবা তার চেয়েও বেশি টাকা আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রতি বৎসর খরচ করে চলেছে!

হানয় এবং হাইফং-এ বোমা ফেলার মধ্য দিয়ে তার অসংযত দৌরাত্ম্যের চরম পরিচয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দেওয়ার আগেই ২৪ মে তারিখে বিশ্ববিশ্রুত মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল ভিয়েৎনাম মুক্তি-সংগ্রামীদের রেডিও মারফৎ এক অবিস্মরণীয় বক্তৃতা দেন। আমেরিকান যোদ্ধাদের ডাক দিয়ে তিনি

বলেন যে এই অন্যায় যুদ্ধ থেকে তাঁরা যেন বিরত হন। রাসেল ঘোষণা করেন যে মার্কিন কর্তৃপক্ষীয়দের জঘন্য যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে বিচারের জন্য তিনি শীঘ্রই জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, গাণিতিক প্রভৃতির সহায়তায় একটি বিচারমণ্ডলী গঠন করবেন। মানবিকতার বিরুদ্ধে আমেরিকান সরকারের অপকর্মের বিচার তাঁরা করবেন। "এই মুহূর্তে মার্কিন কর্তৃপক্ষের বর্বর ও দণ্ডার্হ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ থেকে বিরত" হওয়ার আহ্বান তিনি আমেরিকান সৈনিকদের কাছে জানিয়েছেন।

এই বেতার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা কঠিন: "আমেরিকার শাসকেরা একটা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বানিয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার ডোমিনিকান রিপাবলিক থেকে আফ্রিকার কঙ্গো পর্যন্ত, এবং সর্বোপরি ভিয়েৎনামে সেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মানুষ লড়ছে। আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন যে (দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার হাতের পুতুল) কাও-কী আপনাদের ভোট পাবে? বিদেশী কোনো শক্তি যদি আমেরিকার সম্পদ লুঠ করে নেওয়ার মতলবে আপনাদের দেশ দখল করে একটা বিশ্বাস-ঘাতক সরকারকে গায়ের জোরে বসিয়ে দিত, তাহলে কি আপনারা সেটাকে নিজস্ব সরকার ভাবতে পারতেন। ভিয়েৎনামের লোক এমনই দৃঢ় সঙ্কল্প এবং এমন অসম্ভব সাহসিকতা দেখাচ্ছেন যে জগতের সবচেয়ে প্রচণ্ড সামরিক শক্তির পক্ষেও তাদের পরাজিত করা অসম্ভব। আমেরিকান সৈনিক আপনারা আধুনিক যুদ্ধের প্রত্যেকটি অস্ত্র ব্যবহারে শিক্ষিত। প্রতি সপ্তাহে আপনারা উত্তরে ৬৫০-বার বিমান আক্রমণে বেরোচ্ছেন, আর দক্ষিণে যত বোমা ফেলছেন তা আনুপাতিক হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং কোরিয়ার যুদ্ধের তুলনায় বেশি। আপনারা 'নেপাল্‌ম্‌' (napalm) বোমা ফেলছেন, যা যেখানে যার উপর পড়ে তাকে পুড়িয়ে মারে। আপনারা ব্যবহার করছেন 'ফস্‌ফোরস্‌', যা একেবারে অ্যাসিডের মতো যেখানে লাগে তাকে ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যায়। আপনারা ছাড়ছেন 'কুঁড়ে কুকুর' (lazy dogs) আর 'খণ্ড-বিখণ্ড' (fragmentation) বোমা, যা গ্রামাঞ্চলে যত্রতত্র পড়ে নারী এবং শিশুদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। আপনারা রাসায়নিক বিষ ছড়াচ্ছেন যাতে মানুষ কাণা হয়ে যায়, স্নায়ুভঙ্গ হয়, পক্ষাঘাত ঘটে। আপনারা ব্যবহার করছেন এমন 'গ্যাস্‌' যাকে পৃথিবীর সব কেতাবে 'বিষ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এমন সব মারাত্মক ধরনের গ্যাস যাতে গ্যাস থেকে বাঁচার মুখোশ পরেও আপনাদের

পক্ষেরই সৈনিক মাঝে মাঝে মারা পড়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন না কেন: 'আজ আমার হাতে নারী আর শিশু মরেছে ক'জন? স্বদেশে আপনাদের স্ত্রীপুত্র পরিজনকে নিয়ে এমনই কাণ্ড ঘটলে আপনার মনে কেমন লাগতো? আপনারা কেমন করে এই ধরনের জিনিস দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘটছে, আর তাকে সহ্য করে চলেছেন?…"

ওয়াশিংটনেই 'পেণ্টাগন'-এর হিসাব হল যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একটি শত্রুকে মারতে আমেরিকার খরচ হয় পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার। তারা সেখানে সাধ করে পৌণে তিন লক্ষ আমেরিকান সৈন্য পাঠায় নি, পাঠিয়েছে উপায় নেই বলে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের মধ্যে জোর জবরদস্তি করে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ সৈন্য তারা জোগাড় অবশ্য করেছে, কিন্তু তাদের উপর খরচ হয় সামান্য,আর তাদের উপর ভরসা রাখাও সম্ভব নয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে যখন আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক চুক্তি হয়েছিল তখন তো প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার খোলাখুলি বলতেন যে আসল মতলব হল এশিয়ার লোক দিয়েই এশিয়ার লড়াই চালানো হবে ("let Asians fight Asians"), আর একজন মার্কিন সেনাপতি সেনেটের এক অনুসন্ধান-কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তখন বলেছিলেন যে একটা বন্দুক পাকিস্তানী সিপাহীর হাতে তুলে দিতে গড়পরতা বাড়তি খরচ হয় গোটা দশেক ডলার কিন্তু সেই জায়গায় একজন খাস মার্কিন দেশের বাসিন্দাকে পাঠাতে হলে মাথাপিছু গড়পরতা বাড়তি খরচ হল পাঁচ হাজার ডলারের কিছু বেশি! যাই হোক, উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যারা বাস করে তারা একই জাতির মানুষ; দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিজম্‌ খেদিয়ে রাখার নাম করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জেঁকে বসে সেদেশের সকলেরই চক্ষুশূল; তাদের উপর আস্থা রাখা সম্ভব নয় বলে আমেরিকান সরকারকে সেখানে দেশ থেকে যুদ্ধের সমস্ত সরঞ্জাম ছাড়া বহু যোদ্ধাকেও নিয়ে যেতে হচ্ছে। জলের মতো অর্থ ব্যয় না করে তাদের উপায় নেই। যাদের "ভিয়েৎকং" আর "গেরিলা" বলে আমেরিকানরা নিঃশেষ করতে চাইছে, যুদ্ধ বিষয়ে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে অতি কদর্য ও নৃশংস কায়দায় যে-লড়াই আমেরিকানরা তাদের বিরুদ্ধে চালাচ্ছে, তারা প্রায় সবাই দক্ষিণ ভিয়েৎনামেরই অধিবাসী এবং তারা যে-অস্ত্র নিয়ে লড়ছে তার শতকরা আশী থেকে নব্বুই ভাগ

যে মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্র। একথা একটু সংচেতা হলে সকলকেই স্বীকার করতে হয়েছে ; শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Morgenthau সম্প্রতি প্রকাশিত এক গ্রন্থেও তাই বলেছেন। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে "ভিয়েৎকং" লড়ছে নিজের দেশের জন্য এবং তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে, অথচ এর পালটা কোনো "প্রত্যয়' নেই বলে আমেরিকা এবং সাইগনের পুতুল নাচ্‌নেওয়ালা সরকার ক্রমাগত হেরে চলেছে।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের দর্প চূর্ণ হতে সময় লাগতে পারে, কিন্তু তাদের দম্ভের মিনার যে ভিয়েৎনামে ধসে পড়বেই, তার লক্ষণ খুবই স্পষ্ট। উত্তর ভিয়েৎনামকে যতই তারা শাসাক্‌ না কেন, একথা তো ভুলবার উপায় নেই যে গোটা সোশ্যালিস্ট দুনিয়া আর সর্ব দেশের সাধারণ মানুষ ভিয়েৎনামের সহায়তায় হস্ত প্রসারিত করে রেখেছে, আর ভিয়েৎনামীদের অকুতোভয় চরিত্রবলের পরিচয় তো প্রতিনিয়ত মিলছে। আমেরিকান যুদ্ধ-দানব এমন এক "টানেল্"-এর (tunnel) মধ্যে আজ ঢুকেছে যে তা থেকে নিষ্ক্রমণের রাস্তা নেই। শুধু অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের চিন্তা এড়িয়ে বাঁচার মতলবে পৈশাচিকতার চরম সেখানে সে ঘটাচ্ছে, দেশটাকে তো পুড়িয়ে দিচ্ছেই আর সঙ্গে সঙ্গে এমন কাণ্ড করছে যে জগৎ জুড়ে দাবানল বেধে যাওয়ার সম্ভাবনাও এসে পড়ছে। হিটলারী বর্বরতার দিন যে কেটেও কাটে নি, তাই আজ এই সব ঘটনা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। মারণাস্ত্র সজ্জায় হিটলারকে এখন অনেক পিছনে ফেলে আসা হয়েছে বলেই আজকের দুনিয়ার বিপদ এত বেশি। এর সঙ্গে মোকাবিলা করতেই হবে, এ-পৈশাচিকতাকে পরাজিত করতেই হবে।

কিছুতেই ভুললে চলবে না যে মরিয়া হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যে দুষ্কর্ম করে চলেছে, তাকে শায়েস্তা করতেই হবে। বারবার মনে রাখতে হবে যে পরোপকারী ছদ্মবেশ চড়িয়ে তারা ভিয়েৎনামে বর্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে সংকুচিত নয়। বিষ ছড়িয়ে তারা মানুষ মারছে, প্রকাণ্ড এলাকা জুড়ে ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে, চারদিক জালিয়ে দিচ্ছে "পোড়ামাটি" (Scorched earth) নীতি অনুসরণ করে, B-52 বিমান থেকে বিশেষ কায়দায় সংকীর্ণ, জনবহুল জায়গা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করছে। উত্তর ভিয়েৎনামের ভৌগোলিক চরিত্র এমন যে বন্যা নিবারণের জন্য সেখানে বহুকাল আগে থেকে

অসংখ্য খাল, 'ড্যাম', 'ডাইক', জলাশয় ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু ঠিক এই ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেশ ভাসিয়ে সর্বনাশ ঘটাবার জন্য মার্কিন বিমানবহর নিয়মিত ভাবে বোমা ফেলে চলেছে। জুন মাসের মাঝামাঝি উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার এ-বিষয়ে সকল দেশকে জানিয়েছে—"এমন নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য অপরাধ নাৎসি জল্লাদেরাও করে নি"। স্বয়ং বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন যে আউশভিৎস্ এবং অন্যান্য নাৎসি (Nazi) বন্দীশিবিরে মানুষকে কী ভাবে অমানুষিক যন্ত্রণা দেওয়া হত এবং হত্যা করা হত, সে বিষয়ে মার্কিন সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত হয়েছে। আশ্চর্য হবার কথা নয় যে আমেরিকানরা ভিয়েৎনামের লড়াইকে নাম দিয়েছে "বিশেষ যুদ্ধ" (Special war)। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ যখন ১৯৫৪ সালে ভিয়েৎনামের দৃপ্ত দেশপ্রেমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিতাড়িত হয়েছিল, তখন তারা সেই যুদ্ধকে "নোংরা লড়াই" (la guerre sale) আখ্যা দিয়েছিল। আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নোংরামির দুর্গন্ধ ইতিহাসের আকাশকেও কলুষিত করে রেখেছে।

আমেরিকার প্রসাদ কুড়োতে ব্যস্ত থেকে ভারত সরকার এমন মনোভাব গ্রহণ করেছে যে ভিয়েৎনামে সাম্রাজ্যবাদের অকথ্য অনাচার সম্বন্ধে আমরা অনেকেই বিশেষ কিছু জানি না, কারণ প্রচারযন্ত্র যাদের হাতে তারা আমেরিকার অনুগ্রহের জন্য এমনই লালায়িত যে আপাতত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, এমনকি মানবিকতাকেও পর্যন্ত, "শিকেয় তুলে রাখতে" তারা কুণ্ঠিত নয়। তবুও কিছু কিছু খবর এদেশে এসেছে, আর তা এমনই মর্মন্তুদ যে মানুষের উপর বিশ্বাসই যেন হারাবার ভয় এসে পড়ে। সম্প্রতি আমেরিকান পত্রিকা "Liberation" থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি বেরিয়েছে দিল্লীর "Main-stream" সাপ্তাহিকে (১৮ ও ২৫ জুন সংখ্যায়)। ভরসা শুধু এই যে মার্কিন দেশেও বিবেক আছে, সংবুদ্ধি আছে, গাত্রবর্ণনির্বিশেষে মানুষের প্রতি মমতা আছে। তা না হলে আমেরিকারই একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিক কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে প্রত্যক্ষদর্শিতার ভিত্তিতে ভিয়েৎনামে আমেরিকানদের "লজ্জা"-কে অনাবৃত করে দিতে পারতেন না। যন্ত্রণায় এই ধিক্কারজনক কাহিনীকে এখানে লিপিবদ্ধ না হয় না-ই করা গেল। কিন্তু শুধু ধিক্কারবোধ নয়, তাকে কাটিয়ে ওঠার পর মনে আসে ক্রোধ, যার পূত বহ্নিতে সাম্রাজ্যবাদের মদমত্ত জিঘাংসাকে অচিরে দগ্ধ হতে হবেই। ভিয়েৎনামের বীর নরনারী এই লোভ জটিল দানবিকতার সামনে মাথা নত করে নি, কখনো

করবে না—তাদের অসমসাহসকে বারংবার সাধুবাদ জানাতে পারলে আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটতে সাহায্য আসবে।

* * *

পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে কয়েক সপ্তাহের মোকাবিলা করার সময় দেশবাসীর সংহতিবোধ এবং আমাদের জওয়ানদের সাহস ও শৌর্য নিয়ে সংগত কারণেই আমরা গর্ব করেছি। পাকিস্তানের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী সমরাস্ত্রসজ্জার সর্বাধুনিক সম্ভারে আজকের জগতে তুলনাহীন মার্কিন বাহিনীর অকরুণ ও অবিরাম আঘাত সর্বতোভাবে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ভিয়েৎনামে চলেছে, কিন্তু দক্ষিণের মুক্তি-ফ্রণ্টের যোদ্ধা আর মানচিত্রের কৃত্রিম সীমারেখার অপর পারে উত্তর ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক লোকরাজ্য নির্ভয় নিরলস উদ্দীপনা নিয়ে প্রতিরোধ করছে, প্রত্যাঘাত করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের মাটি আর মর্যাদার সংগ্রামে দেশের সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে—ঝঞ্ঝা আর দুর্বিপাকে ভয় পায় যারা, হয়তো বিলাসনগরী সায়গন-এর অনিশ্চিত আলো-অন্ধকারে তারা আশ্রয় নিচ্ছে কিন্তু সারা দেশ যেন উদ্যত খড়্গে রৌদ্রঝলকের মতো প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় সমুজ্জ্বল। মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কথা : "যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক"।

ভিয়েৎনামের ইতিহাস দু'হাজার বৎসরেরও বেশি বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। দীর্ঘজীবনের বিড়ম্বনা শুধু ব্যক্তি নয়, জাতিকেও বইতে হয়, তাই বহুবার বিদেশী শাসনের ভার তার উপর পড়েছে, সম্প্রসরমান চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার বহুলাংশ, মাঝে মাঝে ভারতবর্ষ থেকে 'মকরচূড় মুকুট' পরে এসেছে বিজয়ী রাজবংশ। কিন্তু প্রকৃত আধুনিক সাম্রাজ্যতন্ত্রী শাসনের সাক্ষাৎ পেয়েছে ভিয়েৎনাম গতশতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে, যখন ফ্রান্স সেখানে রাজ্য স্থাপন করে বসে। ইংরেজ যেমন একদা বড়াই করত যে তাদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না, তেমনই ফরাসী (আর ওলন্দাজ) সাম্রাজ্যগর্বীরাও করত; চীনের উপকূলবর্তী মাকাও দখলে আছে বলে আজও হয়তো পর্তুগীজরা ঐ একই বড়াই করে থাকে! যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে এসে ফরাসী ইন্দোচীন (যা ছিল ভিয়েৎনামের আখ্যা) কেড়ে নেয়, ফরাসী রাজকর্মচারীদের তখনই খেদিয়ে না দিলেও ফরাসী রাজত্ব তখন থেকে খতম হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই জাপান তার পরাজয়

অনিবার্য বুঝে স্থানীয় লোকদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, আর তখন ভিয়েৎনামী মুক্তি-যোদ্ধারাও হো চি মিন্‌-এর নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন। তবুও আমেরিকা আর ব্রিটেনের উদ্যোগে ফরাসীরা আবার হারানো রাজ্যে জেঁকে বসতে আসে, কিন্তু দেশের উত্তর অঞ্চলে তারা সুবিধা করতে পারে নি, সেখানে যাদের বলা হত 'ভিয়েৎমিন্' (Viet Minh) তারা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে, যার প্রধান হলেন তাদের অবিসংবাদী নেতা, মানুষ হিসাবে আজও অজাতশত্রু হো চি মিন্। ফরাসীরা অবশ্য আবার সারা দেশ দখল করতে উদ্‌গ্রীব ছিল; তাদেরই প্রাক্তন রাজবংশ বুরবঁ-দের (Bourbon) মতো তারা ঘটনাপ্রবাহ থেকে "কিছু শিক্ষা পায় নি, কিছু ভুলেও যায় নি"। ১৯৪৫-৫০ সালে আমেরিকা 'ভিয়েৎমিন্'-দের সম্বন্ধে তেমন অপ্রসন্ন ছিল না, ফরাসীদের সম্পর্কেও খুশি ছিল না। কিন্তু শীঘ্রই মার্কিন বড়কর্তারা বোঝে যে উত্তর ভিয়েৎনামের গোকুলে বাড়ছে সেই শক্তি যা সমগ্র অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাই ১৯৫০ সাল থেকে ফরাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমেরিকা সেখানকার গণ-অভ্যুদয়কে পিষে মারার কাজে নামে।

সম্প্রতি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৩শ কংগ্রেসে ভিয়েৎনামী পক্ষ থেকে বলা হয়: "সোভিয়েত ইউনিয়ন সারা দুনিয়ার সম্মিলিত ফ্যাশিস্ট শক্তিকে পরাজিত করায় আমাদের আগস্ট বিপ্লব (১৯৪৫) সফল হতে পেরেছিল। আবার চীন বিপ্লবের জয় এমন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করল যাতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে আমরা জয়ী হতে পারলাম।" ভিয়েৎনামী বিপ্লবীদের এই বিজয় হল অবিস্মরণীয় দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধক্ষেত্রে (১৯৫৪); সেনাপতি জিয়াপ-প্রমুখ বীরের এ-কৃতিত্ব এশিয়ার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ফরাসীরা এককভাবে লড়ে নি, তাদের সহায়তা করেছে মার্কিন, ইংরেজ প্রভৃতি সব সাম্রাজ্যবাদী, কিন্তু সম্মুখসমরে তারা বিধ্বস্ত হল।

ভিয়েৎনাম সম্পর্কে যে-জেনিভা সম্মেলনের কথা আজকাল অনবরত শোনা যায়, সেই সম্মেলন (১৯৫৪) কিন্তু বসেছিল কোরিয়া নিয়ে আলোচনার জন্য, ইন্দোচীনে অনেক বিরাট ঘটনা ঘটে গেল বলে সে-বিষয়েও কথাবার্তা সেখানে চালানো হয়। মার্কিন সরকার নানা টালবাহানা তখন দেখায়, চীনের সঙ্গে এক টেবিলে বসব না বলে ধনুকভাঙা পণ ঘোষণা করে, ভিয়েৎনামের দক্ষিণে দিয়েম্-কে শিখণ্ডী খাড়া করে তাকে সম্মেলনে ঢুকিয়ে দেয়। ইংরেজ আর

ফরাসী খুবই বিব্রত বলে যুদ্ধশান্তির জন্য কিছু আগ্রহ তারা দেখায়, কিন্তু আমেরিকা ডালেস্-আইজেনহাওয়ার নেতৃত্বে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জেহাদ তখন চালাচ্ছে। যাই হোক, এরকম হট্টচক্রের মধ্যে ২০শে জুলাই, ১৯৫৪, তারিখে একটি চুক্তি হয়—আমেরিকা সই না করলে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নৈতিক দায়িত্ব তার থেকে যায়। চুক্তির মূল কথা হল: ইন্দোচীনে কোনো বিদেশী ঘাঁটি থাকবে না; বিদেশ থেকে হস্তক্ষেপ ঘটবে না; সাময়িকভাবে সপ্তদশ সমান্তরাল ধরে সীমারেখা টানা হবে, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম মিলিত হবে আর সেজন্য দু'বছর বাদে, ১৯৫৬ সালে, সকলের ভোট নিয়ে সম্মতি নির্ণয় করতে হবে, ভারতকে সভাপতি করে যে-আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হল তার কাজ হল এই ভোট নেওয়ার ব্যাপারে তদারক করা এবং সাধারণভাবে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখার দিকে নজর দিয়ে চলা। শীঘ্রই নির্বাচন হবে, উত্তর দক্ষিণ মিলে যাবে, দেশ ভাগ হবে না, এই আশ্বাস জেনিভা সম্মেলনে দিয়েছিল বলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে বলে অঙ্গীকার এল বলে উত্তর ভিয়েৎনাম এই চুক্তি গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৫৬ থেকে দেখা গেল, অবলীলাক্রমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শিখণ্ডী শাসনের নামে নিজের শক্তি কায়েম করছে, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জগৎজোড়া যুদ্ধে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আগলে থাকার জন্য কোনো অপকর্ম থেকেই বিরত হচ্ছে না। বাওদাই, দিয়েম থেকে আরম্ভ করে আজকের কী-র মতো দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন মুরুব্বিয়ানায় পুতুল-নাচনেওয়ালা শাসকের দল তাই সাযগনে বসেছে—একটা নোংরা জের টেনে যেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস কলঙ্কিত হচ্ছে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আসল শাহান্‌শাহ্ বাদশাহ যিনি, সেই মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেন্‌রি ক্যাবট লজ্-কে ১৯৫৫ সালে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন যে সেখানকার স্বাধীন সরকারের আহ্বানে আমেরিকা সাহায্য দিচ্ছে। "স্বাধীন" সরকার বস্তুটির কত অদলবদল হল তা যখন লজ্-কে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তখন তিনি খোলাখুলি বলেন যে ভিয়েৎনামে কেউ ডাকুক বা না ডাকুক, আমেরিকার দায়িত্ব হল সেখানে হাজির হয়ে সব ব্যবস্থা চালানো! ("United States and World Report", Feb. 15, 1956)। যাই হোক, নীতিগত দিক থেকে জেনিভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মানবে বলা সত্ত্বেও আমেরিকা কার্যত দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তার সাম্রাজ্য স্থাপন করে অভাবনীয়

শক্তিসমাবেশ সেখানে করল। কমিউনিজম্ সারা দুনিয়া গ্রাস করতে চলেছে এই দুঃস্বপ্নে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে তারা এছাড়া অন্য কোনো রাস্তা দেখতে পেল না, ভিয়েৎনামের মুক্তিকামনা তাদের কাছে হয়ে রইল একটা অতি তুচ্ছ, নগণ্য বস্তু! এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ডোমিনিকান্ রিপাবলিকে, তারও আগে কিউবাকে উপলক্ষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ব্যবহার দুনিয়া দেখেছে; তাছাড়া কে না জানে যে কঙ্গোকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার কাজে ছিল মার্কিন হাত আর ঘানার বুকে সম্প্রতি যে-ছোরা বসানো হয়েছে তার হাতলে ছিল মার্কিন আঙুলের ছাপ?

ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেলের পূর্বোক্ত বেতারবক্তৃতায় রয়েছে: "আমেরিকার হুকুমে এবং তার সামরিক সাহায্য নিয়ে দিয়েম্-এর সরকার লক্ষ লক্ষ ভিয়েৎনামীকে মেরেছে, যন্ত্রণা দিয়েছে, জেলে পুরেছে। আপনারা কি কেউ দিয়েম্-এর নৃশংসতা ভুলতে পারেন? এটা তো স্পষ্ট হওয়া উচিত যে যাকে আপনারা ভিয়েৎকং বলে জানেন, এই জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট অস্ত্রধারণ করেছিল জাপানীদের চেয়ে নিষ্ঠুর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, আর দেশ জাপানী দখলে থাকার সময় যত লোক মরেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি মরেছে দিয়েম্-এর আমলে এটাই হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব।" আমেরিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার-প্রমুখের কথা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অপরিসীম ধাতব সম্পদ কেড়ে নেওয়ার জন্যই এত বিপুল মার্কিন উদ্যোগ। "আপনারা কি জানেন যে জগৎজুড়ে আমেরিকার যে সামরিক ঘাঁটি আছে তার সংখ্যা হল তিন হাজার তিন শো, আর এ সবগুলিই স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থ এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে?"

যতদিন লাগে, যত দুঃখই বরণ করতে হয়, উত্তর ভিয়েৎনাম যুদ্ধ করে যাবে আমেরিকার এই দস্যুবৃত্তিকে পরাভূত করার জন্য। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মুক্তিফ্রন্ট অবিরাম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, আর যারা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, তারাও সায়গনে এবং অন্যত্র বৌদ্ধদের মতো প্রতিবাদ আন্দোলন চালাচ্ছে, মাঝে মাঝে তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছে—মনে রাখা দরকার যে খাস ওয়াশিংটনে আমেরিকান নাগরিকরা ভিয়েৎনামে মার্কিন নীতিকে ধিক্কার জানাবার জন্য ঠিক এইভাবে নিজেদের গায়ে আগুন দিয়ে মরেছে! সাম্রাজ্যবাদের নীতিভ্রষ্ট দানবিকতা সর্বত্র অভিশপ্ত, স্বদেশেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তার অবসান চাইছে। অর্থ ও অস্ত্রদর্পে আমেরিকার

শাসকদের আজ মতিচ্ছন্ন ঘটেছে, ইতিহাসের অব্যর্থ লিখন তারা দেখেও দেখছে না—এর পরিণাম হল যে-পরিণাম হিটলার এবং তার প্রবর্তিত ধারাকে অবলুপ্ত করেছে।

জেনীভা সম্মেলনে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ভিয়েৎনাম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-কমিশনের নায়ক হল ভারত। সর্বদেশের স্বাধীনতা-প্রয়াস সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী দৌরাত্ম্যে ভুক্তভোগী ভারতবর্ষের মমতা একদা তাকে দুনিয়ার দরবারে একপ্রকার বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ বলে তার কাছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্যস্বাধীন এবং স্বাধীনতাব পরিণতি সমাজবাদ বিষয়ে আগ্রহশীল জনতার প্রত্যাশা ছিল প্রভূত, এখনও তার কিছু অবশিষ্ট যে নেই তা নয়। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভিয়েৎনাম সম্পর্কে ভারতের বক্তব্যে অতিরিক্ত জড়তা থাকত না, কিন্তু সম্প্রতি অর্থনীতিক্ষেত্রে, শিক্ষাব্যাপারে এবং রাষ্ট্রপথ নির্ধারণে ভারত তার সার্বভৌমাত্মক বিদেশী এবং বিশেষ করে আমেরিকান ধনপতিদের স্বার্থে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত করে ফেলতেও যেন উদ্যত বলে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ভিয়েৎনামের ঘটনাবলী থেকে আমাদের আন্তর্জাতিক যে কর্তব্য হল অকাট্য, সেই কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হতে আমরা চলেছি। সংকোচ-বিহ্বলতাব এই জাড্য যে ভারতসত্তারই অপমান, এ-বোধ ভারতের শাসনভার যাদেব উপর ন্যস্ত তাদের চেতনায় যেন নেই।

ভিয়েৎনামের বীরকাহিনী শুনে সাধারণ মানুষের মনে হবে—

> "বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
> এর যত মূল্য, সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা
> স্বর্গ কি হবে না কেনা?
> বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?"

কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার যারা, তাদের যেন তুষ্ণীভাব:

> "দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
> ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা"—

যেখানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্টের মতো পদাধিকারীও বলছেন যে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করা হোক, দক্ষিণে মুক্তিফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনায় আমেরিকা সম্মত হোক্ এবং সেখানে সামরিক আয়োজন আর যেন বাড়ানো না হয়, তখন ভারত শুধুমাত্র জেনীভা সম্মেলনের অনুরূপ আলোচনার কথা বলে অথচ অন্যান্য জরুরী ব্যাপারে নীরব থাকে তখন সন্দেহ হওয়া খুবই সংগত যে এতে অপরাধী আমেরিকারই দোষক্ষালনের চেষ্টা হচ্ছে। যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটু বিব্রত হয়ে স্বীকার করেন যে বোমাবর্ষণ বন্ধ করা এবং মার্কিন সৈন্য ভিয়েৎনাম থেকে সরিয়ে নেওয়া নীতির দিক থেকে অবশ্য ঠিক, কিন্তু পরিস্থিতি এমন জটিল যে আমেরিকার পক্ষে সৈন্যাপসারণ সহজ নয়। তখন বলতে ইচ্ছা করে, অবশেষে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের হয়ে এ-ধরনের ওকালতি করার দুর্বুদ্ধি কেন, এ যে একান্ত লজ্জাকর অধঃপতনেরই পরিচায়ক! কমিউনিজমকে "বোতলবন্দী" (containment) করে রাখতেই হবে, আমেরিকার এই উন্মাদ আবেগে অংশীদারী করার বিপদ কি ভারতের অজানা? দক্ষিণ এশিয়াতে (এবং অন্যত্র) তো দেশের পর দেশ রয়েছে যারা এইভাবে ভাবিত হয়ে আমেরিকার কাছে স্বাধীনতা খুইয়ে বসে আছে—আমরা কি তাদেরই সারিতে ভর্তি হয়ে আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চাই? শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন শাসকদল কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত; তিনিও যে সম্প্রতি লোকসভায় না বলে পারেন নি! "আমরা কি আর একটা ব্রেজিল হতে চলেছি? না আমরা ভারতবর্ষেই থাকতে চাই?"

বামন পুরাণে "দ্বীপময় ভারত"-এর উল্লেখ আছে; এরই প্রান্তে হল ভিয়েৎনাম। কম্বুজ, চম্পা প্রভৃতি নাম দিয়েছিলাম আমরা ভিয়েৎনামেরই বিভিন্ন অংশকে, সমগ্র অঞ্চলের আখ্যা ছিল সুবর্ণভূমি। আজও তো আমরা চেয়ে থাকি ব্রাহ্মমুহূর্তে, কখন পূর্ব দিগন্তে উষার আভাস ফুটবে আর কুহেলিকা উদ্‌ঘাটন করে সূর্যের প্রকাশ ঘটবে। আজও আমরা প্রাণবাহী বর্ষণের জন্য তাকিয়ে থাকি কখন পূর্ব দিগন্ত থেকে বায়ু বইবে, পুব সাগরের পার হতে কখন বহুবাঞ্ছিত অতিথি আসবে। আবার আমাদেরই একান্ত আপন পূর্ব গগনে নব অভ্যুদয় দেখা দেবে, তারই আগমনী আজ ধ্বনিত হতে আরম্ভ হয়েছে ভিয়েৎনামের অসমসাহস মুক্তিপ্রয়াসের বিভিন্ন বিচিত্র ব্যঞ্জনায়। সন্দেহ নেই ভারত আজ ক্লিষ্ট, অতীতের ভার আর বর্তমানের

ব্যর্থতা প্রায়ই আমাদের আতুর করে রাখে, কিন্তু এ দেশের প্রাণ হল মৃত্যুহীন, জাড্যের সুষুপ্তি থেকে জাগরণও হল নিশ্চিত। তাই ভিয়েৎনাম থেকে যেন আজ ডাক আসছে আমাদের কানে—

ধর তার পাণি
জ্বলিয়া উঠুক তব হৃৎস্পন্দনে
তার দীপ্ত বাণী

মোঙ্গোলিয়ার জনগণরাজ্যে

পশ্চিমবাংলা সরকারের একটি দফতর আছে, যার কাজ হল উপজাতি কল্যাণ। বোধ হয় একজন উপমন্ত্রী এর ভার নিয়ে আছেন। হঠাৎ এই বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৫২-৫৩) হাতে আসায় দেখলাম যে ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুসারে পশ্চিমবাংলায় 'তপশীলভুক্ত' উপজাতীয়দের সংখ্যা হল বিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার আটশো তিরাশী (২০,৬৩,৮৮৩)। একটা তপশীলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে এদের কেউ নিম্নস্তরের মানুষ ভাববার মতো ধৃষ্টতা রাখবেন না ভরসা করি। এদেরই মধ্যে আছেন নেপালী, যাদের সম্বন্ধে সেদিন দেখলাম ইয়োরোপে একজন নামজাদা বিদ্বান্, হলাণ্ডের য়ুট্রেখট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোয়ান্ট লিখেছেন যে অর্থব্যবস্থা প্রায় আদিম হলেও নেপালে শিল্পের কোনো কোনো শাখায় এমন উৎকর্ষ ঘটেছে যে মার্কসবাদী পদ্ধতিতে এই অসংগতির ব্যাখ্যা খুব সহজ হবে না। পশ্চিম বাংলার তপশীলী উপজাতির মধ্যে আরও রয়েছেন সাঁওতাল যার সান্নিধ্যে ভদ্রজনের কপটতায় ক্লান্ত বিদ্যাসাগর শান্তি পেতেন, যার সবল, সত্যসন্ধ তেজস্বিতা সম্ভবত সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে তারাশঙ্করের পরিকল্পিত উপন্যাসে কিছুটা চিত্রিত হবে।

এই বিশলক্ষাধিক উপজাতীয়ের কতটা কল্যাণ আমাদের স্বাধীন ভারতীয় গণরাজ্যে হয়েছে বা হচ্ছে তার হিসাব কষতে বসি নি। এদের কথা মনে হল এজন্য যে সম্প্রতি যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম সুদূর মোঙ্গোলিয়াতে—যে-দেশ সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকলেরই ধারণা খুব অস্পষ্ট, যে দেশের বাসিন্দা সম্পর্কে আমরা অনেকে ভাবি যে তারা হয় লামা নয় যাযাবর জাতীয় লোক, আমাদের দেশের অবহেলিত উপজাতীয়দেরই তারা সামিল, সভ্যসমাজে প্রায় ধর্তব্যই হয়তো নয়। যারা কিছু ইতিহাসের খোঁজ রাখেন তাদের কাছে অবশ্য এরকম ধারণা হাস্যকর, কিন্তু সাধারণত আমরা ভেবে থাকি মোঙ্গোলিয়া হল একেবারে যাকে বলে পাণ্ডববর্জিত দেশ, বৈচিত্র্যসন্ধানী পর্যটক ছাড়া কারও কাছে সে দেশের তেমন কোনো দাম নেই। নিজের চোখে দেখে এসেছি বলে জোর

করে বলতে পারি যে এই দেশ নিয়ে আমরা যারা হলাম অনগ্রসর দুনিয়ার মানুষ তারা বাস্তবিকই গর্ব করতে পারি। এশিয়ায় এই মোঙ্গোলিয়াই প্রথম সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আর সেখানকার ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, মানবিক পরিস্থিতিতে তাদের যে কৃতিত্ব তাকে অসাধ্যসাধন বলতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করছি না।

মোঙ্গোলিয়ার আয়তন বিপুল। পনেরো লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই দেশের অনেক এলাকা অত্যন্ত দুর্গম। দক্ষিণে বিস্তৃত মরুভূমি, যার নাম হল গোবি—কিন্তু অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন এই বিরাট মরুভূমি একেবারে দুরতিক্রম্য নয়, এর স্থানে স্থানে বেশ বসতি আছে আর সেখানকার বাসিন্দারা 'গোবি' বলতে পাগল। বালির মধ্যে সুগন্ধি ঘাস কোনো কোনো এলাকায় জন্মায় যার মায়ায় যেন তারা বাঁধা পড়েছে; তাদের প্রবাদে, কাহিনীতে, জীবনে এই ঘাসের সুরভি মিশে গিয়েছে। আগে শুধু উট আর ঘোড়া নিয়ে মোঙ্গোলরা গোবি মরুভূমি দিয়ে যাতায়াত করত; আজ আরও চলেছে মোটর, কোথাও কোথাও গাড়ির সারি চলে নিয়মিতভাবে, বহুদূর থেকে প্রয়োজনীয় সম্ভার এনে পৌঁছে দেয়।

মোঙ্গোলিয়ার আয়তন হল ব্রিটেনের সাতগুণ—আমাদের দেশের তুলনায় কিছু ছোট হলেও পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে তার স্থান। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার লোকসংখ্যা হল তেরো লক্ষের বেশি নয়; রাজধানী উলান বাটর-এ থাকে প্রায় দু' লক্ষ, আর বাকি এগারো লক্ষ সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সর্বদেশের ধনিক সাহায্যে পুষ্ট, ইহুদীদের রাজ্য ইজরায়েল আয়তনে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তারও জনসংখ্যা বিশ লক্ষের কিছু উপরে! আর গোড়াতেই তো দেখলাম আমাদের পশ্চিমবাংলার তপশীলভুক্ত উপজাতীয়দেরই সংখ্যা হল মোঙ্গোলিয়ার চেয়ে ঢের বেশি। এত বৃহৎ দেশে অতি অল্পসংখ্যক লোক অসংখ্য বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নতুন সমাজ গড়ছে—সুদীর্ঘ অতীতের বিচিত্র ও বিপর্যয়ী বোঝা তাদের কাঁধ ভেঙে দিতে পারে নি। বহুবিধ বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার যে পরম্পরা হল মোঙ্গোলীয় জনগণের ইতিহাস, তার ভার তাদের পঙ্গু করতে পারে নি। এ দেশ থেকে সেখানে গিয়ে নিজেদের অক্ষমতার কথা ভেবে একটু যেন অস্বস্তি লাগে, অপ্রতিভতার ভাব আসে, মনে হয় বর্তমানে আমাদের নিয়তিই বুঝি এমন যে বলতে হয়—"যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না"। ক্রমে ব্যর্থতার কুয়াশা অবশ্য কাটে। অসাধ্যসাধন তো কোনও

বিশেষ দেশের একচেটিয়া কাণ্ড নয়; আমরাও কি এদেশে প্রকৃত সমসুযোগের জীবন প্রতিষ্ঠার মূল্য দিতে পারব না?

একটু অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অকস্মাৎ একদিন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় দফতর থেকে খবর এল যে মোঙ্গোলিয়ার জনগণতন্ত্রের চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে-উৎসব হবে, সেখানে সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হয়েছি। এর মানে শুধু উৎসবে, উপস্থিত হতে পারা নয়, তারপর যতদিন খুশী সেদেশে থাকারও অনুরোধ রয়েছে। মনে পড়ে গেল কয়েক বৎসর আগেকার কথা। মোঙ্গোলিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ৎসেদেনবাল (Tsedenbal) যিনি একই সঙ্গে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির (যার পুরো নাম হল মোঙ্গোলিয়ন পীপলস রেভল্যুশনরি পার্টি) সম্পাদক, দিল্লীতে যখন এসেছিলেন, তখন রাষ্ট্রপতি-ভবনে এক ভোজসভার শেষে জওয়াহরলাল নেহরুকে কৌতুক করে বলেছিলাম যে তিনি তো মোঙ্গোলিয়া যাবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিতে যেন ভুল না হয়! অবশ্য তা হবার নয় জেনেই এ কথা বলেছিলাম, তিনিও জানতেন। শেষ পর্যন্ত জওয়াহরলালের মোঙ্গোলিয়া যাওয়া হয় নি। আমার ভাগ্যে যে শিকে ছিঁড়বে কখনও, তা ভাবতে পারি নি। আর সস্ত্রীক এমন দূর যাত্রায় পাড়ি দিতে পারা বড় কম সুযোগ নয়। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিদেশে নিমন্ত্রণ পেলে সাহেবসুবোদের দেশে যাওয়ার আগ্রহ বেশি, মোঙ্গোলিয়া তাদের হয়তো তেমন করে টানত না। আমার কিন্তু ঢের বেশি পছন্দ সেই সব দেশে যাওয়া যাদের সঙ্গে অতীত যুগে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে কিছু পরিচয় তো বহু পূর্বেই ঘটেছে: আজ যদি বলিদ্বীপে যেতে পাই তো কুবেরের রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিমন্ত্রণও (যা কখনও আসবে না!) ঠেলতে পারি।

২১ জুলাই ছিল উলান্ বাটরে উৎসবের দিন। ব্যক্তিগত কারণে আমাদের পক্ষে তার আগে রওয়ানা হওয়া সম্ভব হয় নি। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে আমরা মোঙ্গোলিয়া পৌছেছিলাম; উৎসবের কোলাহল তখন নীরব, কিন্তু "এবার কথা কানে কানে" বলে মোঙ্গোলিয়া যেন আমাদের কাছে টেনে নিয়েছিল। প্রায় পক্ষকাল মাত্র সেদেশে আমরা কাটিয়েছি, কিন্তু স্বল্প পরিচয়েও গভীর আত্মীয়তা স্থাপিত হতে পারে। ফেরার সময়

মনে হয়েছিল যেন আমাদের হৃদয়ের একাংশ সেই দূর দেশে রেখে আসছি।

আজকাল ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশ পর্যটন এমনই কঠোর বস্তু যে কোথাও গিয়ে সেদেশের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক অনুভব করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিদেশী মুদ্রার স্বল্পতা আমাদের আজ এতই নিদারুণ যে সরকারী প্রতিনিধি কিম্বা মুষ্টিমেয় ধনপতি (যাঁরা আইন মেনে কিম্বা না মেনে বিদেশে টাকা আগলে রাখার ব্যবস্থা করেছেন) ভিন্ন কেউই স্বচ্ছন্দচিত্তে বিদেশ বিহার করতে পারেন না। সোশালিস্ট দেশ থেকে নিমন্ত্রণ এলে কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব, একবার সেদেশে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আর বিন্দুমাত্র গণ্ডগোলের আশঙ্কা নেই। 'পশ্চিমী' দেশগুলি থেকে নিমন্ত্রণ এলেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু খট্‌কা থাকে। একবার কমন্‌ওয়েল্‌থ পার্লামেণ্টারি কনফারেন্স করতে অস্ট্রেলিয়া যেতে হয়েছিল, সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান্‌ সরকার, কিন্তু তাঁরা আগেভাগেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে হোটেল বা অন্যত্র বখশিস, কাপড়-চোপড় কাচার খরচ, অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা, ইচ্ছামত আহার বা পানায় বাবদে ব্যয়, সম্মেলনের নির্দিষ্ট কর্মসূচীর বাইরে কোথাও যাওয়ার বা থাকার খরচ প্রভৃতির দায়িত্ব তাঁরা নিতে পারবেন না। কথাটা অবশ্য খুবই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু সোশালিস্ট দেশের আতিথেয়তা কোনো যুক্তির ধার ধারে না। তাদের নিমন্ত্রণে একবার তাদের দেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অতিথিকে রাজার হালে রাখতে তারা কসুর করবে না। আপনার স্বাস্থ্য দিব্য অটুট থাকলেও তারা বলবে, পরীক্ষা করিয়ে নিতে ক্ষতি কি, মাঝে মাঝে 'চেক্‌-আপ' তো দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি, আর কোথাও কোনো সুবাদে আপনাকে কিছু খরচ না করতে হয় তার ব্যবস্থা করবে। সৌহার্দ্যের এই প্রাচুর্যে মাঝে মাঝে অস্বস্তি পেতে হয় বটে, কিন্তু সোশালিস্ট দেশের এই দরাজ দাক্ষিণ্যকে "জিন্দাবাদ" বলতে ইচ্ছা করে, নতুবা আমাদের মতো নিঃস্বের পক্ষে স্বপ্নপ্রয়াণ বিনা বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব হয় না!

মোঙ্গোলিয়া যাবার রাস্তা আমাদের হল—দিল্লী থেকে মস্কো, সেখানে দেড়দিন একরাত কাটিয়ে উলান্‌ বাটর যাত্রা। এটাকে বেশ একটু ঘুর পথ বলা চলে—পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যেতাম কলকাতা থেকে হংকং হয়ে পিকিং, তারপর উলান্‌ বাটর। কিন্তু বিধি বাম—এই সোজা পথ আমাদের পক্ষে বন্ধ। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, চীনা কর্তৃপক্ষের ক্রিয়াকলাপে শুধু যে

আমরাই ক্লিষ্ট এবং চিন্তিত নই, তা লক্ষ করলাম মোঙ্গোলিয়া গিয়ে। কমিউনিস্ট জগতে কয়েক বৎসর ধরে যে-বিতর্ক চলছে, তাতে মোঙ্গোলিয়ার পার্টি চৈনিক চিন্তা অনুসরণ করতে পারে নি, চীন দেশে বহু মোঙ্গোলিয়ানের বাস এবং স্বাধীন মোঙ্গোলিয়া সম্বন্ধে চীন রাষ্ট্রের মতিগতি কখন কি ঝোঁক নেয় সেদিকে মোঙ্গোলিয়াকে সতর্ক থাকতে হয়—তাই মোঙ্গোলিয়া আর চীনের পরস্পর সম্পর্কে আজ উষ্ণতার রীতিমতো অভাব। তবু মোঙ্গোলিয়ার সরকার তুচ্ছ কটুকাটব্য বর্জন করে এমন মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়ে থাকে যা লক্ষ্য না করে পারা যায় নি। বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলেই বোধ হয় এমন বৈশিষ্ট্য মোঙ্গোলিয়ার আচরণে দেখলাম। অপর দিক থেকে এরই আর-এক উদাহরণ হল উলান্ বাটরে মোঙ্গোলিয়ান বিজ্ঞান আকাদেমি ভবনের সামনে স্টালিনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তরমূর্তির অবস্থিতি। সোভিয়েটের সঙ্গে মোঙ্গোলিয়ার একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সোভিয়েট সরকারের অটুট, অবারিত সহায়তা বিনা মোঙ্গোলিয়ার বর্তমান সাফল্য সম্ভব হত না; পার্টিগত ভাবে দুই দেশের কমিউনিস্টরা সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যেহেতু স্টালিনের বহু অপকর্ম নিয়ে কঠোর অথচ প্রয়োজনীয় সমালোচনা হয়েছে, সেহেতু তাঁর সমগ্র ঐতিহাসিক ভূমিকা ভুলে গিয়ে স্টালিনের নাম মুছে দেওয়া আর যত্রতত্র তাঁর প্রতিকৃতি হঠাৎ হটিয়ে দেওয়ার মতো মানসিক হঠকারিতা মোঙ্গোলিয়া দেখায় নি। আরও লক্ষ করলাম যে মহামতি লেনিন সম্বন্ধে অপরিসীম শ্রদ্ধার বহু নিদর্শন সত্ত্বেও কতকটা নামাবলী পরিধানের মতো চারদিকে তাঁর ছবি টাঙানো আর কথা সাজিয়ে রাখার বাড়াবাড়ি সেখানে নেই। আবার মোঙ্গোলিয়ান বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নেতা সুহে-বাটর (১৮৯৩-১৯২৩) এবং চোইবালসান্ (মৃত্যু ১৯৫২)-এর স্মৃতি জাগরূপ রাখার বিবিধ ব্যবস্থা সুচারু-ভাবে করা হয়েছে।. এঁদের সমাধি সৌধ অনেকটা মস্কোর লেনিন-সমাধির ছাঁচে গড়া বটে, কিন্তু স্বকীয় বিপ্লবী কৃতিত্ব সম্বন্ধে মোঙ্গোলিয়ানদের সংগত ও ও স্বাভাবিক গর্ব প্রকৃত সৌষ্ঠব সহকারেই সেখানে প্রকাশিত দেখলাম।

সকাল পৌনে দশটা নাগাদ দিল্লীর পালাম বন্দর থেকে আকাশ যাত্রা। প্লেন সোজা দৌড় দিল আর এত উঁচু দিয়ে যে গগনভেদী পর্বতের পর পর্বতচূড়া অনেক নীচে পড়ে রইল। "পৃথিবীর মানদণ্ড" বলে কালিদাস হিমালয়কে অভিহিত করেছিলেন, তাকে বলেছিলেন "দেবতাত্মা"—এই হিমালয়েরই শাখা-প্রশাখার অভ্রংলিহ গরিমা অবশ্য মাঝে মাঝে চোখের পরিধির মধ্যে

আসছিল। এয়ার ইণ্ডিয়ার এই বিমান চমৎকার চলে কিন্তু যায় যেন বড় দ্রুত আর বড় বেশি উঁচু দিয়ে। মনে পড়ল ১৯৫৪ সালে প্রথম সোভিয়েট যাত্রার কথা—কাবুল থেকে ছোট্ট অথচ গাঁট্টাগোট্টা সোভিয়েট প্লেনে তারমিজ হয়ে তাশখন্দ যাওয়ার সময়। সে-প্লেনে যাত্রীদের আরামের আয়োজন ছিল স্বল্প আর হাজার পনেরো ষোল ফিট উঠলে 'অক্সিজেন' নিতে হত, তবে এই সামান্য তকলীফের খেসারৎ মিলত যখন পামীরের পাহাড়ের গায়ে যেন হাত দিতে পারা যায় মনে হত, যে পাহাড় একেবারে নিছক পাথর, অনেক সম্ভব-অসম্ভব কায়দায় মাথা-চাড়া-দেওয়া পাথর। যাক্, এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে স্বাচ্ছন্দ্য অশেষ, আর আমাদের চালকেরাও অতি সুনিপুণ, কোনও দেশের বৈমানিকের তুলনাতে তাঁরা নিরেশ নন। এই লাইনের প্লেন বড় ব্যস্তসমস্ত, মস্কো হয়ে লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্ক পাড়ি দেওয়া এর কাজ—অনেক ওপর থেকে একবার তাশখন্দের দেখা মিলল, আর মস্কো যখন পৌছানো গেল তখন বেলা দেড়টাও বাজে নি, যদিও মস্কোর ঘড়িতে দেড়টা হল আমাদের চারটে।

আগে-দেখা মস্কো বিমান বন্দরের চেহারা বদলেছে—আয়তন বেড়েছে, বন্দোবস্ত সরেশ হয়েছে, দেখতে মনোরম হয়েছে। মস্কো আর সোভিয়েট দেশের অন্যত্র যেখানেই এবার গেলাম, পরিবর্তন দেখলাম—মস্কোর বহু এলাকা তো একেবারে চেনা যায় না, আর যাবেই বা কেমন করে, কারণ সেখানে আনকোরা নতুন সব অঞ্চল বানানো হয়েছে। কাকে যেন বলেছিলাম যে মস্কোয় যখনই আসি দেখি ক্রমাগত অদলবদল চলেছে, তবে দুটো ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন নেই—যেদিকে তাকানো যায় নতুন বসতবাড়ি বা শিল্পালয় গড়ে ওঠার দৃশ্য প্রত্যেকবারই দেখলাম, আর দেখলাম লেনিনের সমাধি-সৌধের সামনে সারাদিন অনবরত প্রকাণ্ড লম্বা 'কিউ', এ-দৃশ্যেরও কোন পরিবর্তন ঘটে নি। যাই হোক মস্কো সম্বন্ধে লিখতে বসি নি, আর আমাদের লক্ষ্যস্থল মোঙ্গোলিয়া তখনও যথেষ্ট দূর। মোঙ্গোলিয়ান দূতাবাস আর সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের নিতে এসেছিলেন দুজন। তাঁদের কল্যাণে আমাদের কুটোটি পর্যন্ত নাড়তে হল না, কাস্টমস পরীক্ষাতেও হাজির হতে হল না, বিন্দুমাত্র গা না ঘামিয়ে মোটর যোগে শহরে আমরা চললাম, মালপত্র গন্তব্যস্থলে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমরা তখন ছিলাম মাঙ্গোলিয়ান পার্টির অতিথি, আর ফিরতি পথে যখন সোভিয়েটে কিছুদিন ছিলাম তখন আতিথ্য এল সোভিয়েট পার্টির পক্ষ থেকে। তাই

এমন নির্ঝঞ্ঝাটে, প্রায় যেন রাষ্ট্রদূতের সুযোগ সুবিধা উপভোগ আমরা করতে পেলাম। আমাদের জীবনযাত্রার ধরনে হিংসে করার মতো বিশেষ কিছু কেউ দেখবেন না, কিন্তু যারা বিদেশ ভ্রমণের ঝামেলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রাখেন, তাঁরা এ কথা শুনে আমাদের হিংসে করলে আশ্চর্য হব না।

মোঙ্গোলিয়ান আতিথেয়তার আস্বাদ কিছুটা পাওয়া গেল মস্কোয় দেড় দিন কাটাবার সময়, কিন্তু আসল বস্তুর পরিচয় মিলেছিল খাস মোঙ্গোলিয়া পৌছবার পর। তবে পৌছবার পালাটি খুব সহজ ছিল না; রাত দশটা সাড়ে দশটার সময় মস্কো ছেড়ে পরদিন সকাল দশটা নাগাদ উলান বাটরে হাজির হব ভেবে হিসাব করা গেল যে ঘণ্টা বারোর ব্যাপার। প্লেনে চোখ বুজে, ঘুমিয়ে এবং কিছুটা দেখতে দেখতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু হরি হরি —আমরা টাইম্‌-টেবিলে যা দেখছিলাম তা হল 'মস্কো টাইম', অর্থাৎ মস্কোয় যখন সকাল দশটা, তখন উলান্‌ বাটরে সূর্যদেবের 'রুটিন্‌'-এর কল্যাণে আরও পাঁচ ঘণ্টা কেটেছে, বিকেল তিনটে অন্তত বেজেছে। ষোল ঘণ্টা প্লেনযাত্রার জন্য তাই তৈরি হতে হল—মস্কো থেকে জগদ্বিখ্যাত ট্রান্সাইবীরিয়ান্‌ রেলপথে গেলে উলান্‌ বাটর পৌছাতে দিনছয়েক লাগে জেনেও কিছু উল্লাস বোধ করা গেল না। দূরত্বের বিপুল ব্যবধানকে দ্রুতধাবী আকাশযান আজ জয় করেছে, এ-সব চিন্তা দিয়েও ষোলঘণ্টার ভাবনাকে ঢাকা গেল না। মানুষ যে খেতে পেলে বসতে চায় আর বসতে পেলে শুতে চায়, আর কিছুতেই যে তার স্বস্তি নেই, এ খুব ঠিক কথা।

মস্কো থেকে চড়া গেল সোভিয়েট 'টি-ইউ' প্লেনে—বেশ বড়সড়, সব ব্যবস্থা ভালো, আর দুর্ঘটনা নাকি এতে কখনও হয় না। তবে আমরা আসছিলাম এয়ার'ইণ্ডিয়ার বোইং-য়ে চড়ার পর, তাই কয়েকটা তফাৎ সহজেই চোখে পড়ল। এয়ার ইণ্ডিয়ার যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যব্যবস্থা শুধু যে প্রচুর তা নয়। (সোভিয়েট প্লেনেও প্রায় তেমনই), কিন্তু যাত্রীকে আরামে রাখার অবিরাম আয়োজন লক্ষ না করে উপায় নেই। সেখানে সুবেশিনী সুদর্শনা 'এয়ার-হোস্টেস্‌'-দের অত্যন্ত ক্লান্তিকর যাত্রীর সামনেও সুরভিত সৌজন্যের লেপটে-রাখা মুখোস না খোলার শিক্ষায় অভ্যস্ত হতে হয়। বিমানে আরোহীরা সাধারণত বিত্তবান্‌; তাদের কারও কারও চাহিদা এমন যে সাধারণ বুদ্ধিতে তাকে বলা চলে 'আবদার' আর তার জবাবে কিছু পরিমাণে

আসতে বাধ্য সেই গুণ যার লোকায়ত নাম হল 'আদিখ্যেতা'। ফলে নানা দেশের সওয়ারী নিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার (কিম্বা অনুরূপ) আরামপোত যখন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ছোটে, তখন মাঝে মাঝে এমন খণ্ড দৃশ্য চোখে পড়ে যা সোভিয়েট প্লেনে একেবারে অভাবনীয়। যাত্রীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি সেখানে নেই; এমন কি, প্লেন ওঠার পরে আর নামার আগে আসনের সঙ্গে নিজেকে 'বেল্ট্' দিয়ে বেঁধে নিলেন কিনা, তারও তেমন তদারকি নেই। ঘণ্টা বাজিয়ে দরকার হলে 'হোস্টেস'-কে ডাকুন, কিন্তু নিজে থেকে বারবার আপনার স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে বেড়াবার কারও গরজ নেই। দেখবেন হোস্টেস-দের চেহারা আর সাজগোজ মোটামুটি ভালো—একটু যেন মনে হল যে ১৯৫৪ সালের প্রায় কাঠখোট্টা ভাব মোলায়েম হয়ে এসেছে কিন্তু কেউ যে নিজেকে 'আহামরি' রূপে দেখাতে চাইছেন তার লেশমাত্র চিহ্ন নেই। হয়তো আপনার মনে হবে একটু বেশি আরাম পেলে মন্দ হত না। কিন্তু বিমান-সেবিকাকে দেখে তার চেয়েও মনে পড়ে যাবে—'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা'! হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আর বলতেই হবে যে সোভিয়েট প্লেনে খাদ্যবস্তুর পরিমাণ হল আমাদের প্রয়োজন হিসাবে অনেক বেশি প্রচুর—সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় তারা খায় বেশি। কিন্তু সেখানেও একটু গণ্ডগোল আছে, কারণ শাদা এবং কালো রুটির টুকরোগুলো প্রকাণ্ড আর মাঝে মাঝে সুখাদ্য মাংসখণ্ড এমন যে তাকে চর্বণ করা সহজসাধ্য নয়, অথচ অপরাপর যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে আহার করে যাচ্ছে দেখা যাবে। তাই একটুও চোখে লাগল না যখন ইর্‌কুট্‌স্ক্‌ বিমানবন্দরে প্রাতরাশের সময় দেখা গেল যে প্রত্যেকের সামনে রয়েছে (অন্যান্য খাদ্য ছাড়া) চারটে করে ডিম, আর অনেকেই অবলীলাক্রমে একের পর একটা খোলা ভেঙে তার সদগতি করাচ্ছেন।

উলান বাটর যাবার সময় মস্কোতে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন এক ইতালিয়ান দম্পতী—স্বামী ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য, পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য। প্রাণোচ্ছল মানুষ, সদাহাস্য মুখ, আর হাবভাব এমন যে ইংরেজের চোখে মনে হবে যেন কামিজের বাহুতে হৃদয়টিকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তুলনায় স্ত্রী খুবই সংযত, আর না হয়েও বেচারীর উপায় নেই, কারণ সর্বদাই স্বামীপ্রবর ভাবে ভঙ্গীতে বাক্যে এবং বিন্দুমাত্র অপ্রতিভতার ধার না ধেরে পত্নীপ্রেম প্রকাশ করছেন। আমাদের গন্তব্যস্থল এক, এবং

এদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আমরা খুবই আনন্দে ছিলাম। সমস্যা ছিল শুধু ভাষা নিয়ে। আমার প্রায়-ভুলে-যাওয়া ফরাসী প্রয়োগ করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে লাতিনের দুহিতা হলে কি হবে, ফরাসী এবং ইতালিয়ানে তফাৎ অনেক, এবং আমাদের বন্ধুরা ইতালিয়ান ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝেন বা বলেন না। পরে মোঙ্গোলিয়াতে আমাদের দোভাষী জানতেন ইংরেজি, আর তাঁদের দোভাষী জানতেন ইতালিয়ান— মাঝে মাঝে এই ত্রিবিধ মধ্যস্থতায় কথোপকথন চলত। কিন্তু এতে পরস্পর হৃদ্যতার কোনো বাধা ঘটে নি, একবর্ণ বুঝছি না জেনেও ইতালিয়ান বন্ধুটি অনর্গল অঙ্গভঙ্গী সহকারে নানা বিষয়ে বলে চলতেন, আর নিজের 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' দেখে একটু যেন পরাজিত ভেবে বিমর্ষ হতে গিয়ে দেখতাম যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে উভয় বিদেশীর বহুবিষয়ে কথাবার্তা স্বচ্ছন্দেই চলেছে। মনে পড়ে গেল যে আমাদের ঋষিরা শব্দকেই ব্রহ্ম বলেছেন, বাক্যার্থকে কখনও অতবড় সংজ্ঞা দেন নি।

গভীররাত্রে প্লেন থামল সাইবীরিয়ার রাজধানী অম্‌স্কে (Omsk)—তখন ঘনান্ধকার, পরে দিনের আলোয় এই বিস্তীর্ণ শিল্পনগরী আমরা দেখেছিলাম। তারপর বহুদূর পার হয়ে ইর্‌কুট্‌স্ক্ (Irkutsk), সোভিয়েট দূরপ্রাচ্য অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে প্লেন বদলে চড়লাম তুলনায় ছোট জাহাজে, যার পাইলট এবং হোস্টেস্ মোঙ্গোলিয়ান, যাত্রীদের মধ্যে অনেকেও দেখলাম মোঙ্গোলিয়ান (কিংবা তদনুরূপ কোন জাতিভুক্ত)। সোজা উলান বাটর থেকে প্লেন না বদলে মস্কো যাওয়া যায়—আমরা ফেরার সময় সেভাবে গিয়েছিলাম। অনেক দূর থেকে দেখা গেল বিখ্যাত বৈকাল হ্রদ, বিপুল এর আয়তন আর এর এক প্রান্তে বিরাট এক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। লম্বা পাড়ি দিয়ে তখন আমরা ক্লান্ত, তাই এইসব ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি চাঞ্চল্য বোধ করা গেল না। উলান বাটরে পৌঁছতেও তখন আর দেরি নেই।

আমাদের চেনা ডাকোটার মতো এই প্লেন খুব বেশি উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল না। সাইবীরিয়ার লম্বা গাছে ভরা জঙ্গলের দৃশ্য ইর্‌কুট্‌স্ক্ থেকেই বদলে আসছিল। এবার দেখা গেল এক ধরনের পাহাড়, যা সারির পর সারি বেঁধে মোঙ্গোলিয়ার অধিকাংশ জুড়ে আছে। অনেক দূরে পশ্চিমে আর উত্তরে আছে বরফের পাহাড়, যার চূড়ার বরফ কখনও গলে না, কিন্তু সারা দেশ জুড়ে আছে এমন পাহাড় যাকে মাঝে মাঝে টিলা বললে ভুল হয় না—কিন্তু টিলার

পর টিলা আর পাহাড়ের পর পাহাড় চলে গেছে, ঠিক যেন মাটি ভেদ করে ঢেউয়ের পর ঢেউ ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ সে ঢেউয়ে তাণ্ডব নেই, আছে শান্তির হাতছানি। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে মোঙ্গলদের একদা খ্যাতি ছিল; চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান প্রমুখ সমরনায়কের কৃতিত্ব ইতিহাসে অতুলন। মোঙ্গল ঘোড়সওয়ার আর তীরন্দাজ নিয়ে তারা জগজ্জয়ের অভিযানে নেমেছিলেন। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার নিসর্গ দৃশ্য কঠোর নয়। মনে হয় তার গিরিকান্তার মরু উৎপাদনে কৃপণ হলেও অন্তরের প্রসাদে প্রচুর। উপত্যকা ভিন্ন কোথাও বৃক্ষের আশ্রয় সেদেশে নেই। পাহাড়ের গায়ে তরুলতা অতি বিরল, কিন্তু প্রায় সর্বত্র আছে তৃণ যা আমাদের দুর্বাদলের মতো স্নিগ্ধ ও শ্যামল না হলেও মনোরম। এই তৃণ মোঙ্গোলিয়ার বিপুল পশু সম্পদকে ধারণ করে আছে, আর এই খবতৃণাস্তৃত ভূমিস্তূপগুলি সারা দেশকে যেন এক নিতম্বখচিত শোভায় মণ্ডিত করেছে।

ঢেউ খেলানো পাহাড়ের মালা দিয়ে ঘেরা শহর হল উলান-বাটর। রাস্তা কেবল ওঠে আর নামে বলে বিমানবন্দর থেকেই স্পষ্ট দেখা গেল শহরের চেহারা। শহর আর শহরতলী মিলে দু লক্ষের বেশি লোক থাকে না সুতরাং বিরাট শহর যে নয় তা বলাবাহুল্য। কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে যে দেশকে বেশ কয়েক শতক পিছিয়ে থাকা বলে আমাদের ধারণা তার আধুনিক যুগসম্মত চেহারা সুন্দর লাগল। যখন পৌছলাম তখন সেখানে অপরাহ্ন; পাকা, বাঁধানো রাস্তা, সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত বলে ভিড় বেশি নেই, গাড়ির সংখ্যা কম তবে মালপত্র নিয়ে লরী যাতায়াত করছে প্রায়ই, মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে কেউ যাচ্ছে দেখা গেল, আর শহরের বাইরে মুক্ত প্রান্তরে সারি সারি তাঁবু—এখনও দেশের অর্ধেকেরও বেশি লোক বাস করে তাঁবুতে, গ্রামাঞ্চলে তো তাঁবুতে থাকাই রেওয়াজ যদিও শহরের মতো সেখানেও ক্রমশ পাকা বাড়িতে বাস করার ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে। পাশের মাঠে তাঁবুর সারি আর দূরে শহরে মধ্যস্থলে আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত সু-উচ্চ হর্ম্যরাজি, মাঝে মাঝে কারখানার চিমনী, কোথাও বা একটা প্যাগোডা, আর চারদিকে যেন লাইন দেওয়া পাহাড় দেখতে দেখতে সরকারী অতিথি নিবাসে আমরা পৌছে গেলাম। সেখানে বন্দোবস্ত একেবারে প্রথম পংক্তির হোটেলের মতো; কোথাও খুঁৎ তো আমরা দেখলাম না। অতীতের বোঝা থেকে আবর্জনার ভাগ দূর করছে বলেই যেন তারা ঐ পুরোনো দেশে নতুন

জীবন গড়ে তোলার কাজে সকল চেতনাকে একাগ্র করে আর মনের উদ্দীপনাকে সংহত করে নামতে পেরেছে।

তিব্বতের মালভূমি থেকে প্রশান্ত মহাসাগর আর চীনের বিরাট প্রাচীর থেকে সাইবীরিয়ার গহন অরণ্যের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নানা যাযাবর জাতি উপজাতির বহুকাল হতে বাস। এদেরই মধ্যে ছিল মোঙ্গল আর তুর্ক আর তাদের শাখাপ্রশাখা। মোঙ্গোলিয়া বলতে যে এলাকা বোঝায় তার ইতিহাস অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত জানা যায়। যে দুর্ধর্ষ হূন-এরা আমাদের দেশেও দাপট দেখিয়েছিল আর অ্যাটিলার নায়কত্বে রোমান সাম্রাজ্যের দরজায় হানা দিয়েছিল, তারা মোঙ্গোলিয়ায় রাজত্ব করেছে। তারপর এসেছে তুর্কী আর তাদেরই কুটুম্ব তাতারদের শাসন। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, ঘরছাড়া মোঙ্গোলদের একত্রিত করে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে কুবলাই খান আর চেঙ্গিস খান-এর মতো মহারথী প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে এশিয়া-ইয়োরোপের সব রাজাবাদশাকে থরহরি কম্পমান করে ছেড়েছিলেন। এখনও পুরোনো কারাকোরম্ শহরে এর অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। তারপর ১৯১১ সাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই শো বৎসর ধরে চীনের মাঞ্চু সম্রাটবংশ মোঙ্গোলিয়াকে পদানত করে রাখে। এটা খুব দুরূহ কাজ ছিল না, কারণ যাযাবর প্রথার সঙ্গে সামন্ততন্ত্র মিশে সেখানে এক উদ্ভট সমাজরূপের উদ্ভব ঘটেছিল, যা বিদেশী শক্তির কাছে পদানত না হয়ে পারে নি। ইতিমধ্যে অনবরত লড়াইয়ে লেগে থাকার অপর পিঠ হিসাবে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত পার হয়ে লামা-মার্কা বৌদ্ধ ধর্মও সেখানে প্রচলিত হয়েছিল। হয় যুদ্ধে (বা আনুষঙ্গিক কর্মে) লিপ্ত হয়ে থাকা নয় সংসার থেকে নিবৃত্তি নিয়ে মঠবাসী ধর্মযাজক হওয়া। এ ছাড়া কোনো বৃত্তি ভদ্র বলে পরিগণিত ছিল না—ইতর জন মেহনৎ করবে, মাঠে খেটে কিংবা লড়াইয়ে মরবে, ধর্মের সান্ত্বনা ছাড়া আর কোনো স্বস্তি তাদের জন্য নয়, এই ছিল ধারণা। ১৯১৯ সালেও দেখা যায় চীন দাবি করছে তথাকথিত বহির্মোঙ্গোলিয়ার উপর কর্তৃত্ব, আর মোঙ্গোলিয়া সে দাবি অস্বীকার করতে থাকলেও সেখানে রাজত্ব করছেন যিনি, তিনি ভগবান্ বুদ্ধের অবতার ("জীবন্ত বুদ্ধ") বলে পরিগণিত। সঙ্গে সঙ্গে দেশের পুরুষ সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ছিল মঠের সন্ন্যাসী, যারা সম্পূর্ণ পরশ্রমজীবী এবং প্রায় সকলেই অল্পাধিক অশিক্ষিত। এই ধরনের দুরবস্থা থেকে আর কোনোও দেশ

এত দ্রুতবেগে কোথাও কোনো কালে এগিয়ে যেতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

মোঙ্গোলিয়ার প্রথম সার্থক বিপ্লব ঘটে ১৯২১ সালে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তখন ভারতবর্ষের জীবনে জোয়ার এনেছে। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার বিপ্লবের কথা আমরা বিশেষ জানি না, আর কিছু জানলেও তার প্রকৃত মহিমার খোঁজ রাখি না। এই যুগান্তকারী ঘটনার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও আপাতত নেই। শুধু মনে রাখা দরকার—আজকের সোশালিস্ট সমাজ গঠনে ব্যাপৃত মোঙ্গোলিয়াকে বুঝতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। ১৯১৯ সালের শেষ দিকে চীনের চেষ্টা হল মোঙ্গোলিয়াকে পুরোপুরি হস্তগত করা। আবার সোভিয়েত বিপ্লবে রাশিয়া থেকে উৎখাত অভিজাতদের মধ্যে দুঃসাহসী কেউকেউ মোঙ্গোলিয়াতে আস্তানা গড়তে চাইল, জাপানের সাম্রাজ্যলোলুপ শাসকদের সঙ্গে হাত মিলাল। সেই দুর্দিনে দুই তরুণ নেতা, সুহে-বাটর এবং চোইবালসান একজোট হয়ে জনগণের বিপ্লবী পার্টি নাম দিয়ে সংগঠন খাড়া করলেন—আজও মোঙ্গোলিয়ার কমিউনিস্টরা এই ইতিহাসপূত নাম বহন করছেন। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েটের লালফৌজের কাছ থেকে সহায়তা এল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মোঙ্গোলিয়া আর সোভিয়েটের মৈত্রীবন্ধন অটুট। বুদ্ধের অবতার বলে যিনি জনসমাজে নিজেকে পরিচিত করেছিলেন, তাঁকে 'খান্' উপাধি দিয়ে রাজাসনে বসাতে হয়েছিল, কারণ তখনকার পরিস্থিতিতে প্রাচীনের সঙ্গে যোগসূত্র একেবারে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু বিপ্লবের পূর্ণ জয় অল্পকালের মধ্যে অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।

সুহে-বাটর-এর জীবনাবসান ঘটে ১৯২৩ সালে। বিপ্লবের প্রধান নায়ক বলে তিনি কীর্তিত, যদিও রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। সামন্তশাসনের শিরদাঁড়া ভাঙার ব্যবস্থা অবশ্য তাঁর জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হয়েছিল। ১৯২৪ সালের নভেম্বরে মোঙ্গোলিয়ার পার্লামেণ্টে ("হুরাল") বোদগিয়া খান্-এর মৃত্যুর পর নূতন লোকতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয়, সোভিয়েটের সহায়তায় মোঙ্গোলিয়া পুঁজিবাদকে পাশ কাটিয়ে সোশালিজমের লক্ষ্যে হাজির হওয়ার উদ্যোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। এই সংবিধানেরই চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম উপলক্ষে সেদেশে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছিল। নির্বিঘ্নে এই চল্লিশ বৎসর যে কাটে নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার মানুষ

তাদের দিক্‌নির্ণয়ে ভুল করে নি; ১৯৪৫ সাল থেকে সেখানে জনগণতন্ত্র চলছে, সোশালিস্ট সমাজের অভিমুখে সেদেশের অগ্রগতি বহু জটিল সমস্যা সত্ত্বেও অব্যাহত।

নূতন মোঙ্গোলিয়ার সমুজ্জল প্রতীক হল উলান্ বাটর। সেদিন পর্যন্ত যেখানে মধ্যযুগীয় কুয়াসা জমাট হয়ে ছিল, সেখানে আজ নূতন, মুক্ত জীবনের হাওয়া বইছে। হাসপাতাল, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিশুসদন, গ্রন্থাগার, সভাগৃহ, বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র, ছাপাখানা, শিল্পালয়, থিয়েটার—এগুলিই সেখানকার দ্রষ্টব্য। অথচ কিছুকাল আগে পর্যন্ত সেখানে সমাজ ছিল নির্জীব, মানুষ ছিল ঘুমন্ত, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল লামা (বহুক্ষেত্রেই অশিক্ষিত ও অসদাচারী বলে যাদের দুর্নাম) আর মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য বাদে বাকি সবাই ছিল ক্রীতদাসের শামিল, পশুপালন ও আদিম কৃষিকর্মের কঠোর, সংকীর্ণ, ঊষর পরিবেশে যারা জীবন যাপন করত। বিশ্বের হিসাবে যারা ছিল মূক, নতশির "ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী" তারাই আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মানুষের যে সত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যা হল "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ," তারই প্রকাশ যেন সেখানে ঘটেছে।

•

স্বাধীন মোঙ্গোলিয়ার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবনে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটেছে। যাযাবর বৃত্তি আর সামন্ততন্ত্রের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ থেকে তারা এখন সোশালিজমের পথে শুধু পা ফেলা নয়, সোশালিস্ট সমাজই গড়ছে। ১৯৪৮ থেকে তারা পরপর কয়েকটা পরিকল্পনা নিয়ে চলছে—শিল্পবিকাশের শতকরা হার ছিল ১৯৪৮-৫২ সালে ১'৪, যা ১৯৫৩-৫৭ সালে বেড়ে দাঁড়াল ১৩, আর ১৯৫৮-৬০ সালে শতকরা ১৭'৯। পঁচিশ বৎসর আগেকার তুলনায় সেখানকার শিল্পোৎপাদন প্রায় দশগুণ বেড়েছে; আর সমগ্র উৎপাদনের মধ্যে শিল্পের ভাগ এখন প্রায় শতকরা পঞ্চাশ। গ্রামাঞ্চলে সবাই এখন কৃষি সমবায়ে যোগ দিয়েছে; ১৯৫৮ সাল থেকে পতিত জমিতে চাষের আয়োজন হয়েছে বলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পাঁচগুণ বেড়েছে, খাদ্যশস্য ব্যাপারে মোঙ্গোলিয়া আজ আত্মনির্ভর। সেদেশে ৩৩৭টি বড় কৃষিসমবায় আছে, ৩২টি রাষ্ট্রপরিচালিত খামার, আর কৃষির কলকব্জা তৈরী ও মেরামত এবং পশু কল্যাণের ব্যবস্থার জন্য ৪০টি কেন্দ্র রয়েছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্কুল,

ক্লাব, দোকান, সিনেমা, ডাক্তারখানা আর পশুচিকিৎসালয় সংলগ্ন। যে দেশ প্রায় পূর্ণ নিরক্ষর ছিল, সেখানে আজ নিরক্ষরতা একেবারে লোপ পেয়েছে বলা যায়। ১৯৫৪ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল দেড়লক্ষ; তখন সারাদেশের লোকসংখ্যা বোধহয় বারো লক্ষের বেশি ছিল না। উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২১ হাজার ছাত্র পড়ছে। শহরে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্য বিনাবেতনে ও বাধ্যতামূলক ভাবে সাত বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলে এখনও চারবৎসরের বেশি বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রবর্তন সম্ভব হয় নি। সারাদেশে কুড়িটি ছাপাখানা, চল্লিশটি খবরের কাগজ আর কুড়িটি সাময়িকপত্র রয়েছে। দেশের সর্বত্র বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং প্রয়োজন হলে হাসপাতালে রাখার বন্দোবস্ত আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল; তিনি একজন পুরোনো বিপ্লবী এবং চিকিৎসক, বললেন দূর-দূরান্তরে যারা বাস করে তাঁদের জন্যও ব্যবস্থা হয়েছে, যদিও এখনও সব অসুবিধা দূর হয় নি।

১৯৬০ সালের হিসাবে জাতীয় আয় সেখানে ছিল মাথাপিছু ২,৫০০ 'তুগরুগ' যা হল ৬০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ টাকার কিছু বেশি। শীঘ্রই নাকি এই সংখ্যা প্রায় শতকরা ষাট আরও বাড়বে। কিন্তু থাক এ-ধরনের সংখ্যা হাজির করার দরকার নেই—আমরা কি দেখলাম তারই কিছু বিবরণ দেওয়া যাক।

উলান বাটরে সর্ব অঞ্চলে আমরা গিয়েছি—কোথাও বিলাসিতা দেখি নি, কিন্তু দারিদ্র্যের কটু চিহ্নও চোখে পড়ে নি। তার মানে এ নয় যে শহরের বাইরে কিম্বা গ্রামাঞ্চলে লোকে এখন আর তাঁবুতে কিম্বা দুনিয়ার গরীবের যা হল পেটেন্ট সেরকম কুটিরে বাস করে না। পায়খানার ব্যবস্থা যে কোনো কোনো জায়গায় আদিম তা-ও দেখেছি, তবে তাতে কিছু আশ্চর্য বোধ করা অন্তত আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতবড় দেশে যাতায়াত ব্যবস্থা এখনও অনেক উন্নতির অপেক্ষা রাখে, আর লোকসংখ্যা নিতান্ত কম অথচ দেশের আয়তন বিরাট বলে এ-সমস্যার সমাধান কোনক্রমে সহজ নয়। বিশেষ প্রয়োজনে এরোপ্লেনের বেশ নিয়মিত বন্দোবস্ত রয়েছে, কিন্তু সাবেককালের ঘোড়া চড়ে কেউ কেউ এদিক ওদিক যাচ্ছে দেখা গেলেও মোটর গাড়ি বা বাসেই দূরযাত্রা সারতে হয়। গ্রামাঞ্চলের রাস্তা বলতে বোঝায় পাহাড়ের কোল আর তাই বেয়ে ক্রমাগত ওঠা-নামা করতে করতে এই গাড়িগুলি যেভাবে যায় তাতে প্রথমে অবাক হতে হয়, তারপরে মজা লাগে। কোথায়

বসতি তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় পালে পালে গরু, ভেড়া, ছাগল ঘোড়া, 'য়াক,' এমন কি উট চরে বেড়াচ্ছে—মোঙ্গোলিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ হল এই পশুসংখ্যা, পশম হল তাদের সোনা, ঘোড়া তাদের বন্ধু, তাদের সঙ্গী, তাদের কথা ও কাহিনীর এক নায়ক বিশেষ। 'আয়েতানবুলাগ' কৃষিসমবায় ক্ষেত্রে গিয়ে শুনলাম সে এলাকায় বাস করে দু'হাজার লোক, চাষের কাজ কিছু হয় তবে প্রধান সম্পত্তি হল আশীহাজারেরও বেশী গবাদিপশু, যাদের অনেককে দূরবিস্তৃত পাহাড়ী ময়দানে চরে বেড়াতে দেখা গেল। কো-অপারেটিভের কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রথমে আপ্যায়িত করলেন ঘোড়ার দুধ দিয়ে—বিরাট গামলা থেকে বেশবড় চীনামাটির পাত্রে বারবার দুধ ঢেলে দিয়ে অতিথি সৎকার এদের জাতীয় রীতি। আমাদের জিভে এই দুধ একটু বিস্বাদ লাগে, একটু চোলাই করা হয় বলে এই পানীয়ের তারে তেতো আর অম্বল-মেশানো একটা ভাব আছে, কিন্তু অভ্যস্ত হতে পারলে এ-দুধের মতো পুষ্টিকর নাকি কিছু নেই, যক্ষ্মারোগেও এই দুধ বুঝি ঔষধ বিশেষ! যাই হোক, ঘোড়ার দুধ না খেলেও মোঙ্গোলিয়াতে গরু, ছাগল, 'য়াক্' প্রভৃতির দুধ প্রচুর পাওয়া যেত, আমাদের দৈয়ের মতনও জিনিস পেয়েছি। খায় যে তারা ভালো, তার প্রমাণ পেয়েছি সর্বত্র। রুগ্ন গোছের কেউ বড় একটা চোখে পড়ে নি। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই দৈহিক গঠনে দুর্বলতার চিহ্ন নেই, শালপ্রাংশুর সংখ্যা অল্প নয়, আর মেয়েদের চেহারায় দৃঢ়তার সঙ্গে কমনীয়তার মিশ্রণ। সমবায়ের নেতা এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম, রাশিয়ান কেতায় বারবার 'টোস্ট' চলল কিন্তু এশিয়ার মানুষ হিসাবে আমাদের বিশেষ নৈকট্য অনুভব না করে পারা গেল না। আমার কনুই লেগে খানিকটা ঘোড়ার দুধ টেবিলে পড়ে যাওয়ায় কোথায় আমি অপ্রতিভ বোধ করছি, না তাঁরা বলে উঠলেন যে অতিথির হাতে দুধ পড়ে যাওয়া নাকি মস্ত একটা সুলক্ষণ! টেবিলে যারা বসেছিলাম তাদের কার ছেলেমেয়ে কটি, এ-খবর সবাইকে জানানো হল (এদিক থেকে রাশিয়ানরাও আমাদেরই মতো)—তারপর তাদের স্কুলবাড়ি আর লাইব্রেরি আর দোকান আর সিনেমাঘর ইত্যাদি দেখিয়ে পরম আত্মীয়ের মতো বিদায় নেওয়া হল।

আমরা কিছুকাল কাটালাম "তেরেলগে" বলে এক বিশ্রামকেন্দ্রে। এটা হয় একেবারে গ্রামাঞ্চলে, তবে জায়গাটা ভারি সুন্দর। চারদিকে কিছুটা শিলং অঞ্চলের মতো পাহাড়, তবে ক্রমাগত বাঁকে ভরা, আর যে বাঁকটা

একটু চওড়া তা দিয়ে খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে, পাথরে আর নুড়িতে মাঝে মাঝে তার প্রবাহকে আটকাচ্ছে, ঘুরিয়ে দিচ্ছে, আর জল তো কলশব্দ করে চলেইছে। এমনি জায়গায় এই বিশ্রামনিবাস বানানো হয়েছে, যাতে পালা করে দেশের স্ত্রীপুরুষ এখানে এসে স্বাস্থ্য ও মনের স্ফূর্তি সঞ্চয় করতে পারে। আমাদের থাকার বন্দোবস্ত ছিল নিখুঁত। বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত আরও কিছু ব্যক্তি সেখানে ছিলেন। অবশ্য অধিকাংশ মোঙ্গোলিয়ানদের বাসব্যবস্থা আমাদের মতো উচ্চস্তরের ছিল না; সকলের জন্য আলদা ঘর এবং সংলগ্ন স্নানাগার দেওয়া সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু একই সঙ্গে প্রায় তিনশো লোক সেখানে ছিলাম, খাওয়ার সময়, খেলা বা ব্যায়ামের জায়গায়, বেড়াতে গিয়ে কিম্বা প্রতি রাত্রে সিনেমা কি নৃত্যগীত কি অন্য কোন প্রমোদব্যবস্থা উপলক্ষে পরস্পরকে লক্ষ করা যেত, মাঝে মাঝে আলাপও হত। তাদের দেখেছি স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল, নিজের দেশসম্বন্ধে তাদের গর্ব অনুভব করতে পেরেছি, সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী ভূমিকা সম্বন্ধে তাদের অনেকে বেশ সজাগ। সোভিয়েটের সঙ্গে বহুদিনের মৈত্রী ও সহযোগিতার কল্যাণে রুশভাষা সেখানকার শিক্ষিতেরা প্রায় সকলেই জানে—নানাদিকে জীবনধারায় ইয়োরোপের প্রভাবও তারা অনেকটা গ্রহণ করেছে (এটা বোধহয় বর্তমান যুগের শিল্পবিকাশেরই আনুষঙ্গিক, তা আমরা অনেকে পছন্দ করি বা না করি)! মোঙ্গোলিয়ার সৌভাগ্য যে তার বিড়ম্বিত অতীতেও কখনও নারীজাতি নিছক পুরুষের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয় নি—বোধহয় তাই স্ত্রীপুরুষে ব্যবহারে অস্বস্তি ও জড়তা দেখলাম না। বেশ আনন্দেই আমরা এই বিশ্রাম নিবাসে কদিন কাটিয়েছি, আর লক্ষ করে সুখী হয়েছি যে উঠানে এবং পাহাড়ের গায়ে স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন ছিল যার বিষয়বস্তু ছিল মোঙ্গোলিয়ার পশুসম্পদ কিম্বা শ্রম ও যৌবনের কল্পিত রূপ, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। মোঙ্গোলিয়ার অন্যত্রও লক্ষ করা গেল যে তাদের চিত্রশিল্পীরা প্রধানত স্বদেশের নিসর্গ দৃশ্যকেই রূপায়িত করেছেন।

উলান বাটরে এবং অন্যত্র দেখেছি কারখানার সংলগ্ন শিশুসদন—মা যখন কর্মব্যস্ত, তখন শিশুদের সেখানে রেখে নিশ্চিন্ত। শিশুর হাসির কাছে দুনিয়ার সব সৌন্দর্য-ই তো পরাজিত। সোশালিস্ট দেশগুলির অনেক দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু শিশু-কল্যাণ ব্যাপারে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ মোঙ্গোলিয়াতেও আমাদের মুগ্ধ করেছে—আমাদের মতো গরীব দেশ থেকে

যারা যাই, তাদের কাছে এই একবস্তুর জন্যই সোশালিজম মন ভরে দেওয়ার শক্তি রাখে। বারো তেরো লক্ষ যে দেশের জনসংখ্যা, সেখানে এ-ধরনের আয়োজন বড় কম কথা নয়। মেহনতী মানুষ প্রায় সকলেই যে মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের খরচে স্বাস্থ্যনিবাস বা বিশ্রামকেন্দ্রে থাকতে পারে, এ তো মোঙ্গোলিয়ার মতো দেশের পক্ষে কম কৃতিত্ব নয়। আমরা কোথায়, একবার তা ভাবলে এই কৃতিত্বের নিরূপণ সম্ভব হতে পারে। আর আমরা কোথায় পড়ে আছি তা বেশ মনে লাগে যখন মোঙ্গোলিয়ার থিয়েটার বা অপেরায় গিয়ে দেখি যে বাস্তবিকই যারা পরিশ্রম করে, সেই স্ত্রীপুরুষ সারাদিন খাটাখাটির পর অন্তর দিয়ে চাইছে এবং পাচ্ছে সেই রস যা কেবল শিল্পের মধুচক্র থেকেই মিলে থাকে।

১৯৪২ সালেও উলান বাটর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৫, আর বিষয়বিভাগও ছিল অল্প কয়েকটি। আজ সেখানে কয়েক হাজার ছাত্র এবং নানা বিষয়ে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা। বিজ্ঞান আকাদেমির গ্রন্থাগার দেখলাম —বৌদ্ধযুগের পুঁথি, আর ছবি আর মালা ইত্যাদির যে-সংগ্রহ সেখানে, তার সমকক্ষ পৃথিবীতে অল্পই আছে। আমাদের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে গিয়েছেন, আর গিয়েছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য স্বর্গত ডক্টর রঘুবীর। যিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মোঙ্গোলিয়ার অজস্র মূল্যবান জিনিস নিয়ে এসে সরকারী জিম্মায় সেগুলি দেন নি, নিজস্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রেখে দেন। (তৎপুত্র ডক্টর লোকেশচন্দ্র এখন তার জিম্মাদার)। হয়তো দিন আসবে যখন ভারত ও মোঙ্গোলিয়ার সুপ্রাচীন সম্পর্ক সম্বন্ধে সহজে বহু তথ্য আহৃত হবে, বর্তমান যুগে আমাদের মৈত্রী আরও সুগঠিত ও সুষ্ঠু-রূপে দেখা দেবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মোঙ্গোলিয়া ইউনাইটেড নেশনসের সভ্যপদ পায় নি; অনেক লড়াই করে (সুখের বিষয় ভারত সর্বদা মোঙ্গোলিয়ার পক্ষে থেকেছে) ১৯৫৯ সালে তারা সভ্যপদ পায়। আমরা যখন ছিলাম, তখন উলান বাটরে ইউনাইটেড নেশনের পক্ষ থেকে নারীদের অধিকার সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা বসেছিল। যে-হলে সভা বসে, সেটি সুন্দর। আয়োজনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। একই সঙ্গে নানা ভাষায় অনুবাদ নিখুঁতভাবে হল। ভারতবর্ষ থেকে শ্রীমতী লক্ষ্মীমেনন্ সভায় ছিলেন। আর দেখে বড় ভালো লাগল যে সভা পরিচালনা করলেন এক মোঙ্গোলিয়ান

মহিলা। শুনলাম তিনি খ্যাতিমতী লেখিকা, বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন বহুদিন। মোঙ্গোলিয়ার ঝলমলে আনুষ্ঠানিক পোশাকে এই সৌম্যদর্শনার প্রসন্ন, আত্মবিশ্বাসদীপ্ত আচরণে যেন স্বদেশের মর্যাদা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

ফেরার সময় যখন নিকট হচ্ছে, তখন একদিন আমাদের বন্ধু, মোঙ্গোলিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শাগদরসুরেন (ইনি ভারতে মোঙ্গোলিয়ার প্রথম রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন) তখনও আমরা কোনো বৌদ্ধমঠ দেখি নি জানতে পেরে তার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই মঠগুলিতে আগে মোঙ্গোলিয়ার যুবশক্তির বৃহদংশের জীবন্ত সমাধি ঘটত; সুতরাং আজকের মোঙ্গোলিয়াতে এদের সম্বন্ধে উৎসাহিত বোধ করার মতো বড় কেউ নেই। উলান বাটরে একটি প্যাগোডা অনেকদিন হল মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসীরা নিপীড়িত অবস্থায় থাকেন না, মোঙ্গোলিয়ান বৌদ্ধদের নিজস্ব সংস্থা রয়েছে, শান্তি আন্দোলনের একজন নেতা হলেন প্রধান লামা। তা ছাড়া এর্দজেন্‌ৎসু-র মতো জায়গায় বহু প্রাচীন মঠ সাগ্রহে রক্ষিত অবস্থায় আছে। আমরা গেলাম উলান বাটরেই প্রধান মঠে—দেখলাম সংস্কৃত অক্ষরে প্রবেশপথে লেখা রয়েছে, 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' (যে মন্ত্র ছিল ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত থেকে মোঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধ বিশ্বাসীদের ছাড়পত্র বিশেষ), আরও দেখলাম সযত্নরক্ষিত পুঁথি আর মূর্তি আর ছবি আর মণিমাণিক্য। "নমো তস্‌সো ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌ সো" আউড়ে প্রধান পুরোহিতকে পুলকিত করলাম, গৌতম বুদ্ধের কর্মভূমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি বলে সাদরে অভ্যর্থিত হলাম, যথারীতি অশ্বদুগ্ধ পাত্র সামনে এল, বিদায়ের সময় রেশমের ছোট্ট চাদর হাতে পেলাম। আমরা যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, তখন একটা ছোটখাট ভিড় সঙ্গে আসার চেষ্টা করছিল, তবে দেখা গেল তাঁরা প্রায় সবাই বৃদ্ধ বৃদ্ধা, আর সঙ্গে কিছু শিশু। মঠপ্রাঙ্গণে যুবাবয়সী বড় কাউকে দেখা গেল না, যদিও দুই একজন লামা বয়সে তরুণ মনে হল।

প্যাগোডার বৃহত্তম প্রকোষ্ঠে বুদ্ধমূর্তি এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবিধ উপাস্যের প্রতিকৃতির সামনে উপবিষ্ট বহু লামা একত্র মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন. আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেও নিরাসক্তভাবে তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে নিজ কর্তব্য করতে থাকলেন, মাঝে মাঝে শুধু শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি নয়, শুনলাম তূর্যধ্বনি ও ঢক্কানিনাদ—চারদিক চকিত হয়ে উঠল, বৃদ্ধবৃদ্ধা ভক্তের দল যুক্তকরে

দাঁড়ালেন, আমাদের উপস্থিতিতে মনোযোগ বিপথে গেলেও ভক্তিভরে সবাই বুদ্ধমূর্তির দিকে তাকালেন। ধূপের গন্ধে ধূমাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠ আমোদিত, অত্যুচ্চগ্রামে হলেও গুরুগম্ভীর মন্ত্রধ্বনিতে পরিবেশ প্রাণবন্ত. আর ভক্তজন মুখে যেন কিসেব অব্যক্ত প্রত্যাশা—যুগ যুগ ধবে যে অপার্থিব বিস্ময় সৃষ্টি করতে চেয়েছে ধর্মানুষ্ঠানের মাদকতা, তার অল্পস্পর্শ পেলাম।

মোঙ্গোলিয়ার জনগণরাজ্যে গিয়ে অপর যে বিস্ময় দেখে এসেছি, একান্ত পার্থিব বিস্ময় হলেও কিন্তু তার মোহ কাটাতে পারব না। এ-বিস্ময় সৃষ্টি করেছে সেখানকার মানুষ, তাদের শ্রম, তাদের বিপ্লব, তাদের চারিত্র্য, তাদের দার্ঢ্য, তাদের অসমসাহস কর্মযোগ। এ-বিস্ময়ের সঙ্গে অলৌকিক কোনো লীলার সম্পর্ক মাত্র নেই, মন্ত্র মাহাত্ম্যের সম্মোহনজাল থেকে এ মুক্ত। তাই মোঙ্গোলিয়া গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসও বোধ করেছি। সেদেশের বিপুল ব্যাপ্তিতে উদাসীন, অপ্রগলভ, অক্লিষ্ট, অক্লান্ত শুদ্ধতা একদা ধর্মের ইন্দ্রজালকে আহ্বান করে এনেছিল, আর আজ সেখানেই শোনা গেছে মানুষের জয়গান, যে-মানুষের কাছে জীবনই যথেষ্ট প্রেরণা। আমরাও চলব জীবনের যাত্রাপথে, স্মরণ করব 'ঐতরেও ব্রাহ্মণ'-এর অজয় বিধান, 'চরৈবেতি' চরৈবেতি'—"চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠজন হলেও ক্রমে নীচ হতে থাকে ; অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।"

জওয়াহরলালজী নেহরু

বুদ্ধ পূর্ণিমার রাত ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জওয়াহরলালজী নেহরুর হৃদ্‌যন্ত্র জানিয়ে দিয়েছিল যে তার মেয়াদ বোধ হয় ফুরিয়ে আসছে। অনেক দিনের অনেক ধাক্কা সাম্‌লে-আসা এই যন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না। এই তো অতি সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিমুখে বলেছিলেন যে তাঁর জীবন চট্‌ করে শেষ হতে যাচ্ছে না! যখন চার মাস আগে ভুবনেশ্বরে জওয়াহরলাল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন থেকে সারা দেশ আশা আর আশঙ্কা নিয়ে উৎকণ্ঠিত ছিল। অবাধ্য নিয়তি সে-অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে।

আগের রাতে কাকে যেন বলেছিলেন যে সরকারী 'ফাইল্‌' দেখার কাজ তিনি শেষ করে রাখলেন। ভোরে উঠে বুকের যন্ত্রণা আর সর্বদেহে অস্বস্তিকে অগ্রাহ্য করে তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরেছিলেন, দৈনন্দিন দাড়ি কামানো থেকে বিরত হন নি। বয়সের বোঝা আর অপরিসীম কাজের চাপ কোনও দিন তাঁর আচারে ব্যবহারে আকৃতিতে অযত্ন আর শৈথিল্যের ছাপ রাখতে পারে নি। জীবনের শেষদিনেও স্বভাবের এই রীতি থেকে তাই তিনি বিচ্যুত হন নি। চিরদিনই তিনি চেয়েছিলেন যে মৃত্যু যেন আচমকা আসে। রোগ-শয্যায় অসহায় হয়ে শুয়ে থাকার কথা ভাবলে তিনি শিউরে উঠতেন—কিন্তু যমরাজের তলব তাঁকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকড়াও করবে, এ-জিনিস তিনি চান নি। মরণকে নিজের দুয়ারে দেখেও তাই দিনের কাজের জন্য তৈরি হতে তিনি ভোলেন নি। জওয়াহরলালের শিল্পীমন নিজের সম্বন্ধে গালভরা বিশেষণ শুনলে যে কুণ্ঠিত হত তা জানি। 'কর্মবীর' তাঁকে বলা নিশ্চয়ই যায় কিন্তু আজ না হয় ঐ ধরনের বাক্য ব্যবহার না-ই করা গেল। শুধু বলা যাক যে কাজ ছিল যার প্রাণ, কাজ ছিল যার একমাত্র উপাসনা, কাজ ছিল যার মর্মের অনুভূতির নিরন্তর তৃপ্তিহীন প্রকাশ, কাজে বাধা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চৈতন্য লুপ্ত হল, রোদে ধোওয়া আলোয় ফুলের হাসিও তার ঘুম ভাঙাতে পারল না।

সত্যই ইন্দ্রপাত হয়ে গেল আমাদের মধ্যে—কিন্তু যার তিরোধানে সারা দেশ আজ এত ব্যথিত, তিনি দেবরাজ ছিলেন না। দেবোচিত বহু গুণের অধিকারী হলেও তিনি ছিলেন নিছক মানুষ, অশান্ত, অস্থির, সদাজিজ্ঞাসু, প্রখর, প্রকৃত মানুষ। সর্বরিপুদমনের অতিমানুষিকতা কোনও দিন তাঁকে প্রলুব্ধ করে নি—জীবনের শেষ অধ্যায়ে দেখা গেছে সৌম্য, সংযত আত্ম-সংহৃতির প্রয়াসে তিনি বহুলাংশে সফল হয়েছেন, কিন্তু ইচ্ছা করেছে দেখতে সেই পূর্বাভ্যস্ত রূপ, যখন তাঁর মনের বিচিত্র ইন্দ্রধনু থেকে ক্ষিপ্র, তীব্র শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে, লক্ষ্যভেদ না ঘটলেও বায়ুমণ্ডল বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে, "শুধু দিনযাপনের গ্লানি" থেকে নিস্তারের পথ যেন দেখা গেছে, ক্লেদ আর ক্ষুদ্রতা যে রাজনীতিপথে অকাট্য নয় তা বোঝা গেছে।

অনধিকারী হয়েও বলতে ইচ্ছা করে যে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব প্রশান্তির আস্বাদ পাওয়া যেত, কোন্ জাদুবলে অশান্তির অন্তর্নিহিত সুমহান্ শান্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মনে হত। জওয়াহরলালজীর সান্নিধ্যে অনুভূতি আসত ভিন্ন প্রকৃতির। গান্ধীজীর হাস্য-মণ্ডিত মুখ আর অতি স্বচ্ছ আলাপ তাঁর মানবিকতার প্রোজ্জ্বল সাক্ষ্য হলেও মনে হত যে তিনি যেন অন্য গ্রহবাসী, যে জগতে আমাদের বিচরণ তা থেকে অন্যত্র তাঁর অধিষ্ঠান। এই দূরত্ববোধ জওয়াহরলালের কাছে বসলে মনে জায়গা পেত না। সন্দেহ নেই যে তাঁর অনন্য মহত্ত্ব সান্নিধ্যে এসে অনুভব করতেই হত। কিন্তু একান্ত একাকী এই ব্যক্তিকে একেবারে আত্মীয় মনে করতে বিলম্ব ঘটত না, প্রায় সমান স্তরে কথা বলার ধৃষ্টতা সংগ্রহ করতে কোনো ক্লেশ বা অস্বস্তি বোধ হত না। জন্মে, শিক্ষাদীক্ষায়, জীবনপদ্ধতিতে অভিজাত হয়েও জওয়াহরলাল এদেশে সর্বজনের প্রিয়বান্ধব যে হতে পেরেছিলেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর চরিত্রে, তাঁর অনায়াস অমায়িকতায়, নির্বিশেষে অপরের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পোষণের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতিতে।

ভারতবর্ষের অধুনাতন ইতিহাসে চারিত্র্যের এই আবির্ভাবকে সমুজ্জ্বল ঘটনা বললে অত্যুক্তি হবে না। একে একটু বিস্ময়করও বলা যায়, কারণ প্রথম জীবনে জওয়াহরলাল প্রতিভা কিম্বা অসামান্যতার তেমন কোনো আভাস দেন নি। ধনী বংশে জন্ম, বিলাসে লালন, বিদেশে শিক্ষা,—উপসংহারে অর্থোপার্জন ও সাংসারিক সাফল্যে পর্যবসন অসঙ্গত ছিল না। পরাধীন দেশে জন্মেও

রাজনীতি ব্যাপারে তরুণ বয়সে তাঁর অনীহার অন্ত ছিল না। মদনলাল ধিংড়া লণ্ডন শহরে প্রকাশ্য সভায় ভারত শাসনে কুখ্যাত ইংরেজ রাজপুরুষকে হত্যা করে স্বাধীনতার জয়গান করতে চেয়েছিলেন, তখন জওয়াহরলাল তাঁর সাহসে মুগ্ধ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর আবেগ গভীরভাবে উদ্রিক্ত হয় নি। বিপিনচন্দ্র পালের মতো ব্যক্তিকে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে অতি উচ্চ স্বরে দেশের দুর্দশার কথা বলতে শুনে তাঁর মার্জিত রুচিতেই আঘাত লাগে, বিখ্যাত দেশনেতার বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়েছিল। দেশে ফিরে আদালতে 'প্র্যাক্‌টিস্' করতে যাওয়া, মাঝে মাঝে ক্লাবে গিয়ে গল্পগুজব করা, মোটের উপর সৎভাবে সমাজের উপরতলার জীবন নির্বাহ করা—এবং বাইরে খুব বেশি চিন্তা তখন তিনি করতে চান নি। কিন্তু আগ্নেয়গিরির মতো তাঁর মনের গভীরে একটা মস্ত বড় আলোড়ন নিশ্চয়ই তৈরি হচ্ছিল। আর যখন দেশের জীবনে গান্ধীজীর আবির্ভাব হল, মোতিলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি যখন বিলাসব্যসন ও উগ্র রাজনীতির প্রতি বীতরাগ ভাব ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে নামলেন, তখন যেন জওয়াহরলাল প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ করলেন। নতুন পশ্চাৎপট নিয়ে ভারতবর্ষের যে নতুন পরিবেশ আর নূতন জীবন সৃষ্টি তখন হতে চলেছিল, সেই জীবনে যেন তাঁর দ্বিতীয় জন্ম ঘটল।

জওয়াহরলাল নিজে বলে গেছেন তাঁর জীবনে তিনজন ব্যক্তির প্রভাব কত বেশি ছিল। পিতা মোতিলাল ছিলেন তেজস্বী, অপরিসীম পুত্রস্নেহ সত্ত্বেও পুত্রের সঙ্গে মতবিরোধ তাঁর বারবার ঘটেছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উভয়ে ছিলেন যেন উভয়ের সচিব এবং সখা। গান্ধীজীর ইন্দ্রজালে জওয়াহরলাল জড়িয়ে পড়েছিলেন। স্বভাবের প্রচণ্ড পার্থক্য এবং বহু বিষয়ে বিচারভেদ তাঁদের মধ্যে সহজে ধরা পড়ে, কিন্তু গান্ধীজীর তুলনাহীনতার মায়া কাটিয়ে ওঠা জওয়াহরলালের সাধ্য কিম্বা সাধ কখনও হয় নি। জওয়াহরলালের মানসিকতার একটা বৃহৎ অংশ ছিল শিল্পী—তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অন্ত ছিল না, মনের গঠনে ও সংবেদনশীলতায় তাঁদের মধ্যে মিল ছিল প্রভূত। কিন্তু জওয়াহরলাল ছিলেন গান্ধীজীর ছকে না হলেও গান্ধীজীর হাতে গড়া। বোধ হয় বলা যায় যে স্বদেশের চেয়ে বিদেশের সঙ্গে যোগ যার কিশোরকাল থেকে ছিল সমধিক, সে যেন চিরন্তন ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতীকরূপে আবিষ্কার করল গান্ধীজীকে, আর তার পর থেকে মতভেদ

আর আশাভঙ্গ-জনিত বিস্ময় ও বিরক্তি সত্ত্বেও তাঁকেই অবিচল আলোকবর্তিকা বলে গ্রহণ করল। এই আবিষ্কার ও দীক্ষাতেই বুঝি জওয়াহরলালের জীবনের কেন্দ্রবস্তু বলা চলে।

আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন নিজ বাসভূমে পরবাসী অনুভূতির কথা—"কোথাও যেন আমার ঘর নেই, সর্বত্রই আমি খাপছাড়া।" ১৯২০-২১ সালে বাস্তবিকই দেখা গেছল গান্ধীজীর জাদুকরী। জওয়াহরলালের মধ্যে যে মহিমা সুপ্ত হয়েছিল, কোথা থেকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে তিনি জাগিয়ে তুললেন। সমসাময়িক ভারত ইতিহাসে এ হল একটা বড় দরের ঘটনা।

তখন থেকে জওয়াহরলালের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তারই শেষ দেখলাম সেদিন। আমাদের ইতিহাসের একটা গর্ব করার মতো অধ্যায় যেন তাঁর নশ্বর দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে গেল।

গান্ধীর সবচেয়ে একনিষ্ঠ ভক্ত হয়েও জওয়াহরলাল কখনও বহু গান্ধী-শিষ্যের মতো কেবল গান্ধীবাক্যের প্রতিবিধান করতে চান্ নি, পারেন নি। তাঁর এমন ক্ষমতা বা ইচ্ছাও কখনও হয় নি যে গান্ধীর পথ পরিহার করে নিজের বুদ্ধি ও বিচার যা বলে তদনুযায়ী চলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধী যে সিদ্ধান্ত করেছেন তারই সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য না ঘটিয়ে তিনি পারেন নি—গান্ধীও ঐ সামঞ্জস্য সাধনে সহায়তা করে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও কর্মপন্থার জালে জওয়াহরলালকে বহুবার বেঁধেছেন। কিন্তু দেশের মানুষের অবস্থা আর দুনিয়া জুড়ে সমাজ বিবর্তনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা বুঝে ভারতবর্ষের বাস্তব ক্ষেত্রে নতুন পথের প্রবর্তন সম্বন্ধে জওয়াহরলালের অবদান কখনও ভুলতে পারা যাবে না। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধী লিখেছিলেন তাঁকে: "তুমি যেমন্ ভাবো তেমনই ধনী আর শিক্ষিত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে আন্দোলন আমাদের করতে হবে—কিন্তু তার সময় এখনও আসে নি।" গান্ধীজীর হিসাবে তার সময় কখনও এল না, আর জওয়াহরলালের হিসাবে সময় এল আর চলে গেল, তার সদ্ব্যবহার সম্ভব হল না। ফল অবশ্য এক, কিন্তু জওয়াহরলালের চিন্তা আর কর্মের সঙ্গে আমাদের এই মান্ধাতাগন্ধী দেশের এগিয়ে চলার যে সম্পর্ক রয়েছে, তাকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই।

অনলস আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে জওয়াহরলাল গতিশীল জীবনের কথা সর্বদা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মনে পড়ে যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের

কথা—যে-ঐতরেয় শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত ঋষিপুত্র মহীদাসের রচনা বলে খ্যাত, যে-ঐতরেয় গ্রন্থ পাঠ বিনা বেদজ্ঞান নাকি সম্ভব নয়, যার শিক্ষা এসেছিল স্বয়ং মাতা বসুন্ধরার কাছ থেকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে, রাজপুত্র রোহিত পথশ্রান্ত হয়ে ঘরে চলেছেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাঁকে বার বার পাঁচবার নানা ভাবে বললেন, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—চরৈবতি, চরৈবতি। "চলাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়ে নি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।"

এগিয়ে চলবার এর চেয়ে প্রদীপ্ত বাণী আর কোথাও আছে কি? একেই মূলমন্ত্র করেছিলেন জওয়াহরলাল—জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করে এগিয়ে চলো, কুসংস্কার বর্জন করে এগিয়ে চলো, স্বার্থসন্ধতাকে পরিহার করে এগিয়ে চলো, যাতে সর্বজন সুখী হয় সেই প্রচেষ্টার পথে এগিয়ে চলো। এ-কথাই তাঁর জীবন দিয়ে জওয়াহরলাল বলে গেছেন। তাঁর অশান্ত, অশ্রান্ত জীবন-কথার এই তো মর্মবাণী।

জওয়াহরলালের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি কথা না বললে চলবে না। বিপ্লবী বলতে প্রকৃত প্রস্তাবে যা বোঝায়, তা তিনি ছিলেন না—এজন্য কোনো কোনো পরিস্থিতিতে তিনি বিপ্লবীদের চক্ষুশূল হয়েছেন আর তা অহেতুকও ছিল না। কিন্তু কেমন করে ভোলা যায় যে তাঁর ধারণায় অসঙ্গতি ও দুর্বলতা থাকলেও ১৯২৭ সাল থেকে এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন সর্বোপরি তিনি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভুলভ্রান্তি তাঁর বহু ঘটেছে, কিন্তু মনের প্রকৃত প্রসার আর হৃদয়ের দরদ নিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের দিকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। করাচী কংগ্রেসে (১৯৩২) মৌলিক অধিকারের যে সনন্দ তিনি পেশ করেন, তাতে ফাঁক এবং ফাঁকি ছিল যথেষ্ট, কিন্তু বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তার তদানীন্তন মূল্য একেবারেই অল্প ছিল না। "Whither India?" আখ্যা দিয়ে যে প্রবন্ধগুলি তিনি প্রকাশ করেন, এদেশে সোশালিজমের প্রসারে তার অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না করলে অপরাধ হবে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) সভাপতিরূপে তাঁর অভিভাষণে সোশালিজম্ এবং সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য যে আজও মহামূল্য তা স্বীকার না করে উপায় নেই। মনে আছে ১৯৩৬ সালে

এলাহাবাদে আনন্দভবনে ছোট এক সভায় স্বাধীনতা এবং সোশালিজম্‌ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে দুটো লাড্ডু রয়েছে একটা খেয়ে তার পর অন্যটা খেতে যাব, এমন ব্যাপার নয়—দুটো লাড্ডুই যাতে খেতে পাবার সম্ভাবনা ঘটে, তাই হল কাজ। এর চেয়ে সহজে ও স্পষ্টভাবে স্বাধীনতা আর সোশালিজমের লড়াই সম্বন্ধে কথা বলা যায় বলে জানি না। তাঁর নায়কত্বায় সম্প্রতি কংগ্রেস সোশালিজমকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে—এই ঘোষণাকে শঠতা বলা সহজ, কিন্তু তা বললেই কাজ শেষ হয় না, এবং এমন ঘোষণা ঘটারও একটা বৃহৎ মূল্য রয়েছে, যাকে অগ্রাহ্য বা বিদ্রূপ করা হল ভ্রান্তি। বাস্তবিকই মনে হয় যে স্তালিনের মৃত্যুর পর সবচেয়ে দামী কথা যে জওয়াহরলাল বলেছিলেন, তার একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে।

জওয়াহরলালকে কোথায় যেন ভারতপথিক বলে বর্ণিত হতে দেখেছি। মহাত্মা কবীরের শিক্ষাকেও 'ভারতপন্থ' বলা হয়েছে—হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার তিনি ছিলেন প্রতীক, আর সে-সাধনা ছিল সচল, জীবননির্ভর, অচলায়তনের প্রতিপন্থী। "বহতা পানী নিরমলা বন্ধা গন্দা হোয়',—যে জল বয়ে চলেছে তা হল নির্মল, বদ্ধ জলই হয়ে ওঠে দূষিত, দুর্গন্ধ। তখনকার জীবনে দুঃখ-দুর্গতি লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না—সেখানে সাধক বলেছিলেন "আঠ পহর কা যুঝনা বিন্‌-খাণ্ডে সংগ্রাম।" অষ্টপ্রহর এই যুদ্ধ চলেছে, বিনা খড়্গের এই সংগ্রাম। ভারতবর্ষের চিরন্তন এ-সব কথা বর্তমান যুগে যাঁরা নতুন করে ভেবেছেন, জওয়াহরলালের স্থান সেই সৎসঙ্গে। কবীর বলেছিলেন: ধরণী আকাশে চলেছে থরহরি, সকল শূন্য ভরে চলেছে গর্জন, তারই মধ্যে মৈত্রী ও সমন্বয়ের বাণী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ভিন্ন পরিস্থিতিতে, সামাজিক সম্ভাবনা যখন ভিন্ন প্রকৃতির তখন আজকের মহাত্মাদের যুগসম্মত চিন্তাকে প্রকাশ করতে হবে। জওয়াহরলাল সেই চেষ্টা করেছেন, আর ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এমন ভাবে করেছেন যে মানুষ মনে রাখবে শতাব্দী ধরে তাঁর মমতা, তাঁর মনের করুণা, তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি আর পরদুঃখকাতর মহত্ত্ব—যে-গুণাবলীর মূল্য বিপ্লবের নামে যেন হ্রাস করে দেখার প্রবৃত্তি আমাদের না হয়।

প্রায় অর্ধজগৎ আজ মার্কস্‌-কথিত সুসমাচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজবাদকে গ্রহণ করেছে, সাম্যবাদের পথে পদক্ষেপের প্রচেষ্টায় নেমেছে। দুটো বিরাট বিশ্বযুদ্ধ গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঘটেছে, রুশ সাম্রাজ্যে আর মহাচীনে

সাম্যবাদী নেতৃত্বে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, মধ্য ইয়োরোপ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরতট পর্যন্ত সমাজবাদী শাসন স্থাপিত হয়েছে, সাম্রাজ্যের শৃংখল ভেঙে এশিয়া আফ্রিকা লাতিন-আমেরিকার বহু দেশ স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে, সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা বিনা সার্থক স্বাধীনতা যে অসম্ভব তা হৃদয়ঙ্গম করে যথাসাধ্য সোশালিজমের দিকে এগিয়ে চলার কঠিন প্রয়াসে নেমেছে। এমনই যুগান্তরকারী পরিবর্তন আজকের দুনিয়াতে এসেছে বলেই সাম্যবাদী অভিযানের পূর্বতন স্তরে চিন্তা ও কর্মে যে একাগ্র, এমন কি প্রয়োজন হলে নির্মম, কঠোরতা সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল, তাকে অনড়, অটল, অপরিবর্তনীয় মনে করারও বুঝি প্রকৃত কারণ নেই। এ-প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান অন্যত্র, কিন্তু জওয়াহরলাল নেহরুর মতো মানুষ সম্বন্ধে মনে হয় যে এঁরা বিপ্লবের যে মূল্য ইতিহাস বার বার নিয়েছে তা দেখে বিপ্লবপথ সম্বন্ধেই কুণ্ঠা বোধ করেছেন—সমাজের সনাতনী শোষণব্যবস্থাকে ডিইয়ে রাখতে যে সমাজকে অপরিসীম গ্লানি ও বেদনা সহ্য করতে হয়, তা মেনে এবং বুঝেও বিপ্লবের মূল্য দিতে সংকুচিত হয়েছেন, বিপ্লবের চরিত্রকে পরিবর্তিত করতেও তাই চেয়েছেন। একশো বছর কিম্বা আরও আগে আকাশচারী সাম্যবাদী যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও কল্পনা করতেন যুক্তি এবং হৃদয়বত্তার কষ্টিপাথরে যাচাই করে মানুষ সাম্যবাদকে বিনা সংঘর্ষে গ্রহণ করবে। তাঁদের সে-কল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল; কার্ল্ মার্কস্ এই গগনবিহারী কল্পনাকে তাই ধিক্কৃত করেছিলেন। কিন্তু ধিক্কার দিলেও 'ইউটোপিয়ান্' মনীষীদের অবদানকে সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাতে তিনি সংকোচ বোধ করেন নি। আজকের পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিবেশে জওয়াহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি কিছু পরিমাণে ইউটোপিয়ান্দের উত্তরাধিকারী—তবে যে জগতে সোশালিস্ট শক্তিপুঞ্জের বর্তমান প্রভাব এবং জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের ক্ষমতা ও গভীরতা বিপুল, সেখানে বিপ্লবের পূর্বকল্পিত মূর্তির সর্বত্র পুনরাবৃত্তিকে অকাট্য মনে করা চলে না। নানা পথে সমাজবাদে পৌঁছাবার সম্ভাবনার কথা আজ আমরা জানি। জওয়াহরলাল প্রকৃত সমাজবাদ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ চেতনা রাখতেন না, তাঁকে সমাজবাদী বলে ধরে নেওয়া যে ভুল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজবাদকে ভারতীয় পরিস্থিতিতে সহজ, স্বাভাবিক ও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার অনুকূল মানসিকতা ও প্রস্তুতিকে বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠ করতে তাঁর চিন্তা দীপশিখার মতো সমুজ্জ্বল তাঁর বহু বাক্য অবশ্যই সাহায্য করবে।

জওয়াহরলাল ছিলেন যুগন্ধর মানুষ—তাই তাঁর সম্বন্ধে কথার উপর কথা সাজিয়ে যাওয়া সহজ। কথা বড় বেশি বলা হয়ে গেছে দেখে তাই অস্বস্তি আসছে। কী প্রয়োজন এত কথার? তবে বুঝি কথা বলে যেতে থাকলে মনের ভার কিছু কমে, আর হয়তো বা কথার মধ্য দিয়ে কিছু কাজেরও নিশানা মেলে।

১০ই এপ্রিল তারিখে লেখা তাঁর শেষ চিঠি হাতের কাছে রয়েছে। "তোমার বাংলা প্রবন্ধের বইটা পেয়ে সুখী হলাম, কিন্তু আমি তো বাংলা পড়তে পারি না, আমার লাইব্রেরিতে এটা থাকবে। তোমার চিঠি পড়লে আমার খুব ভালো লাগে। আমার শরীর খারাপ মনে করে যখন খুশি লিখতে সংকোচ কর না, তবে আগের মতো অবিলম্বে জবাব দিতে হয়তো পারব না।" কোনো কাজে বিলম্ব তাঁর ধাতে সইত না। তাই বুঝি অস্বাস্থ্যের বোঝাও বেশিদিন বইতে তিনি পারলেন না।

ডক্টর জাকির হোসেন সেদিন এক সভায় বললেন: জওয়াহরলাল ছিলেন "হিন্দোস্তান-কে মেহ্‌বুব্‌", সারা দেশের দুলাল। শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি নয়, এত ভালোবাসা কোথাও কোনো রাজনৈতিক নেতা লক্ষ লক্ষ অচেনা মানুষের কাছ থেকে কখনও পায় নি। নিজের সঙ্গে অপরের ব্যবধান দূর করবার প্রায়-অসম্ভব ক্ষমতা বিনা এমন মহত্ত্ব সম্ভব নয়। চারিত্র্যের এই ঐশ্বর্য জওয়াহরলালের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামে জওয়াহরলালের ভূমিকা ইতিহাসে কীর্তিত হতে থাকবে। স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররূপে দেশগঠন ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাঁর প্রয়াসের বিবরণও ইতিহাস সহজে বিস্মৃত হবে না। কিন্তু নিছক রাজনীতির বিচারে শুধু স্তুতিই তাঁর প্রাপ্য নয়। বহু কঠিন ও কঠোর সমস্যা অপূর্ণ রেখে তিনি চলে গেছেন। অতি-মানবিক শক্তির অধিকারী হয়েও অতি-মানবিক পদ্ধতিতে সেই শক্তি ব্যবহারে তিনি অপারগ ছিলেন। হয়তো এজন্যই তিনি কখনও বিপ্লবী ভূমিকায় নামতে পারেন নি; দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বনেও স্বীকৃত হতে পারেন নি। সংসারে রুচি ও প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্য যতদিন না ঘটে, ততদিনই হয়তো তাঁর মতো ব্যক্তির জীবনে ও কীর্তিতে কিছু পরিমাণে ব্যর্থতা না থেকে পারে না।

এ-সব চিন্তা ছাপিয়ে আজ জওয়াহরলালের তিরোধানে স্বজনবিয়োগব্যথায়

ভারতবর্ষ বিধুর। শিশুর হাসি আর ফুলের ছটা ছিল যার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আসক্তির সঙ্গে নিরাসক্তিকে একসূত্রে বাঁধার শক্তি ছিল যাঁর চরিত্র-মহিমা, সেই মহদাশয় ও একান্ত অনন্য মানুষটি আর নেই। শুধু অমর হয়ে থাকবে তাঁর স্মৃতি এবং তাঁর অজর অভীপ্সা :

সর্বস্তরতু দুর্গানি সর্বো ভদ্রানি পশ্যতু।
সর্বস্তদ্বুদ্ধিমাপ্নোতি সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥

"দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"

চেকোশ্লোভাকিয়াকে উপলক্ষ করে সম্প্রতি যে সব ঘটনা (১৯৬৮) সারা দুনিয়াকে সচকিত করে তুলেছে এবং যার জের মিটতে বেশ কিছু সময় লাগা অবশ্যম্ভাবী, তা প্রখরভাবে মনে পড়িয়ে দেয় লেনিনের এক উক্তি : "বিপ্লবের রাস্তা নিয়েভ্স্কি প্রস্‌পেক্‌টের মতো একটা সোজা সড়ক নয়।" এগিয়ে চলার পথ মাঝে মাঝে আঁকা-বাঁকা না হয়ে পারে না, থেকে থেকে চড়াই-উৎরাই এসে থাকে, আর নানা ধরনের বাধাবিঘ্নের সঙ্গে মোকাবিলা তো করতে হবে-ই। এগিয়ে না চলে উপায়ও নেই, কারণ বিপ্লব একটা স্থাণু বস্তু নয়। লক্ষ্যস্থলে হাজির হলাম আর সকল সমস্যা সন্দেহ সংশয়ের অবসান ঘটে গেল, এমন ধারণা যে একেবারে ভুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চলমান জীবনে এমন কোনো সিদ্ধির মুহূর্ত থাকতে পারে না, যেখানে পৌঁছালেই যেন নির্বাণ লাভ হয়ে যায়, সংসারের সব প্রশ্ন মিটে যায়। ব্যক্তি তার একক অনুধ্যান-বলে তুরীয় রাজ্যে উত্তরণ করতে পারে অবশ্য শোনা যায়। কিন্তু সমাজের বেলায় তা সম্ভব মনে হয় না।

তাই সমাজবাদী বিপ্লবের চলার পথে সম্প্রতি একাধিক ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন মূর্তিতে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছে তাতে অতিরিক্ত বিচলিত হওয়ার হেতু নেই—সমাজবাদ সম্পর্কেই আস্থা হারাবার উপক্রম সমাজবাদী-বলে-পরিচিত যাঁরা অনেকে করছেন, তাঁদের আতিশয্যদুষ্ট বিক্ষোভ ও বিরূপতার বিন্দুমাত্র যুক্তি নেই। গতিশীল জীবনে আলোড়ন ঘটবে না, বিপদ আসবে না, গভীর প্রশ্ন (যার উত্তর সহজ নয়) উঠবে না, ভুলভ্রান্তি দেখা দেবে না, এ তো অস্বাভাবিক ব্যাপার। সমাজবাদ চলমান জীবনের কথাই সর্বদা বলেছে, অচলায়তন সৃষ্টি করতে চায়নি, সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বে, আমাদের এই জঙ্গম জগতেই সুষ্ঠু, সরল, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ সমষ্টি-জীবনের পত্তন করতে চেয়েছে।

শত্রুপক্ষের অবিরাম অভিযানকে পরাজিত করার জন্য সমাজবাদী শিবিরে ঐক্যের গুরুত্ব যে বিরাট তাতে সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে

বিভিন্ন দেশে সমাজবাদ রাষ্ট্রশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দেশকালপাত্র অনুযায়ী বিশিষ্ট নূতন সমস্যারও উদ্ভব হচ্ছে, জাতিবোধ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে নূতন সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজবাদী রাষ্ট্রের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে সক্রিয় চিন্তা ও কার্যক্রমের কথাও আজ তাই কিছুকাল ধরে আমরা শুনছি। বৈচিত্র্যের স্বীকৃতির ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কম্যুনিস্ট তত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ ব্যাপারে নূতন অভিনিবেশের প্রয়োজনও বেশ কিছুকাল থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে। সমাজবাদী অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে প্রথম যুগের অনিবার্য, অতি-সতর্ক নিষ্ঠাপরায়ণতা যে সবদা সমীচীন নয়, এই বোধ বর্তমানে বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সমাজবাদী শৃংখলার অর্ধ-সামরিক কঠোরতা প্রশমিত হতে পেরেছে। এই সব ধারায় সুস্থ বিকাশ যত দ্রুত ঘটতে পারবে, ততই মানুষের ভবিষ্যৎ হবে সমুজ্জ্বল। দুঃখের কথা এই যে, সম্প্রতি চেকোশ্লোভাকিয়া-সম্পর্কিত ঘটনাবলী এই সুস্থ বিকাশের পথে কণ্টক সৃষ্টি করেছে—সমাজবাদের শত্রুরা যা চেয়েছিল তা পায়নি বটে, কিন্তু তাদের সযত্নরচিত চক্রান্তের ফলে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগাতে পেরেছে, বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তত সাময়িকভাবে কক্ষচ্যুত করতে পেরেছে, প্রকৃত মানবমুক্তি সাধনে গরিষ্ঠ প্রকরণ যে সমাজবাদ, এ-বিশ্বাসে আঘাত দিতে পেরেছে।

তা সত্ত্বেও, এবং হয়তো সেজন্যই, উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে হবে, মৃত্যুঞ্জয়ী ভিয়েৎনামের রণক্ষেত্রে যা সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বর্তমান ইতিহাসের সেই জাজ্বল্যমান সত্য : 'সম্পদের শিখরে আরোহণ করেও ধনতন্ত্র আজ দেউলিয়া, তার চরম পরাজয় অকাট্য।' আমরা বাস করছি সমাজবিবর্তনের এক জটিল অথচ চাঞ্চল্যময় যুগে আর অপেক্ষা করছি কবে মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের ফলে জগৎ জুড়ে সংক্রান্তি আসবে, মনু বদলে যাবে, নূতন সংহিতা নিয়ে সমাজ চলতে থাকবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে এই বিবর্তন ঘটবে "একটা গোটা ঐতিহাসিক অধ্যায়" (লেনিন) জুড়ে সময় নিয়ে। যারা আজ চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে এত বেশি বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত যে সোভিয়েট-সমেত সমাজবাদী দেশগুলির ক্রিয়াকলাপে নিন্দনীয় ছাড়া আর কিছু দেখছেন না, তাঁরা আশা করি বুঝবেন যে উপরোক্ত 'ঐতিহাসিক অধ্যায়'-এর পঞ্চম অঙ্ক থেকে আমরা তো এখনও বেশ দূরে আছি। এমন তো মনে করার কথা নয় যে, সমাজবাদের পথে

বিঘ্নবিপদ বড় একটা নেই, আর ইতিমধ্যেই এত সব অদলবদল ঘটেছে যে এক অনতিদূর পুণ্য দিনে সবাই আমরা ঘুম ভাঙার পর দেখব যে শোষণের অবসান জগৎ জুড়ে ঘটে গেছে! এজন্যই তো' 'আকাশচারী' (ইউটোপিয়ন') এবং নৈরাজ্যবাদীরা অমূলক আশার যে কুহক বিস্তার করতেন, তার একান্ত বিরোধিতা করেছিলেন কার্ল মার্কস। এজন্যই স্টালিন একবার বলেছিলেন: 'জয় কখনও আপনা থেকে এসে হাজির হয় না; তাকে হাতে ধরে টেনে আনতে হয়।' মার্কসবাদ তো একথাই বলে যে সমাজবাদে উত্তরণ ঘটবে এক সুদীর্ঘ ও জটিল অধ্যায় অতিক্রম করার ফলে, আর সে-অধ্যায়ে উত্থান-পতন দেখা যাবে, হয়তো বা কয়েক দশক কেটে যাবে প্রকৃত যুগান্তর সংসাধন প্রচেষ্টায়। আমরা কি স্মরণ করব না ১৮৫১ সালে লেখা মার্কস-এর সাবধান-বাণী: 'শ্রমিকদের আমরা বলি: আপনাদের পনেরো, কুড়ি কি পঞ্চাশ বৎসর ধরে অন্তর্যুদ্ধ ও দেশে দেশে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এগোতে হবে, কারণ আপনাদের কাজ শুধু সমাজে পরস্পর-সম্পর্ক বদলে দেওয়া নয়। কাজ হল নিজেদেরও সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেলা, যাতে নূতন সমাজ যথাযথভাবে পরিচালনা করার শক্তি সংগ্রহ সম্ভব হয়।' এই যে প্রচণ্ড ঐতিহাসিক অগ্নিপরীক্ষা, তার অবসান ঘটতে এখনও বিলম্ব আছে বলেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন একদিকে যেমন চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো দেশে তার স্বকীয় সমাজবাদী বিকাশকে অভ্যর্থনা জানাবে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে যাতে স্বকীয়তার সুযুক্তিকে বিকৃত করে তারই ছদ্মবেশে এমন ব্যাপার কিছুতেই না ঘটে যাতে এখনও-অপরাজিত সমাজবাদবিরোধী শক্তিপুঞ্জ সুযোগ ও সহায়তা পেয়ে যায়।

গণতন্ত্রের নামে যে বিরাট বুজ্‌রুকি চলে এসেছে, তাকে মার্কসবাদ জাহির করেছে বটে, কিন্তু মার্কসবাদ কখনও বলতে কুণ্ঠিত নয় যে গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও ধারণার মধ্যে রয়েছে বহু কল্যাণকর উপাদান, এবং শোষণমুক্ত সমসমাজেই তার যথাযথ প্রয়োগ ও বিকাশ সম্ভব। এজন্য বলা হয় যে, গণতন্ত্রের প্রকৃত সার্থকতা সমাজবাদে, উভয়ের মধ্যে মূলগতভাবে আছে গভীর সামঞ্জস্য। এজন্যই চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো সমাজবাদী বলে বিঘোষিত দেশে যদি সুচিন্তিত পদ্ধতিতে সমাজের মূলগত চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে, গণতন্ত্র প্রসারের ফলে মার্কসবাদের নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হয় তো তার চেয়ে সুখের বিষয় কি হতে পারে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হতে হয় এজন্যই যে বিশেষ করে চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো অবস্থিত দেশেই সমাজবাদের যে ঘোর শত্রুবৃন্দ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুরূপী সেজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কৌশলে অনলস অভিযানে প্রবৃত্ত তাদের গোচর ও অগোচর অনুপ্রবেশ বর্তমানে বেশ কিছু সময় ধরে শুধু তো অনুমানের বিষয় নয়, বরঞ্চ এই অপচেষ্টার বহু স্পর্ধিত, অসংকোচ লক্ষণও স্পষ্ট। সতর্ক হতে হয় এজন্যই যে, কোনো দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন তার নিজস্ব ও বিশিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে থাকলেও কখনও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে উদাসীন হতে পারে না। সতর্ক হতে হয় এজন্যই যে সাম্রাজ্যবাদ জানে তার বিশ্বব্যাপী শোষণ-শৃংখলের দুর্বলতম গ্রন্থি ছিন্ন করে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, আর তখন থেকে তার লক্ষ্য কোথায় কোন্ দুর্বল দোলায়মান প্রত্যঙ্গে সমাজবাদকে আঘাত করে রন্ধ্র সৃষ্টি সম্ভব। এই বিপ্লবী সতর্কতার প্রয়োজনেই কিছুকাল পূর্বে ব্রাতিস্লাভা সম্মেলন বসেছিল; চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট নেতাদের একত্র আলোচনা ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংবাদে সমাজবাদের শত্রুরা বিমর্ষ ও বন্ধুরা প্রফুল্ল হয়েছিল। গত জানুয়ারি এবং মে মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, তাকে অভ্যর্থনা করে, সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের ধুয়া তুলে সমাজবাদকেই বিপন্ন করে তোলার এক গভীর কুটিল চক্রান্তকে সবাই মিলে, পরস্পরের আশা আশংকা ভয় ভাবনা সম্বন্ধে যুক্তি ও তথ্যের বিচার করে পরাজিত করার খবর এসেছিল ব্রাতিস্লাভা থেকে।

পরবর্তী ঘটনার সবিস্তার বিবরণের প্রয়োজন নেই। কয়েকদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, এই পাঁচ দেশের ফৌজ চেকোশ্লোভাকিয়ায় মোতায়েন রইল, তারা বলল আমরা এসেছি বন্ধুভাবে, একই সামরিক চুক্তির অংশীদার হিসাবে, এবং সমাজবাদের শত্রুরা সমূহ বিপদ ঘটাবার জন্য প্রস্তুত এই সংবাদ এবং সাহায্যের আবেদন চেকোশ্লোভাকিয়ার সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির একাংশের কাছ থেকে পেয়ে। এরকম একটা অসাধারণ ঘটনায় সারা পৃথিবীর লোক চমকে উঠল, চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসীদের মনোভাব সহজেই কল্পনীয়। তবে এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, সোভিয়েটের এবং সমাজবাদের ঘোরতম শত্রু যারা তারা সর্বদেশে দলমত নির্বিশেষে একত্র হয়ে উন্মত্তের মতো বিষোদ্গার করতে লাগল, অথচ বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতারা মস্কোতে আলোচনা করলেন, সমঝোতা হল। পরিস্থিতি বিচার নিয়ে পরস্পর মতপার্থক্য এবং হয়তো বা

কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য হলেও মিটমাট খুব কঠিন হয় নি, প্রাগ শহরে বা অন্যত্র বহিরাগত সৈন্যদলের বিপক্ষে অনাচারের অভিযোগ শোনা যায় নি, ধরপাকড় বিশেষ হয় নি, হতাহতের সংখ্যা যৎকিঞ্চিৎ কারণ সংঘর্ষ প্রায় ঘটেই নি। পরদেশী ফৌজের প্রবেশ অবাঞ্ছিত ঘটনা সন্দেহ নেই কিন্তু প্রথম থেকেই বলা হয়েছিল তারা যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে যাবে—একেবারে অনিবার্য না হলে বন্ধু সমাজবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা অবলম্বন ঘটত না জানানো হল।

আমাদের দেশে প্রগতিবিরোধীরা এই ঘটনাসংঘাতে কিছুকাল ধরে উল্লাসে উল্লম্ফন করে বেড়িয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজব্যবস্থায় "সংস্কার" সম্বন্ধে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখাচ্ছেন ইউনাইটেড্ নেশন্সের নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটেন আর আমেরিকার মুখপাত্র লর্ড ক্যাডোগান এবং জর্জ বল্—গুয়াতেমালা, কিউবা, সান্তো দোমিঙ্গো, কঙ্গো, ভিয়েৎনাম, মিশর এবং অন্যান্য বহু অঞ্চলে সামরিক হস্তক্ষেপের পাণ্ডা যারা ছিল এবং আছে, তাদের কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল সোশালিস্ট চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি মমতায়! সেদেশে সমাজব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় স্বাধীনতা সম্পর্কে আবেগে আপ্লুত বাণী শোনা গেল আমাদের দেশে স্বতন্ত্র, জনসংঘ পার্টির নেতাদের মুখ থেকে তো বটেই—সঙ্গে সঙ্গে সেই উত্তাল জগঝম্পে যোগ দিল নানা ছাপ আঁটা "সোশালিস্ট" পার্টিগুলি, যোগ দিল আরও অনেকে। দৈনিক "যুগান্তরে" (কলকাতা সংস্করণ ৩০শে আগষ্ট ১৯৫৮) এক পাতায় দেখা গেল পত্রিকার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের দিল্লী থেকে পাঠানো চিঠি—সমাজবাদের প্রতি কোনো পক্ষপাত না থাকা সত্ত্বেও পার্লামেণ্টে আজব যে-সব দৃশ্য দেখা গিয়েছিল তার প্রকৃত নিরর্থকতাই তিনি লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু অপর এক পাতায় দেখলাম কলকাতায় প্রগতিশীল (এমনকি সাম্যবাদী দলের সদস্যও তাঁরা কেউ কেউ) কয়েকজন অধ্যাপকের বিচলিত বিবৃতি—মস্কোতে সমঝোতা হওয়ার পরও তাঁরা অত্যন্ত রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ মনে সোভিয়েট এবং তাঁর সহযোগীদের বিপক্ষে রায় দিয়ে চলেছেন। লোকসভায় দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টিরই সদস্য দলের শৃংখলাভঙ্গ করে অযাচিত ভাবে ব্যক্তিগত ঘোষণা করলেন সোভিয়েটকে "গণতন্ত্রের ঘাতক" বলে! দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)-র প্রধান প্রবক্তা বক্তৃতার তোড়ে যেন মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়ে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এ ভাবে বিষোদ্গার করলেন যে স্বতন্ত্র পার্টির একজন প্রধান নেতা অভিনন্দন জানালেন এই বলে : "ওঁর মোদ্দা কথা হল এই যে গর্ভস্রাবটা (অর্থাৎ কিনা, সোভিয়েট)

তার নিজের থুথুর মধ্যে ডুবতে থাকুক" ("Let the bastard stew in his own juice")! আশ্চর্য হতে হয়েছে এই দেখে যে শত্রুপক্ষের প্রচারযন্ত্র এখনও আমাদেরই মধ্যে এত বেশি বদমায়েসি চালিয়ে যেতে পারে অথচ নিজের অজ্ঞাতে আমরা সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি!

চেকোশ্লোভাকিয়াতে লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একাংশ সমাজবাদী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট বীতরাগ হয়ে উঠেছিলেন, সন্দেহ নেই। সে-দেশের সমাজবাদে গলদ অবশ্যই ছিল এবং চক্ষের নিমিষে তা অন্তর্হিতও হবে না—আকাশের চাঁদ সোশালিজম্ হাতে ধরিয়ে দেবে, এমন আশ্বাস ছিল বলে অবশ্য শুনি নি। কিন্তু সেজন্যই কি আমাদের দেশে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলে (কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও) এই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল? আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা কি গত এক বৎসরের 'Communist Affairs (bi-monthly, University of Southern California), 'East Europe' (monthly, published by Free Europe, New York), 'Problems of Communism' (bi-monthly, জগতের সর্বত্র U. S. I. S. কর্তৃক বিনামূল্যে বিতবিত) প্রভৃতি পত্রিকা কখনও দেখেন না, যে-পত্রিকাগুলিতে মোটা টাকায়-বেঁধে-রাখা "স্বাধীন পৃথিবীর" পণ্ডিতেরা অক্লান্ত উদ্যমে লিখে যাচ্ছেন? প্রথমোক্ত পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮) প্রথম প্রবন্ধের আখ্যা হল "Cutting the Moorings in Czechoslovakia"—প্রথমেই উদ্ধৃতি বহুলখ্যাত পত্রিকা 'Literarni Listy' থেকে, লেখকসংঘের একজন পাণ্ডা বলেছেন: "এতদিন রাষ্ট্র নাগরিকদের দেখাশোনা করেছে—ফল তো দেখতেই পাচ্ছি; এবার আমি বলি একে উল্টে দেওয়া হোক।" সমাজবাদী আমলে যা কিছু ঘটেছে তাকে ছোট করে দেখা এবং পশ্চিমের তথাকথিত "বিত্তবান্" ("affluent") সমাজের দিকে লালায়িত চোখে তাকিয়ে থাকার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেবার সময় নেই। 'Literarni Listy' ছাড়া 'Mlada Fronta' 'Student', 'Reporter', 'Plamena' ইত্যাদি পত্রিকায় সুপরিকল্পিত ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিশ বৎসরের গঠন কার্যকে মসীচিহ্নিত করা হয়েছে, সোশালিস্ট দেশগুলি সম্বন্ধে বিষোদ্গার চলেছে, ফ্যাশিস্ট অত্যাচারের স্মৃতি যাতে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যায় তার চেষ্টা হয়েছে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে সখ্যস্থাপনের ভূমিকা হিসাবে। "গণতান্ত্রিক সোশালিজমের" কথা বলতে

থেকে ক্রমে কার্যত সমাজবাদী ব্যবস্থার শত্রুতায় নামতেও অনেকে কুণ্ঠিত হয় নি। প্রেলিক্ নামে সেনাপতি ওয়ারশ' সামরিক চুক্তিকে আক্রমণ করেছেন এমন সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ্যে বলতে আরম্ভ করেছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায় "সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে সেখানে কমিউনিজমকে ধাপে ধাপে নামিয়ে ধ্বংস করার জন্য।" বেশ কিছু লেখক মিলে "দু'হাজার শব্দ" নামে যে বিবৃতি ছেড়েছিলেন সেটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় কত মারাত্মক। অবশ্য যদি কেউ বলেন যে কমিউনিস্টদের এত ভয় কেন, স্বাধীন চিন্তায় তারা সন্ত্রস্ত কেন, ওদেশে ওখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে কমিউনিজম্‌কে ঘষে মেজে "ভদ্রস্থ" করা হোক না কেন, তাহলে সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়চিত্তে জবাব দিতে হবে যে ইতিহাসকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে প্রস্তুত নই। বাংলাদেশে কয়েকজন ইতিহাসের অধ্যাপক বিক্ষুব্ধ বিবৃতি দিয়েছেন—তাঁদের স্মরণ করতে হবে বিপ্লবের মূল্য দিতে হয় প্রচণ্ড, বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার জন্যও মূল্য কম দিতে হয় না, এবং বার বার বিপ্লব কিভাবে বিপন্ন হয়েছে বিপথে গেছে তা জেনে আজ চেকোশ্লোভাকিয়ার কিয়ৎসংখ্যক বিদগ্ধ জনের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সমগ্র সোশালিস্ট ব্যবস্থাকে নিদারুণ সঙ্কটে ফেলে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে বলা অনুচিত, অন্যায়, প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অপরাধ।

ছ'টা দেশের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া লাগোয়া হয়ে আছে—পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী, সোভিয়েট ইউনিয়ন। মানচিত্রে দেখা যাবে দেশটা যেন ঢুকে রয়েছে একটা কীলকের মতো—মধ্য ইয়োরোপে তাই বোহীমিয়ার ভূগোলগত ও সামরিক গুরুত্ব এত বেশি। পশ্চিমী রণবিদের মুখে তাই শোনা গেছে চেকোশ্লোভাকিয়া হল ইয়োরোপে সোশালিস্ট সমাজ দেহের "নরম তলপেট," যাকে ছিনিয়ে নিতে পারলে মহালাভ। চেকোশ্লোভাকিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে ইয়োরোপে সোশালিষ্ট অগ্রগতির গঙ্গাযাত্রা ঘটানো, এবং তারই ফলে সারা পৃথিবীতে নয়া-সাম্রাজ্যবাদ জেঁকে বসার আয়োজন—এজন্যই তো সোভিয়েট এবং তার সহযোগী পঞ্চ রাষ্ট্রের এত বেশি দুশ্চিন্তা হয়েছিল। বন্ধুদেশে সৈন্য বাহিনী পাঠানোর বিপদ কী তাদের কাছে অজানা ছিল? তারা কি জানত না যে শত্রুপক্ষ তো উদ্দাম দৌরাত্ম্যে নাম্‌বে। আর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের মধ্যেও অনেকে সমস্ত ব্যাপারটা না বুঝে হয়তো দোলায়মান অবস্থায় কিম্বা দশচক্রে ভগবান ভূত হওয়ার মতো সঙ্গদোষে

কিছুকাল সমাজবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই অন্ধ হয়ে পড়বে? তারা কি জান্‌ত না যে নানা দেশে আবার কিছুকাল ধরে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ নূতন এক কুৎসার জিগির তুলে যথাসম্ভব ক্ষতি ঘটাবার চেষ্টা করবে? অবশ্যই তারা জানত, সঙ্গে সঙ্গে আরও জান্‌ত যে হয়তো বা এর পরে পশ্চিমী শিবিরে প্রতিক্রিয়া নূতন এক যুদ্ধ ইয়োরোপে (এবং পরে দুনিয়া জুড়ে) শুরু করে দিতে পারে। এ-সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েও তারা সমাজবাদ রক্ষার স্বার্থেই আপাতদৃষ্টিতে ক্লেশকর কর্তব্য পালন করেছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতার কথা ভাবলেও তো শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে হয়—শুধুমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তির জন্য দেড়লক্ষ সোভিয়েট সৈন্য প্রাণ দিয়েছে। আর সমগ্র যুদ্ধে সোভিয়েট দেশের দু'কোটি লোককে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। (সে-সংখ্যা হল যুগোশ্লাভিয়া বা রুমেনিয়ার মতো দেশের গোটা লোকসংখ্যার সমান)। দূর থেকে যদি আমরা ভাবি যে দায়িত্বহীনের মতো তারা চেকোশ্লোভাকিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছে, "আগ্রাসন" দোষে তারা দুষ্ট, তো বল্‌ব একটু মাত্রাজ্ঞান আমাদের মনে ফিরে আসুক, পশ্চিমী প্রচার যন্ত্র যেন এত সহজে আমাদের পথভ্রষ্ট না করতে পারে।

দুঃখ এবং লজ্জা হয় দেখে যে, বিলাতের "New Statesman"-এর মতো 'অভিজাত' পত্রিকা স্বভাবসিদ্ধ অহমিকা নিয়ে লিখছে এবং তারই যেন প্রতিধ্বনি আমাদের অনেকের মুখে শুনছি: "It is no longer worth hoping that any humanised Marxism can come out of Eastern Europe" (সম্পাদকীয় ২৩।৮।৫৮)। পূর্ব ইয়োরোপে মার্কস্‌বাদ নাকি অমানুষিক, তাকে "মানবিক" রূপ দিতে পারে বুঝি শুধু পশ্চিম ইয়োরোপ। চেকোশ্লোভাকিয়া নাকি এই অমানুষিকতার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েও পারল না। এই অহঙ্কার সাজে বটে ব্রিটেনের—যে দেশ সম্বন্ধে কার্ল্‌ মার্ক্‌স স্বয়ং শেষ জীবনেও কত আশা পোষণ করেছিলেন, অথচ যে-দেশে বিপ্লবের বারতা শোনা গেছে ম্যাক্‌ডনাল্‌ড্‌ অ্যাট্‌লি কোম্পানীর মুখ থেকে! এই অহঙ্কার সাজে বটে বিপ্লবের প্রাক্তন পীঠভূমি ফ্রান্সের—যে-ফ্রান্সে কয়েক মাস পূর্বে বিপ্লব যেন রবীন্দ্রনাথের লেখা "রাজার কুমার"-এর মতো দ্বার প্রান্তে এসেও চলে যেতে বাধ্য হল! এ-হেন নীচাশয় অহঙ্কার যাদের তারা কেমন করে বুঝবে পশ্চিম ইয়োরোপ সম্বন্ধে মার্ক্‌স-এর সাবধান বাণী—তাঁর ধারণা ছিল যে সমাজবাদী বিপ্লব প্রথমে ঘটবে ইয়োরোপে (এ

জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া বাতুলতা। ফলিত জ্যোতিষের কারবার মার্ক্‌স্‌ কোনদিন খোলেননি)। কিন্তু তিনি জোর করে বলেছিলেন বিপ্লব এশিয়া এবং অন্যত্র পরিব্যাপ্ত না হলে 'এই সংকীর্ণ প্রান্তে' ('in this little corner' that is Europe) তা সহজেই নিষ্পিষ্ট হবে। ফ্রান্স কিংবা ইতালীর বহু কমিউনিস্ট বোধ করি স্বপ্ন দেখছেন যে নিছক ভোটের জোরে সে সব দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। সুতরাং চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে এই ঝামেলাটা এড়ানো খুবই উচিত ছিল। তাঁদের হিসাবে কিছুটা গণ্ডগোল রয়ে গেছে। ভোটের জোরে তাঁরা কতদূর প্রকৃত প্রস্তাবে যেতে পারেন দেখা যাক্‌। কিন্তু ইতিমধ্যে জগৎজোড়া নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সামনে সোশালিষ্ট ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে তাঁরা থাকবেন কোথায়? এ-সব জিনিস মনে থাকে না বলেই তো ফেব্রুয়ারী মাসে বুদাপেস্ত কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে রুমেনিয়ার পক্ষ থেকে বলা হল যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক্‌ ইস্‌রায়েলের দল-ভাঙা 'কমিউনিস্ট পার্টি"-কে, যদিও তারা নির্লজ্জভাবে আরব দেশের বিপক্ষে নয়া-সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন হাতিয়ার রূপে ইস্‌রায়েলী আক্রমণের পূর্ণ সমর্থক! বোধ করি 'পশ্চিমী' প্রভাবে রুমেনিয়ার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল—মধ্যপ্রাচ্যে নয়া-সাম্রাজ্যবাদীর নরখাদক ভূমিকা পর্যন্ত তখন বিস্মৃত।

আমাদের মনে ভারসাম্য ফিরে এলে সহজেই বোঝা যাবে যে চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বহুলাংশে বিষাদ ও দুঃখকর হলেও তা অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতিতে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েট এবং সর্বদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন বহু স্থলে ভুল করেছে। ভবিষ্যতেও অবশ্য করবে—ভুল না করাটাই তো একরকম অমানুষিক ব্যাপার—কিন্তু শত্রু পক্ষের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম যখন আমাদের চোখের সামনে এত জলন্ত হয়ে রয়েছে, তখন বিপ্লব সংরক্ষণের স্বার্থে অপ্রিয় কর্তব্য পালিত হয়েছে বলে ম্রিয়মান্‌ হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই। আমরা কি জানি না, কত অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে—দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে আর পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ সোশালিষ্ট, সুতরাং কেল্লা তো প্রায় ফতে, এখন ভাবতে বসি কেমন করে? "গণতন্ত্র" আর "উদারনীতির" মুখোস্‌ পরে ইতিহাসের চাকাকে পিছনে টেনে নেওয়ার চেষ্টা কি কষ্টকল্পনা? ভিয়েৎনামের বীর কাহিনী থেকে শিক্ষা নেই? ইস্‌রায়েল আর পশ্চিম জার্মানীর বিশিষ্ট অস্তিত্ব কি একপ্রকার মায়া? দক্ষিণ-আমেরিকার সংগ্রামী আকুতি, ভারতবর্ষের মতো

দেশের খণ্ডিত স্বাধীনতার অসার্থকতার বেদনা, আফ্রিকার অভ্যুদয় এবং বঞ্চনা —সব মিলে আজকের যে জগৎ, তাকে যেতে হবে বিপ্লবের পথে, এ-কাজ কি স্বল্প, এ কি সহজ, এ কি জটিলতা-মুক্ত, এ কি বুদ্ধিজীবী আবেগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ-সাধ্য ? সাধনার কথা বলে গেছেন ঋষিরা, কিন্তু বিপ্লবের পথ কি তার চেয়ে কম বন্ধুর, বেশি সুগম ? তাই মনে পড়ছে কঠোপনিষদের শ্লোক যা অবশ্যই বিপ্লব সম্বন্ধে প্রযোজ্য :

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতাদূরত্যয়া, দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিয়ে জগৎ জুড়ে যে ঝড় বয়ে গেল, তার ঝাপ্‌টা এখনও মিলিয়ে যায় নি। এর জের মিটতে সময় লাগবে বেশ কিছু। আর হয়তো ইতিমধ্যে এমন ঘটনা ঘটতে থাকবে যার ফলে আবহাওয়া আজ্‌কের মতো কিছুটা অস্পষ্ট থাকবে না। দেশে দেশে যারা সমাজবাদী আন্দোলনে নানাভাবে ব্যাপৃত, তারা কিন্তু এই জের মিটে যাওয়া পর্যন্ত হাত গুটিয়ে থাকতে পারবে না। আলোচনা চলবে, শুধু রাজনৈতিক কৌশলগত প্রশ্ন নয়, মৌলিক তত্ত্বগত প্রশ্নের অবতারণা হবে, বিভিন্ন পরিবেশে সমাজবাদের বাস্তব রূপায়ন সম্বন্ধে তর্ক উঠবে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিমাণ ও চরিত্র নিয়ে গভীর ও ব্যাপক অনুশীলনের প্রয়োজন হবে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য, একদিকে বিপ্লবের স্বার্থ এবং অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তা, জাতিবোধ প্রভৃতি ধারার সার্থক সঙ্গম সৃষ্টির সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সাহস এবং অন্তর্দৃষ্টির সহায়তা নিয়ে। আমাদের দেশের কমিউনিষ্ট মহলে কতকটা দিশাহারার মতো মনোভাব দেখা দিলেও এই আলোচনার সূচনা হয়েছে। বাস্তব জগতের অকরুণ আঘাতে আমাদের স্বভাবত আবেগপ্রবণতা আজ প্রকৃত পরীক্ষার আসরে নামতে বাধ্য হয়েছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দায়িত্ব যেন অস্বীকার না করি।

খুব ভালো লাগ্‌ল ৩১শে আগষ্ট তারিখে ওয়ারস' শহরে পোলাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী Cyrankiewicz-এর বক্তৃতার বিবরণ। উপলক্ষ্য ছিল ২৯ বৎসর আগে ফ্যাশিষ্ট জার্মানী কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রমণের বার্ষিকী। "আজ হল আমাদের তলিয়ে ভাবার দিন, কাজে নামার দিন", এই মূলকথা নিয়ে তিনি অনেক গুরুতর বিষয় উত্থাপন করেছেন যার সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া যাবে না। চেকোশ্লোভাকিয়া সম্বন্ধে তিনি বলেন: "শুধু চেকোশ্লোভাকিয়া নয়, সকল সোশালিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে 'শান্তিপূর্ণ' ভাবে অর্ধগোপন যে প্রতিবিপ্লব বেড়ে উঠতে চাইছিল, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্টদের সহযোগিতা নিয়ে তাকে দাবিয়ে দেওয়া ছিল আমাদের কাজ।... সেদিন আসবেই যেদিন আজ

চেকোশ্লোভাকিয়াতে যারা আমাদের কাজের কদর্থ করেছেন তাদের ভুল ভাঙবে। ইতিহাসের শিক্ষা তাদের স্মরণে নেই। সমাজবাদ বিরোধী, বিশ্ববিলাসী (cosmopolitan), প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি যে অবাধ বেপরোয়া, নোংরা, নিন্দাবাদী প্রচার চালিয়েছে তার শিকার হয়েছিল অনেকে। গণতন্ত্র আর উদারনীতি আর সোশালিজ্‌ম্-এর 'পুনর্নির্মাণ' যারা চান তাদের পিছনে উঁকি মারছে হিটলার, হেইড্রিশ্, হেন্‌লাইন্-এর উত্তরাধিকারীরা। আমাদের পক্ষে বিলম্ব করা সম্ভব ছিল না, এইসব ধারাকে যথাসময়ে বাধা না দিলে অপরাধ হত।……

"এই নিয়ে উৎসাহের উচ্ছ্বাস বা বাগাড়ম্বর অচল। আজ যেন দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা গোটা পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর শয্যাপার্শ্বে অপেক্ষা করছি ; আজ যেন ডুবন্ত একটি মানুষকে জল থেকে তুলে আনবার সময় সবাই উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সেদিন আসবে যেদিন রোগমুক্তির পর রোগী স্বয়ং বুঝবে কে তাকে উদ্ধার করেছে, আর কেই বা তার মাথা জলের মধ্যে গুঁজে দিচ্ছিল। পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছি।"

এই সেদিন (১৫ই ভাদ্র ১৩৭৫) "যুগান্তর" দৈনিকে দেখা গেল "রাজধানীর চিঠি"তে সাংবাদিক-পর্যবেক্ষকের মন্তব্য। "আমরা একটু বেশি আবেগপ্রবণ বলেই বোধ হয় যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে ঘটনার বিচার করার দিক সহজে হারিয়ে ফেলি এবং অনেক সময় এমন আচরণ করি যা নিতান্তই বালোচিত।" এই মন্তব্যের কারণ হল যে চেকোশ্লোভাকিয়ার ঝড়ের "ঝাপ্‌টাটা দিল্লীর উপর লেগেছে যেন একটু বেশি"—"সাময়িক উত্তেজনা" এবং "উচ্ছ্বাসবশে" আতিশয্যের দৃষ্টান্তও লেখক দিয়েছেন ঐ একই দিনে পত্রিকার অপর পৃষ্ঠায় আছে আঠারোজন বিশিষ্ট বাঙালী শিক্ষাব্রতীর বিবৃতি, যার স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অনেকে আমার পরিচিত, কয়েকজন আমার স্নেহভাজন এবং বোধ করি সকলেই সমাজবাদে বিশ্বাসী কিম্বা অনুরাগী। বিবৃতিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর "সশস্ত্র আক্রমণ"-এর অসংকোচ নিন্দাবাদ ছাড়াও "সমাজতন্ত্রী পুনর্গঠন, রূপান্তর বা বিপ্লব রুশ-ধাঁচে বা তাদের পছন্দসই না হলেই প্রতিবিপ্লবী বলে চূর্ণ করে দিতেই হবে, এই অদ্ভুত কিন্তু প্রায় 'ধর্মান্ধ' বিশ্বাস" সোভিয়েট নেতৃত্ব পোষণ করে বলে ঘোষণা রয়েছে। শিক্ষাব্রতীদের আন্তরিকতা অনস্বীকার্য ; দুরভিসন্ধি তাদের আছে বলে কোন

অভিযোগ ঘুণাক্ষরেও আসবে না। কিন্তু তাঁরা যখন "ফৌজী-নিয়মের বাঁধনে আড়ষ্ট এই সাম্যবাদের বিকৃত অধ্যায় পরাজিত হবেই" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ অবলীলাক্রমে করতে থাকেন, তখন দুঃখ হয় এত সহজে সজ্জন ব্যক্তিরও মতিভ্রংশ হয় দেখে। আজকের অস্থির বিভ্রান্ত জটিল পৃথিবীতে ইতিহাসের গতি কিঞ্চিৎ বক্র পথের ইঙ্গিত দিতেই এদের ধৈর্যচ্যুতি, অনুপাত বোধলোপ, বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার বহুরূপী চক্রান্ত বিষয়ে মোহাবেশ, ইতিহাসের সুপণ্ডিত হয়েও বিপ্লবের মূল্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিস্মৃতি?

"রুশ ধাঁচে কিম্বা তাদের পছন্দসই না হলেই" ভিন্ন দেশের সমাজবাদী পুনর্গঠন প্রচেষ্টাকে "চূর্ণ" করে দিতে হবে, এই প্রতিজ্ঞা যদি সোভিয়েট, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, পূর্বজার্মানী ও বুলগেরিয়া গ্রহণ করেছে বলে প্রমাণ হয় তো নিশ্চয়ই তার নিন্দাবাদ কর্তব্য। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং এখনও যার পূর্ণ সমাধান ঘটে নি, তাকে এত সহজ ও সরল মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ আছে ভাবা ভুল। সব দেশে সোশালিজমের চেহারা এক হবে, একথা কখনও কোনও দায়িত্বশীল কমিউনিষ্টের চিন্তায় স্থান পায়নি। সম্প্রতি আট-নয় মাস ধরে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজব্যবস্থায় আগের যুগের ভুলভ্রান্তি শুধ্‌রে নিয়ে গণতান্ত্রিক বিকাশের অনুকূল পরিবর্তন প্রবর্তনের চেষ্টাকে সোভিয়েট-প্রমুখ পার্টিগুলি স্বাগত জানাতে কুণ্ঠিত হয় নি, চেকোশ্লোভাকিয়া তার স্বকীয় ধারায় সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের প্রকৃত সামঞ্জস্য সাধনের কাজে অগ্রসর হলে তা বিশ্বব্যাপী সমাজবাদী প্রগতিরই সহায়ক হবে, এ বিশ্বাস তাদের ছিল এবং আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে আশঙ্কাও ছিল (এবং এখনও তা দূর হয়নি) যে চেকোশ্লোভাক নেতৃত্ব গণতন্ত্রের নামাবলী ধারণ করে সমাজবাদের ঘোর শত্রুবৃন্দের কুটিল ষড়যন্ত্র এবং অত্যন্ত নিপুণ অপপ্রচার সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ-থাকার লক্ষণ দেখাচ্ছেন না। এজন্যই ঐ ছয় পার্টির পত্রালাপ, বারংবার আলোচনা, ব্রাতিসলাভায় একত্র বসে সিদ্ধান্ত নির্ধারণের চেষ্টা চলেছিল। সোভিয়েট প্রভৃতি পঞ্চ পার্টির নেতারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়নে অপটু বা অপারগ বলে সন্দেহ করা কঠিন। বাতিস্লাভা চুক্তির অতি অল্প কয়েকদিন পরেই অকস্মাৎ মিত্ররাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়ায় সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করলে তৎক্ষণাৎ যে তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত প্রতিকূল হবে, বিভিন্ন দেশের সমাজবাদী জনমতও যে অন্তত সাময়িকভাবে হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হবে, এ-অনুমান করতে পারার

মতো সাধারণ জ্ঞান তাদের নেই বলা চলে না। তবুও এই কঠোর এবং অপ্রিয় সিদ্ধান্ত তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। নিদারুণ একটা ভুল বোঝাবুঝির ঝক্কি তাদের মাথায় তুলে নিতে হয়েছিল। এরকম একটা ঘটনা থেকে ব্যাপক যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে দেওয়ার মতলব এবং ক্ষমতা শত্রুপক্ষ রাখে জেনেও তারা এ-কাজ করেছিল—গত বিশ্বযুদ্ধে যে দেশের দু'কোটি লোক প্রাণ দিয়েছে। সেই সেভিয়েটদেশ অন্তত যুদ্ধের দায়িত্ব খুব হালকা ভাবে ঘাড়ে নেবার ছাত্র নয় বলা অসঙ্গত নয়, কিন্তু বিপদের হিসাব করেও তারা এ-কাজ করেছিল। একে "ধর্মান্ধ বিশ্বাসের" কুফল বলে ভৎর্সনা করলে আত্মশ্লাঘা তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু সুবিবেচনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহাজনবাক্য রয়েছে যে শয়তানের প্রতিও অবিচার অকর্তব্য, অথচ পরীক্ষিত সমাজবাদী নেতৃত্ব সম্বন্ধে এত ক্ষিপ্র, এত উত্তপ্ত সংশয়, এত রোষ বিস্ফোটন, এমন বৈরিতা যা অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়ারই সহায়ক?

বিস্ময় কিম্বা আশংকার কোন কারণ থাকৃত না যদি এই বুদ্ধিজীবীরা মনের খেদ প্রকাশ করতেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো দেশে বিশবৎসরাধিক কাল সমাজবাদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এমন দুর্দৈব দেখে বলতেন এর পর্যালোচনা চাই। কেন এমন অঘটন ঘটেছে তার জবাবদিহি দরকার, সমালোচনা এবং আত্ম সমালোচনার ভিত্তিতে। কিউবার পক্ষ থেকে ফিদেল্ কাস্ত্রো সুদীর্ঘ ভাষণে এ বিষয়ের উত্থাপন করেছেন, নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব ইয়োরোপে সোশালিজমের গত বিশ বৎসরের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এবং কিউবার বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে জোর গলায় আশ্বাস জানিয়েছেন, সেখানে অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব যাতে না ঘটতে পারে সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে। আমাদের এই বিদ্বানেরা ধরেই নিয়েছেন যে সোভিয়েট সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ গঠনে বাধা দিয়েছে—প্রতি দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সোশালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার নীতি বিষয়ে মৌখিক সমর্থন জানিয়েও কার্যত তাকে নস্যাৎ করেছে, এবং তার ফলে সমাজবাদেরই ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

যাদের বিদ্যাবত্তা ও সদভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, তাদের মনের এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মনে হয় যে ১৯৫৬ সালের সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পর থেকে হয়তো অগোচরেই এ-ধারণা আমাদের

মধ্যে অনেকেরই হয়েছে যে মোটামুটি সোজাপথে পৃথিবী এগিয়ে চলবে সমাজবাদ-সাম্যবাদের দিকে, বাধা অবশ্য পড়বে কিন্তু তা মারাত্মক নয় বলে খুব একটা ধর্তব্যের মধ্যেও নয়। এই ধারণাকেই আরও সুপুষ্ট হয়তো করেছে ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টির সর্বসম্মত যে ঘোষণায় বর্তমান ইতিহাসের ছন্দ, তার গতি এবং প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ সমাজবাদ করছে বলা হয়েছিল। সমাজবাদই যখন এ যুগের নিয়ন্ত্রক শক্তি, তখন শত্রুপক্ষের ক্ষমতা আর কৌশল সম্বন্ধে তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নেই ভেবে, সদাসতর্ক বিপ্লবী প্রস্তুতি হয়তো আমরা অনেকে পরিহার করে বসে আছি। বেশ কিছুকাল আগে "লেবর মান্থ্‌লি" পত্রিকায় রজনী পাম দত্ত লিখেছিলেন—কার্লমার্কস্‌-এর জন্মের (১৮১৮) পর একশো বৎসর পূর্ণ হওয়ার মুখে ইতিহাসের প্রথম সোশালিস্ট বিপ্লব (১৯১৭) ঘটেছে, আর হয়তো আশাকরা যায় যে মার্কস-এর মৃত্যুর (১৮৮৩) পর একশো বৎসর পূর্ণ হবার সময় দেখা যাবে দুনিয়া জুড়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাকে আবার কেউ যেন গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী বলে না ধরে বসেন, কিন্তু এ-ধরণের আশা তো অমূলক নয়। এ-স্বপ্ন তো অলীক নয়। ১৯৫৩ সাল আসতে এখনও পনেরো বৎসর বাকি—১৯১৭ থেকে পনেরো বৎসর পিছিয়ে গেলে ১৯০২ সালে বিপ্লব তো ছিল সুদূর পরাহত! তবে ইতিহাসে কখনও পরিবর্তন আসে ত্বরিৎ বেগে, আবার কখনও স্তিমিত গতিতে। মার্কস একবার বলেছিলেন যে কখনও কখনও বিশ বৎসরকে মনে হয় বুঝি একদিন মাত্র। আবার কখনও এমন দিন আসে যা হল "বিশ বৎসরের নির্যাস"। দেশে দেশে আজ বিপ্লবের বারতা, তার পায়ের ধ্বনি আজ সর্বত্র, কিন্তু সেজন্য সহজে কেল্লাফতে করা যাবে মনে করার কারণও তো নেই। কুটিল, কঠোর, এবং এখনও পরাক্রান্ত যে শত্রু, সহজে কি তার নিপাত ঘটতে পারে? সমাজবাদের পরিব্যাপ্তি এবং শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু শ্রেণী সংঘর্ষের অবসান তো এখনও ঘটে নি। সাম্রাজ্যবাদের অতি কদর্য নবরূপ যখন ভিয়েৎনামে, মধ্য প্রাচ্যে, লাতিন আমেরিকায়, এশিয়া-আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশে নিরন্তর দেখা যাচ্ছে, তখন বাঁধানো পাকা রাস্তা বেয়ে সবই মিলে "গণতন্ত্রের" জয়গান গেয়ে সোশালিজ্‌মে পৌছে যাওয়ার কল্পনা আসে কোথা থেকে? চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিয়ে যে ঝড় উঠেছে, তা কি এ কথাই প্রমাণ করছে না যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীসংঘাত এখনও প্রখর ভাবেই বিদ্যমান্?

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে স্টালিন যুগের ভুলভ্রান্তি

অপকর্মের নিন্দায় ক্রুশচেভ্ যখন শতমুখ, তখনই একবার তিনি বলেছিলেন "আমরা যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ি, তখন আমরা সবাই হলাম স্টালিনপন্থী।" বিপ্লবী কর্তব্য পালনে নির্মম একাগ্রতায় আতিশয্য স্টালিনের দৃষ্টি এবং বিচার বুদ্ধিকে কিছুকাল আচ্ছন্ন যে করেছিল, তা নিঃসংশয়। বিপ্লবী কর্তব্য নির্ধারণে ভ্রান্তি এবং সেই কর্তব্য সাধনে অত্যুগ্র আগ্রহ তখন অজস্র অপরাধের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এজন্য অতিরিক্ত বিস্মিত হলে মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই সূচিত হয়। ফরাসী বিপ্লব যখন তুঙ্গে আরোহণ করেছে, তখনই 'জিরন্দিষ্ট' নামে প্রখ্যাত দলের মুখ্য প্রতিনিধি মাদাম রলাঁ গিলোতিনে মাথা পেতে দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে নাকি পার্শ্ববর্তী প্রস্তর মূর্তির দিকে চেয়ে বলেছিলেন: "হায় স্বাধীনতা তোমার নামে কত অপরাধই যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।" মৃত্যুপথ-যাত্রিনীর এই অভিযোগ একেবারে অমূলক ছিল না, কিন্তু তাই বলে ইতিহাসের বিচারে ফরাসী বিপ্লবের তৎকালীন অধ্যায় তো এতটুকু ম্লান হয়ে যায় নি। স্টালিন শেষ জীবনে নিশ্চয়ই ভুল এবং অন্যায় করেছিলেন আপ্ত বাক্যের মতো ঘোষণা করে যে সমাজবাদের পূর্ণ সাফল্য যত সন্নিকট হচ্ছে, ততই তার শত্রুকূলের চক্রান্ত ও দৌরাত্ম্য আরও ঘোরতর আকার গ্রহণ করছে। এরই ফলে সোভিয়েট দেশের অভ্যন্তরে যত্রতত্র অহেতুক সন্দেহ ও আশঙ্কা পরবশ হয়ে বহু নিরপরাধের বিরুদ্ধে ক্রুর দমননীতি প্রচণ্ডভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে স্টালিনের ঐ মতকে পূর্ণ ভ্রান্ত বলা সমীচীন হবে না—সমাজবাদ আজ জগৎ জয়ের শক্তি এবং সম্ভাবনা রাখে বলেই তো বহুরূপী সাম্রাজ্যবাদের বৈরিতা কত বেশি দুর্ধর্ষ, কত বেশি সুপরিকল্পিত, কত বেশি অকরুণ, কত বেশি কুটিল, কত বেশি কঠোর।

ধনতন্ত্রের প্রকৃত সঙ্গতি আর নেই, সে আজ দেউলিয়া, সংসারকে তার আর কিছু দেবার নেই, নীতির দিক থেকে সে নিঃস্ব, এবং সেজন্যই তার ক্ষীয়মান্ শক্তির মরিয়া ব্যবহার আমরা দেখেছি। ভিয়েৎনামে বিশ্বের সব চেয়ে ধনী রাষ্ট্রের দুর্দশা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে নূতন শোষণমুক্ত সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কিন্তু অর্থের দিক থেকে প্রায় নিঃসম্বল দরিদ্রের দল। ফ্যাশিজমের বর্বরতার স্মৃতি আজকের বয়ঃকনিষ্ঠদের কাছে খুব উজ্জ্বল নয়, কিন্তু ভিয়েৎনামে নয়া সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা (যে জন্য দায়ী শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দায়ী ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি "গণতন্ত্রের"

ধ্বজাধারী দেশ) যেন ফ্যাশিজ্‌মকে লজ্জা দিচ্ছে। শুধু ছলে বলে কৌশলে নয়, সাধারণ মানুষ যা কল্পনা করতে পারে না এমন পৈশাচিক, মানবতা-বিবর্জিত 'পরাক্রম' প্রয়োগ করে নয়াসাম্রাজ্যবাদ চাইছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমাজবাদকে রোধ করতে, চূর্ণ করতে। তার বিশ্বব্যাপী অভিযান সব চেয়ে ক্রূর এবং সবচেয়ে বেপরোয়া চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে ভিয়েৎনামে।

জগৎ জুড়ে আজ চলেছে এই সংঘর্ষ। তারই ভিন্ন রূপ দেখছি মধ্য প্রাচ্যে, কিন্তু মূলত তা হল অভিন্ন। দেশদেশান্তরে যাতায়াত ও যোগাযোগ যখন আজকের মতো এত দ্রুত ও সহজ ছিল না, তখনই নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন যে পৃথিবীর রাজধানী হল কন্‌স্তান্তিনোপল্‌; ইয়োরোপ এবং এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার, অর্থাৎ কার্যত তৎকালীন জগৎ জয় করতে হলে সব চেয়ে প্রকৃষ্ট শক্তিকেন্দ্র মধ্য প্রাচ্যে, এ-কথা তিনি বুঝেছিলেন। তৈল খনি আবিষ্কারের পর থেকে এবং যাতায়াত ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের আর্থিক এবং সামরিক গুরুত্ব বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। প্রায় পনেরো বৎসর আগে, আমেরিকান সেনাপতি এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইজেন্‌হাওয়ার যখন বলেন যে সমরনীতির দিক থেকে জগতে সবচেয়ে দামী এলাকা হল মধ্যপ্রাচ্য, তখন তিনি সুবিদিত তথ্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। আজ যে ইজরায়েলকে সাক্ষীগোপাল সাজিয়ে জাগরণোন্মুখ আরব জনতার বিরুদ্ধে নয়া সাম্রাজ্যবাদী দৌরাত্ম্য কখনও উন্মুক্ত রূপে এবং নিয়ত নানা ছদ্মবেশে সাম্প্রতিক ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করছে, তার কারণ হল এই যে জাতীয় মুক্তি কামনা সমাজবাদে পরিণতির আশায় উৎফুল্ল এবং সেই অন্বেষণে প্রবৃত্ত বলে দুনিয়ার ধনপতিদের কাছে তা অসহনীয়। এই দৌরাত্ম্যকে প্রতিহত ও পরাভূত করার জন্য সোভিয়েট এবং অন্যান্য সমাজবাদী শক্তি কৃতসংকল্প। আর সেজন্যই বহুরূপী চক্রান্ত তাদের বিরুদ্ধে চলেছে, পূর্ব-ইয়োরোপের দেশে দেশে বহু যুগ ধরে নির্যাতিত ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতির ভণ্ড মুখোস্‌ ব্যবহার করা হচ্ছে মধ্য প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের জয়লাভে সহায়তা ঘটানোর উদ্দেশ্যে। তাই পোল্যাণ্ডে, রুমেনিয়ায়, সর্বোপরি চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজবাদের শত্রুরা কুটিল ষড়যন্ত্র চালাবার চেষ্টা করছে। যে দানবিকতা ভিয়েৎনামে, তারই কথঞ্চিৎ আচ্ছাদিত সংস্করণই তো চলছে মধ্যপ্রাচ্যে। আজকের আন্তর্জাতিক পরিবেশ বুঝতে হলে একে তো প্রখরভাবে মনে না রেখে উপায় নেই।

সবকথা পরিষ্কার করে বলা একটা প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়, কিন্তু

কিছুতে ভুললে চলবে না যে নানা পদ্ধতিতে, নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহার করে কোথাও অসংকোচ অমানুষিকতা আর কোথাও বা আপাতদৃষ্টিতে মার্জিত উপায়ে নয়া সাম্রাজ্যবাদ তার লক্ষ্যসিদ্ধির জন্ত একাগ্র প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। কোরিয়াতে কিম্বা কিউবার বিপক্ষে, লাতিন আমেরিকা কিম্বা আফ্রিকা-এশিয়ার দেশে দেশে, ইউরোপে কিম্বা ভারতের মতো সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতি ব্যবহারে, নয়া-সাম্রাজ্যবাদের চেহারা আজ কারও নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। মাঝে মাঝে ভব্যতার মুখোস্ পরানো থাকলেও সে চেহারা কত কদর্য, তা জান্তে অন্তত আমাদের মতো দেশে যারা বাস করি তাদের বাকি নেই। চেকোশ্লোভাকিয়াতে "গণতন্ত্র"-এর সম্ভাবনায় তাদের আহ্লাদ আর সমাজ-বাদী পাঁচ দেশের "হস্তক্ষেপে" সেই সম্ভাবনা ব্যর্থ হতে দেখে তাদের ধিক্কার—এর প্রকৃত অর্থ বেশিদিন ঢাকা থাকতে পারে না।

ইয়োরোপে প্রতিক্রিয়ার প্রধান প্রহরী এবং প্ররোচক-শক্তিরূপে পশ্চিম জার্মানীর ভূমিকা আজ যারা সোভিয়েট এবং অন্যান্য সোসালিস্ট দেশের চেকোশ্লোভাকিয়া ঘটিত "অপরাধ" সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয়, তাদের অবশ্যই অবিদিত নয়। যুদ্ধাপরাধী বলে বিচার হলে যাদের প্রাপ্য ছিল চরম দণ্ড, তারাই (পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্ট লুব্‌কে-র মতো) সেখানে পশ্চিমী শক্তিবৃন্দের আশ্রয় ও আনুকূল্যে সর্বেসর্বা। সেখান থেকে নিরন্তর চলছে সোসালিস্ট দেশগুলির বিরুদ্ধ মারাত্মক চক্রান্ত। বাণিজ্য এবং তজ্জনিত লাভের লোভ দেখিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো দেশকে ক্রমশ সমাজবাদী গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র বহুদিন ধরে চলেছে তা সম্প্রতি ঘোরালো হয়ে উঠেছিল, অর্থনৈতিক "সংস্কার"-এর নামে কিছু ধনতান্ত্রিক ভেজাল সেখানে ঢুকছিল, মার্কিন কর্তৃত্বে চালিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণপ্রাপ্তির কথা শোনা গিয়েছিল, অটা সিক্-এর মতো অর্থনীতিবিদ্ বলে পরিচিত ব্যক্তি দেশকে এক নূতন হুজুগে মাতিয়ে বস্তুত সমাজবাদী ব্যবস্থাকেই প্রথমে বিকৃত এবং পরে বিকল করার মতো অধঃপাতে নামার লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন। ইহুদীদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে জার্মান ফ্যাশিজম্ সবচেয়ে মর্মন্তুদ অভিশাপ ও যন্ত্রণা এনেছিল, কিন্তু তাদের প্রতি সহানুভূতির অজুহাতে বর্তমানে ফ্যাশিজ্‌মেরই উত্তরাধিকারী শক্তিবৃন্দের ক্রীড়নক ইজ্‌রায়েলের প্রশস্তি এবং সংগ্রামী আরব জনতার নিন্দাবাদ প্রকাশ্যে শোনা গেল চেকোশ্লোভাকিয়ার কোন কোন লেখকের মুখ থেকে যাতে সাহিত্যিক ও শিল্পীর মহার্ঘ মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হল। অতি

সুকৌশলে সমাজবাদী দেশেও ঐতিহাসিক কারণে অদ্যাবধি বিদ্যমান জাতিবৈরভাবকে ব্যবহার করা হতে লেগেছিল সমাজবাদকেই পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে। ইয়োরোপের কেন্দ্রস্থলে চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থিতি; মানচিত্রে দেখা যাবে মধ্যইয়োরোপে একটা তীক্ষ্ণ কীলকের মতো যেন তা ঢুকে রয়েছে; তার গায়ে লাগা রয়েছে ছটা দেশ—সোভিয়েট ইউনিয়ন, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, পূর্বজার্মানী, তা ছাড়া অস্ট্রীয়া এবং নয়া-সাম্রাজ্যবাদের উদ্যত এবং উদ্ধত শূলপ্রতিম পশ্চিম জার্মানী। আশ্চর্য নয় যে প্রকাশ্য জল্পনা চলেছে এই বলে যে চেকোশ্লোভাকিয়া যেন সোসালিস্ট ইয়োরোপের 'নরম তলপেট', যাকে ছিনিয়ে নেওয়া দরকার। আশ্চর্য নয় যে স্পষ্ট ঘোষণা শোনা গিয়েছে যে ক্রমশ, ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিজ্‌ম্‌কে 'স্তরে স্তরে ভেঙে ফেল্‌তে হবে' ("stage by stage dismantling of communism")।

এ-বিষয়ে বহুবিধ ঘটনা যে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ মেলে, তেমনই অর্থবহ দু একটি ব্যাপারের উল্লেখ করা চলে। দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ন্যাশনাল হেরল্‌ড্‌' চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিয়ে সোভিয়েট বিরোধী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ তারিখে ঐ পত্রিকায় বিলাতের 'গার্ডিয়ান' কর্তৃক বিতরিত এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক সার সিসিল্‌ প্যারট্‌ (Sir Cecil Parrott) ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত চেকোশ্লোভাকিয়ায় ব্রিটিশ রাজদূত ছিলেন, এখন তিনি ল্যাঙ্কাস্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিয়ান এবং সোভিয়েট ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। তিনি লিখেছেন: "...আমি ২৬শে জুলাই তারিখে প্রাগে পৌঁছেছি। আমি অনুভব করেছিলাম যে চেক্‌ জনগণের কোন বিপদ ঘটলে তাদের পাশে থাকা আমার উচিত। ...আমাদের একটি দায়িত্ব আছে যাকে এড়ানো কিছুতেই চলবে না। একটা যা হোক্‌ মিটমাট হয়ে গেলে ব্রিটেনের লোক আর চেকোশ্লোভাকিয়ার দুর্ভাগা বাসিন্দাদের কথা ভাব্‌বে না এবং তারা তখন বাধ্য হয়ে ফিরে যাবে লৌহ যবনিকার পিছনে, যেখান থেকে প্রায় আট মাস আগে বিশিষ্ট সাহস ও বুদ্ধিমত্তার জোরে নিজেদের ছিনিয়ে আনতে পেরেছিল। যেমন করে হোক্‌, যে কোন মূল্যে এই দুর্ঘটনা নিবারণ করতে হবে..."। এই কূটনীতি বিশারদের বক্তব্য তো থলে থেকে বিড়ালকে বেশ স্পষ্টভাবেই বার করে দিচ্ছে।

নয়া-সাম্রাজ্যবাদ বহুবিধ অস্ত্র, বহুবিধ প্রকরণ নিয়ে আজ লড়ছে। কোথাও প্রকাশ্য যুদ্ধ, অবলীলাক্রমে নগ্ন, নৃশংস তাণ্ডবের অনুষ্ঠান; কোথাও কূট চক্রান্ত, কোথাও অর্থবলে, কোথাও গোয়েন্দাগিরির দাপটে কর্তৃত্ব স্থাপন ও বর্ধন; কোথাও দ্বিধাহীন আধিপত্য, কোথাও বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ—এবং সর্বত্র সর্বতোভাবে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রাণশক্তিকে বিকৃত ও ক্রমশ নিঃশেষ করার অবিরাম প্রয়াসে সমাজবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তিবৃন্দ আজ ব্যাপৃত। তাদেরই উদ্যোগে বিদ্যাচর্চার নামে মার্ক্সবাদকে নস্যাৎ করার বিচিত্র কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে, এবং প্রধানত বিপুল মার্কিণ অর্থ সহায়তায় নানা দেশে বিদ্বান্ বলে অল্পাধিক খ্যাত অসংখ্য ব্যক্তি সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এই অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এরা মাঝে মাঝে বলে থাকেন যে মার্ক্স্ মহৎ অবদান রেখে গেছেন বটে কিন্তু লেনিনবাদ হল সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন তিন-চার দশক ধরে যে পথে চলেছে তার সঙ্গে আদি ও অকৃত্রিম মার্ক্সীয় চিন্তার নাকি সম্পর্ক নেই, মার্ক্সের বিদগ্ধ ইয়োরোপীয় ভাবধারার বর্বরীকরণ ঘটিয়েছে কমিউনিস্টরা, অর্থনীতি বিষয়ে মার্ক্সবাদ প্রকৃত পক্ষে বাতিল, শ্রেণীসংঘাত একটা দূষিত কল্পনা, এবং প্রথম যৌবনে রচিত নিবন্ধে মার্ক্স্ মানবিকবাদ সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তাছাড়া যথার্থ মূল্যবান্ বস্তু আর বড একটা কিছু নেই! নিপুণ প্রচার ক্রমাগত করা হয়েছে, এমন কি রোজা লুক্সেমবুর্গের মতো প্রাতঃস্মরণীয় কমিউনিস্ট শহীদের রচনার দোহাই দিয়ে বলা হয়েছে যে কমিউনিজম্ "গণতন্ত্রের" নিপাত ঘটিয়েছে অথচ "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ"-এর মাধ্যমেই "সমাজবাদের নবজন্ম" ঘটিবে। সঙ্গে সঙ্গে কখনও সূক্ষ্ম বৈদগ্ধ্যের জাল ছড়িয়ে আর কখনও বা নির্লজ্জ দর্প সহকারে বলা হয়েছে যে "প্রাচ্য" দেশীয়দের (অর্থাৎ সোভিয়েট, চীন ইত্যাদি) হাতে পড়ে সমাজবাদের মার্জিত "প্রতীচ্য" ধারা "মানবতা বিবর্জিত" ("de-humanised") হয়ে দাঁড়িয়েছে—সম্প্রতি বিলাতের "নিউ স্টেট্সম্যান্" পত্রিকার (যা আমাদের এদেশে পণ্ডিত-মহলে বিপুল সমাদর ভোগ করে) সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া প্রসঙ্গে লেখা হল, পূর্বের দেশগুলো সমাজবাদকে মনুষ্যত্বহীন একটা কাণ্ডে পরিণত করেছে, তাদের কাছে আর কিছু আশা করা যাবে না। যে পশ্চিম ইয়োরোপে বিপ্লব আসবে বলে মার্ক্স্ কত আশা করেছিলেন, ঐতিহাসিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও সেই পশ্চিম ইয়োরোপ দর্প করে বলে যে প্রাচ্য-

দেশগুলো অপদার্থ। ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্য, জীবনের মান উন্নয়ন ইত্যাদির প্রলোভনে যারা ধনতন্ত্রকে আঘাত করতে প্রস্তুত নয়, যারা বিপ্লবকে ক্রমাগত এড়িয়ে চলেছে, নয়া-সাম্রাজ্যবাদের অনুচরবৃত্তিতে যাদের অরুচি নেই, "সর্ব-মানবের লক্ষ্মীলাভের" উদ্দেশ্যে সর্বদেশের সর্বহারাদের সংগ্রাম সম্বন্ধে যাদের একান্ত বিরাগ তাদের এই ঔদ্ধত্য হাস্যকর বটে। ১৯৩০ সালে কবির অন্তর্দৃষ্টি বলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমেরিকার মতো ধনী দেশে হল কুবেরের অধিষ্ঠান, যে-কুবের অজস্র অর্থের অধিকারী কিন্তু যার রূপ হল কদর্য। অপরপক্ষে কল্যাণী লক্ষ্মীর আবাহন প্রয়াসে নেমেছে সোভিয়েট্‌দেশ, যেখানে সমাজের স্তরভেদ দূর করে সকলের জন্য স্বস্তি, সুখ ও সৌষ্ঠব রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা তিনি দেখেছিলেন। সম্পদের মিথ্যা মোহে আকৃষ্ট হয়ে আজকের পৃথিবীতে সচেতন বিপ্লবীর স্বেচ্ছাগৃহীত কৃচ্ছ্রসাধনের সংকল্পকে ছোট করে দেখার একটা ঝোঁক বেশ কিছু দেশে বর্তমানে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে সম্প্রতি চেকোশ্লোভাকিয়াতে তার সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে যুবজনের জীবনযাত্রায় নিঃসন্দেহে লক্ষণ ফুটেছিল যে বিপ্লবী দায়িত্ব প্রায় বিস্মৃত হওয়ার উপক্রম ঘটার সেখানে আশঙ্কা। এই আশঙ্কা যে অধুনাতন সংকটের মূলে ছিল এবং আছে, তাকে নিশ্চিন্ত বলা অতিশয়োক্তি হবে না।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে চলার পথ সর্বদা সুগম নয়, পথ বন্ধুর বলে তাকে পরিহার করতে-চাওয়া তো অচল। সমাজবাদ তো চলমান জীবনেরই অঙ্গ ; "এখনো গেল না আঁধার এখনো রহিল বাধা" বলে রবীন্দ্রনাথ তো শুধু বিলাপ করেননি। বরঞ্চ দেখি ঐ অদ্ভুত সুন্দর গাথায় তাঁর ঋষিনেত্রের অবলোকন-ফল "এখনো নিজেরই ছায়া রচিছে কত যে মায়া ; এখনও মন·যে মিছে. চাহিছে কেবলই পিছে"! চেকোশ্লোভাকিয়া হোক্ বা অন্য যে কোন দেশ হোক্, সমাজবাদের পথে যে নেমেছে তার সাম্‌নে কি শুধু সোজা বাঁধানো সড়ক? অতীতের টান কি ফুরিয়ে গিয়েছে? পথে যেতে যেতে ক্লান্তিবশে পিছিয়ে পড়া কি একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা? "একটা গোটা ঐতিহাসিক অধ্যায়" জুড়ে সে সামাজিক বিবর্তন ঘটবে, তাতে উত্থান-পতন, চেতন অচেতন ও অবচেতন হেতু সমবায়ে কথঞ্চিৎ পদস্খলন ও কক্ষচ্যুতি কি অস্বাভাবিক?

অতি সরল ঔদার্য নিয়ে বলা হচ্ছে যে নানা দেশে সোশালিজ্‌মের নানারূপ

আমরা দেখব, সুতরাং চলুক না যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া তাদের নিজস্ব রাস্তায়। তাতে বিভিন্ন সোশালিষ্ট দেশের মধ্যে ছাড়াছাড়ি যদি ঘটে তো নাচার, অন্তত সে-সব দল ভাঙা দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা তো বাড়বে, চিন্তার মুক্তিও নাকি ঘটবে। এ ধরণের কথা যারা বলছেন, জানি না তারা বিচলিত কিনা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অনৈক্য লক্ষ্য করে। সম্ভবত এরা চান না যে মহাচীন ফিরে আসুক এক নূতন করে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিষ্ট পরিবারে, সেখানে কিউবা আর কোরিয়া থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া পর্যন্ত সবাইয়ের স্বস্তিতে স্থান মিলবে। "চিন্তায় মুক্তি" ও "ব্যক্তিস্বাধীনতা" ইত্যাদি কথার প্রকৃত মর্মার্থ নিয়ে বিতর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এটাতো ঠিক যে সোশালিষ্ট দুনিয়ায় ফাটল ধরাতে এবং বাড়াতে এ-সব গালভরা তত্ত্বকথা পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে শত্রুপক্ষ সিদ্ধহস্ত। আজকের পৃথিবীতে বিপ্লবের বারতা যখন কোথাও কোথাও অলক্ষ্য হলেও সর্বদেশে অমোঘ বেগে ধাবমান। যখন বিপ্লব কোথাও প্রথম অঙ্কে কোথাও বা আরও অগ্রসর স্তরে উপস্থিত, যখন ইতিহাসের নব অধ্যায় সূচিত ও নিয়ন্ত্রিত করার সম্ভাবনা ও সামর্থ্য রয়েছে সমাজবাদী শক্তিধারার হাতে, দেশদেশান্তরে জনতার মুক্তিকামনা যখন সমাজবাদেই স্বাধীনতার প্রকৃত সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করছে, তখন সমাজবাদের স্বপক্ষে সকলকেই মৌল ব্যাপারে সুদৃঢ় প্রত্যয় এবং একতার বর্মে সজ্জিত হতে হবে—ভিয়েৎনামের সমর্থনে সর্বসংহতির মধ্যে যার ইঙ্গিত এবং বিধান নিহিত রয়েছে। সমাজবাদী ব্যবস্থার সংহতি ব্যাহত করার জন্য শত্রুপক্ষের তাই এত উদ্যোগ, এত উৎকণ্ঠা! চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলীর সুপরিকল্পিত কদর্থীকরণ তাই এত বিভ্রান্তি ও এত হুঙ্কারজনক কোলাহলের কারণ হয়েছে। সেই সংহতি রক্ষা ও সংবর্ধন তাই আজ সর্বদেশের জনতার অপরিহার্য দায়িত্ব। শত্রুর সুনিপুণ শরনিক্ষেপে বিহ্বল হয়ে এ-দায়িত্ব ভুললে অমার্জনীয় অপরাধই করা হবে।

সোভিয়েট সাহিত্যিক Lev Ginzburg সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "আমি কেবলই ভাবছি চেকোশ্লোভাক লেখকদের কথা, যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে প্রাগে, ব্রাতিস্লাভায়, অন্য দেশে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে। ভাবছি এবং গভীর বেদনা বোধ করছি, কারণ আমি বুঝি তাদের পক্ষে আজকের অবস্থা তো সহজ নয়। তাদের কাজের বিচার আমি করব না। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সন্দেহ, কুণ্ঠা, এমন কি ভ্রান্ত পথে

নামারও যুক্তি আছে। তবে আমি জানি যে একদিন তারা নিজেরাই এ-সব ব্যাপারের নির্ভুল খতিয়ান করবেন। জীবনে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ দিনগুলির মধ্য দিয়ে পথের সন্ধান পাওয়া তো সর্বদা সহজ নয়।"

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা বেয়ে চলছে সমাজবাদ। পথের দৃশ্য তো সর্বদা মনোরম নয়; অঘটন মাঝে মাঝে না ঘটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার; ক্লান্তিতে পিছিয়ে পড়াও তো স্বাভাবিক ঘটনা; অথচ চলতে তো তাকে হবে-ই। মনে পড়ছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত অনুবাদের একাংশ: "চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠ জন হলেও ক্রমে নীচ হতে থাকে, অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো ("চরৈবেতি, চরৈবেতি")।"

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং

বহুদিন থেকে "নতুন পরিবেশ"-এ লেখা দিতে প্রতিশ্রুত আছি। কিন্তু কাজ আর অকাজের চাপে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়ে ওঠেনি। প্রায় মরিয়া হয়ে এবার লিখতে বসেছি, মনের কথা গুছিয়ে সাজিয়ে বলতে যে পারব না তা নিশ্চিত। তবুও লিখছি। কারণ আজকের নতুন পরিবেশ সব দেশেই পুরোনো পরিবেশ থেকে আলাদা, আমাদের দেশে তো বটেই। আর আমরা হয়তো অনেকেই সেই পরিবেশ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি বলে চিন্তায় আর কাজে ভুল করছি, বর্তমান যুগের প্রশ্নাকুল জীবনের প্রাঙ্গণে যারা সদ্য প্রবেশ করেছে তাদের মনের হদিস্ পুরোনো বাসিন্দারা ঠিক পাচ্ছি না বলে সামগ্রিক সমাজচিন্তায় ছেদ পড়ে যাচ্ছে—"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম", এই বেদবাক্য যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কারও কারও মনে হতে পারে যে অস্তিত্বের অমোঘ একাকিত্ব অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই, যূথ জীবনের অল্পমূল্য স্বস্তির সহজ আগ্রহকে না হয় বর্জনই করা গেল! এ নিয়ে তর্ক থাক্। শুধু মনে আস্‌ছে আড়াই হাজার বছরেরও বেশী আগে গ্রীক মনীষী হেরাক্লিটস্-এর কথা: "যখন জেগে আছি তখন আমরা আছি বহুজন-অধ্যুষিত জগতে, আর যখন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি তখন আছি নিছক একাকিত্বের জগতে।"

* * *

আমাদের মধ্যে অনেকে ত্রিশের দশক আর তারই যেন পরিপূরক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে সমাজবাদ-সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আজ তাদের মত, পথ আর মনের মেজাজ হয়তো যুবসমাজের কাছে অনেকাংশে বাতিল। যে সব দেশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব আর তারই সঙ্গে সংলগ্ন বিভিন্ন প্রকৃতির বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি কঠোরভাবে যেতে হয়েছে, সেখানে নাকি যুবা ও প্রৌঢ়ের মধ্যে "দুই পুরুষ"-এর একপ্রকার সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। সোশালিষ্ট সমাজের সংহতি পূর্বতন যুগে যে রূপে দেখা যেত, তার পরিবর্তন ঘটেছে—আগে যে ক্ষেত্রে

প্রশ্ন উঠত না কিংবা উত্থাপন অকর্তব্য বলে পরিগণিত হত, সেখানে সমাজের ভাবাত্মক ঐক্যের লাগাম আলগা করা হয়েছে, নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজশৃংখলার নির্দেশক (dogmatic) প্রয়োগ নিবারণ সম্বন্ধে সতর্কতা এসেছে। সমাজবিপ্লব অবশ্য কয়েকটি অঙ্কে সমাপ্ত হওয়ার মতো নাটক নয়; এ-নাটকে যবনিকা পড়ে না। পরমাণু যুদ্ধে এই গ্রহ থেকে মানবজীবনের অবলুপ্তি যদি ঘটে তো ভিন্ন কথা, কিন্তু সে-কথা এখন থাক্‌। আর বিপ্লবের প্রাথমিক অঙ্কে যা ঘটে থাকে, পরবর্তী পর্যায়ে তার অবিকল পুনরাবৃত্তি অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। সেজন্যই সোশালিষ্ট দেশগুলিকে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেক নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। এরই অনিবার্য ফল হল, (বিশেষ করে) তরুণ মনে অভূতপূর্ব অস্থিরতা, যাকে চিন্তায় অরাজকতা বলে ভুল করা একেবারে অমূলক নয় কিন্তু যা সমুচিত চর্চার সহায়তায় হয়তো প্রকৃত প্রজ্ঞারই অভিমুখে প্রথম অনিশ্চিত পদক্ষেপ-মাত্র। "অগ্রজের অটল বিশ্বাস" যে অনুজেরা নির্বিচারে স্বীকার না করে নিয়ে মনোরাজ্যে নতুন সংগ্রামের মাধ্যমে তাকে শুদ্ধ করে নিতে চাইছে, এতে দুশ্চিন্তা হওয়ার কথা নয়।

বহু শতাব্দীর জড়তা আর ইংরেজ শাসনের অভিশাপ আমাদের ভারত-বর্ষীয় জীবনে এমন সব উদ্ভট জট পাকিয়ে রেখেছে যে তাকে ছাড়িয়ে পরানুকরণপ্রবৃত্তি ও বাস্তববিমুখিতা বর্জন করে চিন্তায় অভিনিবেশ, সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা এবং কর্মে প্রকৃত তৎপরতা যেন আমাদের অসাধ্য। আজকের ভারতীয় যুবসমাজ যদি যুগধর্মের তাড়নায় এই অসাধ্যসাধনের প্রয়াসে অগ্রসর হয়, তাহলে প্রাক্তন সর্ববিধ অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে অভিযানে আতিশয্য ঘটলেও বিচলিত না হয়ে বরঞ্চ তাকে অভ্যর্থনা জানানোই উচিত হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে সেরূপ কোন প্রয়াসের প্রকৃত লক্ষণ কোথাও আমাদের দেশে স্পষ্ট হয়ে উঠছে না।

* * *

আমাদের দেশে সমাজবাদী-সাম্যবাদী আন্দোলনের পক্ষে এমন অনুকূল সময় পূর্বে কখনও আসে নি। এখনও এদেশের সমাজে ও রাষ্ট্রে ধনপতিদেরই কর্তৃত্ব। কিন্তু এই কর্তৃত্ব সম্বন্ধে দেশবাসীর বিক্ষোভ শুধু নয়, তার অবজ্ঞাও ক্রমশ অপরিসীম হয়ে উঠছে—যে-ইমারতের বনিয়াদ আজ হয়তো অধিকাংশের চক্ষেই হল ফাঁপা, তাকে একটু-আধটু চুনকাম আর

মেরামতের জোরে টিকিয়ে রাখা যায় না যদি দেশের লোক অনেকে মিলে তাকে ঠেলে ফেলতে চায়। এই অবস্থায় সোশালিজমের কথা শোনা যায় চারদিকে, এমন কি কংগ্রেসের মতো পাঁচমিশেলী দলও দরকার বুঝে সোশালিজমের নামাবলী ধারণ করে। সামান্য কিছু লোক (যারা অবশ্য এখনও সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি রাখে) বাদে প্রায় সবাই বলে যে সোশালিজম্ বিনা রাস্তা বোধ হয় নেই, তবে কি না সোশালিজম্ সম্বন্ধে হরেক-রকম কথা শোনা যায় বলে তাদের মনের সন্দেহ দূর হয় নি। দুনিয়া জুড়ে যে সব ঘটনা ঘটছে তার আসল অর্থ ধরতে পারা সহজ নয়। কিন্তু এটা সবাই প্রায় দেখছে যে পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ থেকে ধনিক শাসন দূর হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া আফ্রিকার পদানত দেশগুলি স্বাধীন হলেই বুঝছে যে সোশালিজমের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই আর তাদের তাঁবে রাখার জন্য আমেরিকার মতো রাষ্ট্র মরিয়া হয়ে ভিয়েৎনামে (এবং অন্যত্রও) অকথ্য দৌরাত্ম্য করে চলেছে। আমাদের মতো দেশে এটাও সবাই ক্রমশ ভালো করে বুঝছে যে সাম্রাজ্যবাদের নতুন কায়দা হল অর্থসাহায্যের নামে নানা দেশের উপর আধিপত্য চাপিয়ে রাখা, আর শুধু সোশালিষ্ট দেশগুলিই আমাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক মারফৎ যথার্থ বন্ধুতা স্থাপন করতে চাইছে। আমরা আরও দেখছি যে পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে গণ্ডগোল বাধলে আমেরিকা ব্রিটেন প্রভৃতির যেন পৌষমাস পড়ে যায়, আমাদের সর্বনাশেই যেন তাদের পোয়াবারো, অথচ সোভিয়েটের মতো শক্তি সেখানে এগিয়ে এসে প্রকৃত সাহায্য করে, উভয়কে প্রকৃতিস্থ হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক যাতে ফিরিয়ে আনতে পারে সেদিকে মনোযোগ দেয়।

কিন্তু আবার অন্য দিক থেকে মনে হবে যে এদেশের পরিস্থিতি আজ সমাজবাদ-সাম্যবাদের পক্ষে অনুকূল না হয়ে বরঞ্চ প্রতিকূল। আমাদের বাক্যবাগীশ রাজনীতির দৌড় বেশিদূর অবধি নয়। নানারকম পরস্পর বিরোধী ব্যাপারকেও তালগোল করে এক করে ফেলার যে 'প্রতিভা' আছে আমাদের চিন্তায়, তারই জোরে আমরা সোশালিজম্‌কেও আরও অনেক কিছুর সঙ্গে একাকার করে অকেজো নিষ্কর্মা করে·ছেড়েছি। তা ছাড়া স্বাধীনতার পর থেকেই ইংরেজ-মার্কিনদের সঙ্গে যে সম্পর্ক সভয়ে রেখে চলেছি, তার ফলে তাদের কোট ছেড়ে বেরিয়ে আসার দুঃসাহস সহজে হবে না, আর এতদিনে

তো দেনার দায়ে তাদের কাছে দেশের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে রাখতে বিশেষ দেরি নেই। আবার এদেশে সমাজবাদী-সাম্যবাদী আন্দোলন যারা করবে, তাদের মধ্যে বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। আর অনেক টাল সাম্‌লে যে কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল, যার অন্ত গুণ তেমন থাক্‌ বা না থাক্‌, আমাদের দেশের হিসাবে অন্তত শৃংখলা নামক গুণটা আয়ত্ত ছিল আর ভুলভ্রান্তি করেও দেশবাসীর সঙ্গে মিশে থাকার শক্তি যে পার্টি প্রকাশ করেছিল এবং করে সারা দেশে কংগ্রেসের প্রকৃত প্রতিপক্ষী বলে পরিগণিত হয়েছিল, সেই পার্টির মধ্যে মতবাদের ঝগড়া ক্রমশ নোংরা কোন্দলে গিয়ে দাঁড়াল। যা চরমে উঠে ঘটালো এমন ভাঙন যাকে চলনসইভাবে মেরামত করে নেওয়াই হল এক দুরূহ কাজ। পৃথিবীর অধিকাংশ কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে চীনের পার্টির তীব্র মতভেদ ঘটার ফলে যখন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ঐক্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কঠোর অথচ অকাট্য সংগ্রাম হল একেবারে সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য, তখন আমাদেরই দেশে জনসাধারণের প্রত্যাশাকে উপেক্ষায় দলিত করে এই একান্ত পরিতাপকর দ্বিধাবিভক্তি ঘটল। জনতার জয় তো এমন বস্তু নয় যে একদিন হঠাৎ আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টির মতো তা ঘটে যাবে; কিন্তু যে শক্তি সেই জয়কে সংগঠিত করে হাতে ধরে টেনে আনবে, তাই যেন হয়ে গেল পঙ্গু।

ত্রিশের দশকে কিংবা তারও পূর্বে যারা সমাজবাদ-সাম্যবাদের মধ্যে ইতিহাসের পুঞ্জীভূত সংকট থেকে ত্রাণের নিশানা পেয়েছিল, যারা নতুন আবিষ্কারের আনন্দে একদা ভেবেছিল মার্কস্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় তাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, বর্তমান দুর্দশার জন্য তাদের দায়িত্ব অস্বীকার না করেই বলব যে এ-দুর্দশার উত্তরদায়িত্ব হল আরও বেশি তাদের—যারা মার্কস্‌বাদীদের মধ্যে হল কনিষ্ঠ, নিজেদের ‘ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধন দীন’ মনে করার যাদের কারণ নেই, যারা কিশোর বয়স থেকে দেখছে দেশের পর দেশ স্বাধীন হয়ে সমাজবাদের পথে পা ফেলতে চাইছে, যারা পরাধীনতার জ্বালাকে সম্যক্‌ প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে কখনও পায় নি, যাদের সমাজ-উদ্যমে অসময়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়ার কোন কারণ ঘটে নি। আজকের নতুন পরিবেশে যারা সাম্যবাদী আন্দোলনে এসেছে, তারা দেশের মানুষের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব সম্বন্ধে বাস্তবিকই সচেতন থাকলে কি এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতিকে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রতিকূল করে ফেলার বিপদ সম্বন্ধে অনেক বেশি যত্নবান্‌ হত না?

হয়তো শুনব যে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে নানা দেশে একাধিকবার দেখা গেছে যে পার্টিকে ভেঙে তবেই আবার নতুন করে তাকে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এটা তো তথ্য, অস্বীকার করার নয়। কিন্তু স্থানকালপাত্র বোধ ছেড়ে দিয়েই কি ধরে নিতে হবে যে পার্টি ভেঙে যাওয়াটা সমীচীন? যে সময়ে, যে অবস্থায়, যে পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পার্টি ভেঙেছে, তাতে স্বদেশে কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অগ্রগতি আরও সুনিশ্চিত হয়েছে, না তা রীতিমতো পিছিয়ে গেছে? এ-প্রশ্নের উত্তর সবাইয়ের কাছ থেকে একভাবে আসবে না, কিন্তু উত্তর সম্বন্ধে আমার নিজের কোন সংশয় নেই। তাই ভাবি, এজন্যই কি আমাদের দেশে আজকের কমিউনিষ্ট বিতর্কে উত্তাপ আছে—আলো নেই, উগ্রতা আছে—স্থৈর্য নেই, দম্ভ আছে—নিশ্চিতি নেই, আক্রোশ আছে—মমতা নেই? আরও ভাবি, ভীত হয়ে ভাবি, এর কারণ কি এই যে নব যুগের নব উন্মেষের সঙ্গে সুসমঞ্জস্য হয়েই কমিউনিষ্ট চিন্তা ও কর্ম নব রূপ পরিগ্রহ করে ইতিহাসের সার্থকতম শক্তি হয়ে কাজ করে, তা আমরা অনেকে বুঝতে চাইছি না। আর সেজন্য হয়তো নিজেরই অগোচরে যে প্রত্যয় আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্বল তাকে হারিয়ে ফেলছি অথচ হারিয়ে ফেলার বিড়ম্বনা এড়াবার জন্যই গতানুগতিকতার শরণ নিচ্ছি, সংকীর্ণতার আশ্রয় খুঁজছি, নিশ্চিতি ঠিক নেই বলেই কর্কশ হয়ে পড়ছি? আমাদেরই মনের নিভৃতে কি এমন বিপর্যয় ঘটেছে যে ষ্টালিনযুগের সমালোচনা এবং বিপ্লবীপ্রত্যাশায় পরিপূর্ণ পরিতুষ্টিতে বাধা ও বিলম্ব, এই উভয় ব্যাপার মিলিত হয়ে সাম্যবাদ সম্পর্কেই সুগোপন অথচ সর্বনাশা সংশয় সৃষ্টি করেছে?

* * *

বহুদিন আগে শোনা, ইংরেজ কমিউনিষ্ট নেতা• হ্যারি পলিটের একটা কথার প্রতিধ্বনি করে সম্প্রতি (১লা সেপ্টেম্বর) দিল্লীতে সুবিপুল সমাবেশে বলেছিলাম যে আগামীকাল সূর্যোদয়ের মতোই নিশ্চিতভাবে কমিউনিষ্ট সমাজের আবির্ভাব আমাদের দেশেও ঘটবে—সমরকন্দে সাম্যবাদ যখন এসেছে তখন বারাণসীতেও একদিন তা বেমানান্ মনে হবে না। হয়তো পরিহাস শুনব যে এ তো হল পূর্বনির্দিষ্ট ভবিতব্যে বিশ্বাসেরই সামিল। কিন্তু কমিউনিজমের অমোঘ অভ্যুদয় সম্বন্ধে জ্যোতিষীর মতো ভবিষ্যৎ বাণী মার্কস্ প্রমুখ মনীষীরা কখনও করেন নি, যেজন্যই ভবিষ্যৎ বিষয়ে মার্কসের

হিসাবের ভুল খুঁজে বার করার কাজে বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা এত হাস্যকর ভাবে গলদ্‌ঘর্ম হয়েছেন! সমাজের ভবিষ্যৎ রূপায়ণ সম্বন্ধে মার্কসীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গে মানুষের অকাট্য নিয়তি বলে কিছু ঘোষণা করার কোন সম্পর্ক নেই। মার্কস্‌বাদ বলে না যে একদিন সূর্য নিরুত্তাপ হওয়ায় জগতের বিলয় ঘটার মতো আপনা থেকেই ধনতন্ত্রের অবসান দেখা যাবে! ধর্মপ্রবর্তকদের কথা আমরা জানি, যাঁরা বলেছেন ধৈর্য ধরে মানুষ অপেক্ষা করুক, অবশেষে স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলে যাবে—এঁদের মতো আশ্বাস দিয়ে সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয়ের কথা সবাইকে বুঝিয়ে রাখা মার্কস্‌বাদের কর্ম নয়। মার্কস্‌বাদের নিয়ত প্রয়াস হয়েছে সমাজে কর্মব্যস্ত মানুষের ভূমিকাকে উপলব্ধি করা; ভাগ্যের মতো অলংঘনীয় রূপে ইতিহাসের নিষ্পত্তি ঘটবে সাম্যবাদীসমাজের স্বয়ম্ভু আবির্ভাবে, এমন কথা বলে মার্কস্‌বাদ মানুষকে ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ক্রীড়নক কখনও মনে করে নি। বরঞ্চ মানুষকে ইতিহাস স্রষ্টার গৌরবান্বিত আসনেই বসিয়েছে। মানুষের বর্তমান স্থিতি এবং ভবিষ্যৎ ভূমিকার বাস্তব পর্যালোচনা করেই সাম্যবাদকে সামাজিক বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলা হয়েছে। 'অবশ্যম্ভাবী' শব্দটির অর্থ এই নয় যে গাছের পাকা ফল টুপ করে আপনা থেকেই মুখে এসে পড়বে। এজন্যই অনেকদিন আগে ষ্টালিন বলেছিলেন, জয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আসে না তাকে হাত ধরে টেনে আনতে হয়।

এক শুভদিনে শোষণহীন সমাজ দেখা দিল আর তার পর থেকে রূপকথার নায়ক নায়িকার মতো দুনিয়ার সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে থাকল, এমন ছেলেভোলানো কথাও মার্কস্‌বাদ কখনও বলেনি। কমিউনিজম্ এল আর মানুষের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় ইতিহাসের গতিচ্ছন্দে পূর্ণ ছেদ পড়ে গেল, এমন উদ্ভট কল্পনাবিলাস মার্কসবাদ করে না। বরঞ্চ মার্কস্ স্বয়ং বলেছিলেন যে কমিউনিষ্ট সমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শোষণকণ্টকিত প্রাগৈতিহাসিক পর্যায় সমাপ্ত হবে, তার প্রকৃত স্ববশ, স্বাধীন ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটবে। কমিউনিজ্‌ম্ এল আর সব কিছু নিখুঁত হয়ে গেল, এ যে ভাবতেও আতঙ্ক—এজন্যই তো ধর্মবিশ্বাসীর কল্পিত যে স্বর্গরাজ্যে নিছক নিখুঁত স্বস্তি বিরাজ করে সেখানে দেবতারাই হাঁপিয়ে পড়েন, মাঝে মাঝে মর্ত্যে নেমে এসে পাপীজনের জীবনের ছোঁয়াচ না পেলে তাঁদের চলে না! সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান

হয়ে গেল কমিউনিষ্ট সমাজে, এমন স্থাণুভাবান্বিত বক্তব্য মার্কস্‌বাদের কুত্রাপি উপস্থাপিত হয় নি। নতুন সেই সমাজে সমস্যার চেহারা ও প্রকৃতি কী হবে, তা নিয়ে অনুমানাশ্রয়ী চিন্তায় মগ্ন না হয়ে সমকালীন কর্তব্যে লিপ্ত হওয়ার আহ্বানই মার্কস্‌বাদ দিয়ে এসেছে।

মার্কস্‌বাদের মূল সিদ্ধান্ত এবং তার প্রয়োগ বিষয়ে চলমান সমাজের নতুন পরিবেশে নতুন চিন্তাকে সর্বদা নিরুৎসাহ ও নির্মূল করার যে ঝোঁক মাঝে মাঝে দেখা যায় (যা বিপ্লব-মুহূর্তে কিংবা বিপ্লবের বিজয়কে সুরক্ষিত করার অধ্যায়ে সম্পূর্ণ সঙ্গত ও সমুচিত হতে পারে), সেই ঝোঁক সম্বন্ধেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এরই আতিশয্য-জনিত ভ্রান্তি ও অপরাধের ফলে মার্কস্‌বাদী চিন্তা ও প্রগতির পথে বহু প্রতিবন্ধক ঘটেছে। অবশ্য মার্কস্‌বাদ সতেজে উপস্থাপিত হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাকে "শোধন" করে নেওয়ার যে প্রবণতা বারবার দেখা গিয়েছে, তার বিভ্রান্তি ও বিপদ সম্বন্ধে সাবধান হতেই হবে। মার্কস্‌বাদকে মেজে-ঘষে, "ভদ্রস্থ" করে তার বিপ্লবী চরিত্রকেই বিকৃত ও বিকল করার অপচেষ্টা বড় কম হয়নি। বের্ণস্টাইন, কাউট্‌স্কি, হিল্‌ফর্‌ডিং প্রমুখ পণ্ডিতেরা সচেতন, খল বৈরিতা নিয়ে 'শোষনবাদী' ভূমিকায় নেমেছিলেন কি না, সে তর্কে প্রবেশ না করেই বলা উচিত যে "ফলেন পরিচীয়তে" নীতি অনুযায়ী বলতেই হবে যে মার্কস্‌বাদের বিপ্লবী তত্ত্ব ও কর্মোদ্যমকে এই "শোধন"-প্রচেষ্টা অন্তঃসারশূন্য ব্যর্থতা বলেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল এবং সেইজন্যই তা অশ্লাঘ্য ও সর্বথা বর্জনীয়। ১৯২৮ সালে "Beyond Marxism" অভিহিত বক্তৃতামালায় বেলজিয়ান্ সোশালিষ্ট De Man ঘটা করে বলেছিলেন যে শ্রেণীসংঘাতের বদলে ন্যায়বিচারনীতিকে সমাজবাদের মূলসূত্র বলা উচিত—ঠিক যেমন বহু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও আজ বলে থাকেন যে ঐ শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপারটা বাদ দিলে তো কারও পক্ষে কমিউনিষ্ট হতে বাধা থাকে না! যাই হোক, বেলজিয়ান নেতৃপ্রবর পরে একেবারে হিটলারের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। "Beyond Communism" নামে আমাদের দেশের মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি শেষ জীবনের রচনা আছে; নিজেরই প্রথম জীবনের বিপ্লবী পরম্পরা তাঁর ক্ষেত্রে কি ভাবে এবং কতটা বিকৃত হয়েছিল, তা সুবিদিত। এদেশে কমিউনিষ্ট প্রচেষ্টায় প্রথম যুগে বিলাত থেকে প্রভূত শুভবুদ্ধি নিয়ে এসেছিলেন ফিলিপ স্প্র্যাট; বাউড়িয়া এবং অন্যত্র চটকল এলাকায় সাধারণ মজুরের

বাসায় তিনি অনেকদিন কাটিয়েছেন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান, ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতে তাঁর অবদান একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। কিন্তু মার্কস্‌বাদকে শুধ্‌রে নেবার দুর্মতি হওয়ার পর থেকে তাঁর অধঃপতন অবিরাম চলেছে; তিনি ভারতীয় নাগরিক হয়ে এদেশে রয়েছেন, সমাজবাদ-সাম্যবাদের প্রতি তাঁর অতি ঘোর বৈরিতা, স্বতন্ত্র পার্টির একজন প্রচারক আজ তিনি। মার্কস্‌বাদকে "শোধন" করে নেওয়ার মতো মারাত্মক দুর্মতি আর নেই।

কিন্তু তা' বলে ক্রমাগত মার্কস্‌ আর লেনিনের নাম আউড়ে যাওয়া আর জগতের যত কিছু প্রশ্নের জবাব তাঁদের কথামৃতের মধ্যে রয়েছে বলে ভাবাবেগে গলিত হয়ে থাকার মতো বিড়ম্বনার কাদায় পা ফেলার কোন কারণ নিশ্চয়ই নেই। এ-ধরনের নিছক গোঁড়ামির আতিশয্য আর কর্তাভজা মনোভাব নিজের জীবনকালেই শিষ্যদের মধ্যে লক্ষ্য করে স্বয়ং মার্কস্‌ একবার বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "Thank God I'm not Marxist!" যাঁকে আজ কমিউনিস্ট গোঁড়ামির প্রধান প্রতীক মনে করা হয়, সেই মাও ৎ সে-তুং কিছুকাল আগে এডগার স্নো-কে বলেছিলেন: "আজ থেকে এক হাজার বছর বাদে সম্ভবত মার্কস্‌, এঙ্গেলস্‌ আর লেনিনকেই কতকটা হাস্যকর ("rather ridiculous") মনে হবে।" এ-সব কথার মাছিমারা অর্থ যেন কেউ করে না বসেন, কিন্তু মার্কসের মূল শিক্ষাই বলছে যে ইতিহাস স্থাবর নয়, ইতিহাস হল জঙ্গম, তার গতিচ্ছন্দ কখনও একেবারে রুদ্ধ হয় না, সর্বকালের শেষ প্রশ্নের সদুত্তর দিব্যজ্ঞানবলে দিয়ে রাখা মার্কসের কাজ ছিল না।

* * *

আজকের ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করছে সমাজবাদ-সাম্যবাদ, আর ধনতন্ত্র পতনোন্মুখ অবস্থায় স্বভাবগত লোভ-লোলুপতার শেষ কৌশল প্রয়োগের অপচেষ্টায় যথাশক্তি লিপ্ত হয়ে রয়েছে। যারা বলে আমেরিকা বা পশ্চিম জার্মানীর অর্থবল ধনিক ব্যবস্থার জীবনীশক্তি ও সাফল্যের প্রমাণ, তারা ভ্রান্ত, বহুক্ষেত্রে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই তারা এরূপ সততা বর্জিত বক্তব্য প্রচার করে। ধনতন্ত্রে এখনও জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু, এই কথা বলে তারা যে ভাঁওতা দেয় তা সাধারণ মানুষের অজানা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি সুইডেন কিংবা ক্যানাডায় মাথা পিছু রোজগার যে

বেশি, তা হল তর্কাতীত। কিন্তু দারিদ্র্যের সমস্যা সেখানে মেটেনি। বেকারীর বিভীষিকা সেখানে অত্যন্ত বাস্তব, আর মানুষের প্রত্যাশা আপেক্ষিক বলে সেখানকার ধনী নির্ধনের মধ্যে সম্পদের তারতম্য এখনও একান্ত ক্লেশকর। তাছাড়া এই সব তথাকথিত অগ্রসর দেশগুলি তো অভাব দূর করতে পারেনি, তাকে রপ্তানি করে পাঠিয়েছে আমাদের মতো দেশে, যেখানকার সাধারণ জীবনের অবিচ্ছিন্ন দৈন্য হল 'অগ্রসর' দেশের দৌলতের প্রতিরূপ। তাই সেদিন ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ষষ্ঠ পল-এর মুখে শোনা গেল : "মানবজাতির অর্ধেকেরও বেশি প্রয়োজনমতো খাদ্য থেকে বঞ্চিত।" তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পক্ষ থেকে বিবৃতি আসে যে সারা দুনিয়া আজ প্রচণ্ড খাদ্যাভাব সমস্যার সম্মুখীন। ঐ সংস্থার বর্তমান কর্ণধার শ্রী বি, আর, সেন সম্প্রতি জানিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৩৮ জন যথেষ্ট খাদ্য পেত না, কিন্তু যুদ্ধের পর থেকে এই ক্ষুধিতের অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা উনষাট (৫৯)। জগদ্বাসীদের অর্ধেকেরও বেশি অর্ধাশনে বাস করে যে সামাজিক ব্যবস্থার অপদার্থতা ও হৃদয়হীনতার জন্য, সেই ব্যবস্থা ধিক্‌কৃত। ইতিহাসের বিচারে তার প্রাণদণ্ডাদেশ নির্গত হয়ে গেছে।

সোভিয়েট দেশকে সেদিন একজন লেখক যেন বলেছেন "ভবিষ্যতের মাতৃভূমি"—সমাজবাদ প্রথম সেদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সর্ব বিশ্বের কাছে এই অনির্বাণ আলোকবর্তিকা নতুন জীবনের প্রতীক ও সংকেত ও প্রতিশ্রুতির মতো বিরাজ করছে। তাকে চলতে হয়েছে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায়, হাজার মুশকিলের সঙ্গে তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে তার বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডে অনেক ভ্রান্তি আর ত্রুটি আর অপরাধ যে প্রায় অনিবার্য কারণে ঘটেছে, তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি সেদেশ থেকেই এসেছে, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হল এই যে দুনিয়া জোড়া শত্রুশক্তির ঘোর বৈরিতা এবং একান্ত অনলস আক্রমণকে প্রতিহত করে আজ সোভিয়েট ইতিহাসের মঞ্চে সগৌরবে সমাসীন, দেশে দেশে তার বান্ধব, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সর্বদেশের জনতার সঙ্গে মমতার রাখী সে বেঁধেছে, তার উদ্যোগে চলেছে মানুষের জয়যাত্রা, চাঁদে অভিযান, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানব গরিমার পর্যটন : অন্ধকার একটা দিক সেদেশেও আছে, কিন্তু বহুগুণ-সন্নিপাতে তার দোষত্রুটি ইন্দুকিরণে নিমজ্জিত তমসার মতো অপসৃত। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ আজ ধনতন্ত্রের কবলমুক্ত।

তাই দেখি—সুদূর মোঙ্গোলিয়ার জনগণতন্ত্রে মিলিত, সংহত মানবপ্রচেষ্টার বিস্ময়। তাই দেখি মহাচীনে নবজীবনের উল্লাস, যার মাত্রাধিক্য দেখে শুধুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত (কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে পুলকিত!) হলে অবিবেচনারই পরিচয় দেওয়া হবে। বিপ্লবের জোয়ার যখন আসে, তখন তা চুলচেরা মাপ আর সতর্ক হিসাবের তোয়াক্কা রাখে না; এই হল ইতিহাসের পৌনঃপুনিক সাক্ষ্য। আর আমরা এদেশে কমিউনিস্ট চীন সম্পর্কে বিরাগ বোধ করলেও ভুলি কেমন করে যে মহাচীনের ভূখণ্ডে এই বিপুল বিপ্লব ঘটেছে বলেই আজ আমাদের মতো দেশ মস্ত এক বিপদ থেকে বাঁচবার সম্ভাবনা পেয়েছে। কল্পনা করা যাক যে নয়া সাম্রাজ্যবাদ মহাচীনে জেঁকে বসার মতো অবস্থায় আছে, সেখানে বিপ্লব হয় নি কিংবা তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে—তাই যদি ঘটত তো ভারতের অর্থব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি ব্যাপার অবশ্যই সম্পূর্ণ মার্কিন তাঁবেদারীর আওতায় আটক পড়ত। এমনই আমরা আমেরিকার প্রসাদভিক্ষু হয়ে দেশের স্বাধীন সত্তাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছি, চীন যদি জনশক্তির বিরাট প্রাচীর হয়ে আজ না দাঁড়াত তো আমরা দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে পেতাম কোথায়?

সমাজবাদ-সাম্যবাদের মহিমা দেখছি কিউবার উদ্দীপ্ত প্রাণবন্যায় আর ভিয়েৎনামের অসমসাহস মূর্তিতে, দেখছি এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার অগণিত সফল-অসফল-অর্ধসফল অভ্যুত্থানে, দেখছি আরও কত ক্ষেত্রে যার তালিকাপ্রণয়ন এখানে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। ধনতন্ত্রের নয়া সাম্রাজ্যবাদী রূপের বীভৎস বিভীষিকা দেখছি ভিয়েৎনামে, দেখছি তার হাজার দুর্বৃত্ত চক্রান্তে, দেখছি সাহায্যদাতার ছদ্মবেশে পরদেশগ্রাসীর অবিরাম দৌরাত্ম্যে। কিন্তু জগৎ জুড়ে মানুষ আজ জেগেছে, এখনও তার পথে বাধা আর বৈরিতার অবসান ঘটতে সময় অবশ্য লাগবে, কিন্তু ইতিহাস ধনতন্ত্রের ললাটে আজ পরাজয়ের পাঞ্জা এঁকে দিয়েছে, সে লড়বে আর কত দিন?

(নতুন পরিবেশে আমরা সবাই বাস করছি দেশে দেশে। আমাদের এই ভারতবর্ষে সর্বজনের সুস্থ, স্বচ্ছন্দ, সচেতন, মানবিক জীবনযাত্রার পথ সুগম করার কাজ ও চিন্তাকে সংহতি ও কল্যাণের পথে সংগঠিত করতে "নতুন পরিবেশ" অগ্রণী ভূমিকায় যেন নামতে পারে।

বিপ্লব, আবেগ ও প্রজ্ঞা

"রাজর্ষি" লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ রেলগাড়িতে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিশুকণ্ঠে শুনেছিলেন, "এত রক্ত কেন?" আমরা যখন "রাজর্ষি" পড়েছি, তখনো হাসি ও তাতা-র কথা ভুলতে পারিনি। আজও যেন কানে শোনা যায় শিশুর সরল মনের চকিত আর্তি—"এত রক্ত কেন?"

মানুষের এতদিনকার ইতিহাসও ঐ প্রশ্ন তুলে ধরেছে—যুগযুগান্তের অজস্র বিড়ম্বনা, শুধু রক্তপাত নয়, আরও কত দুঃখ কত ব্যথা জীবনকে জর্জর করে রেখেছে। আকাশচারী কল্পনায় মানুষ সান্ত্বনা খুঁজেছে; ধর্মবিশ্বাস আর অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্ববিধ ক্লেশহরণের প্রয়াস পেয়েছে, মোহাঞ্জন প্রলেপের অন্বেষণ করেছে, যেখানে উদ্দীপ্ত চেতনা সেখানে বুদ্ধের ন্যায় বলেছে নিজের কাছে প্রদীপের মতো হও ("আত্ম-দীপো ভব")। জীবের দুঃখ দূর করার প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে সিদ্ধার্থ রাজগৃহ ত্যাগ করেছিলেন, সাধনাবলে সম্বুদ্ধিও অর্জন করেছিলেন কিন্তু মূল প্রশ্নের সমাধান আজও হয়নি—ব্যক্তিবিশেষ জীবন্মুক্তির অনুভূতি কতটা পেয়েছেন তা ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে আসে না। তবে এটা ঠিক যে জীবনকে জয় করতে আজও মানুষ পারেনি। শিল্পের কল্পলোকে কিংবা মানসিকতার অন্য ক্ষেত্রে হয় তো তুরীয় মার্গে স্বল্প বিচরণ সম্ভব। কিন্তু জীবনের সামান্য অর্থাৎ সর্বগ্রাহ্য স্তরে তার সম্ভাবনা নেই। আজও তাই "অমাবস্যার কারা" কবির "ভুবন" "লুপ্ত" করে রেখেছে, "অমানুষতা"র অভিযান আজও সম্পূর্ণ ব্যাহত নয়। মানবসত্তা আজও শীর্ণ, সঙ্কীর্ণ, বহুল পরিমাণে ব্যর্থ।

এই দুঃসহ অবস্থিতি থেকে পরিত্রাণের সংগ্রাম ইতিহাসকে দিয়েছে তার পৌনঃপুনিক দীপ্তি। স্তর থেকে স্তরান্তরে সমাজের উত্তরণ তাই ঘটেছে, মানুষ চলেছে এগিয়ে, মন্ত্র নিয়েছে "চরৈবেতি, চরৈবেতি"। সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বে জীবন হয়েছে জঙ্গম, নিয়ত গতিশীল, স্তব্ধতার পরিপন্থী। মাঝেমাঝে যখন বিশেষ এক যুগের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে তখন এসেছে যুগান্তর, ঘটেছে বিপ্লব। জন্ম নিয়েছে নূতন সমাজ। এ-বিপ্লব স্বয়ম্ভু নয়; 'আপনাতে

আপনি বিকশি' এর আবির্ভাব ঘটে না; স্বতঃস্ফূর্ত নয় এর উপস্থিতি। এ-বিপ্লবকে ঘটায় মানুষ, এর সাধকতম শক্তি হলো বহুজনের সংহত কর্মকাণ্ড, এর অভ্যুদয় হয় তখনই যখন সমষ্টির প্রয়োজনে ও প্রযত্নে জীবনের বহু রুদ্ধ দ্বার ভেঙে যায়, সাক্ষাৎ মেলে জ্যোতির্ময় নবযুগের। সহজে এ-ব্যাপার অবশ্য ঘটে না। সাধনা বিনা যেমন সিদ্ধি সম্ভব নয়, মূল্য দান বিনা প্রাপ্তি যোগও তেমনই সম্ভব নয়। পূর্বতন সমাজব্যবস্থাকে অসহনীয় ভেবে এবং জেনে মানুষকে তাই বারবার লড়তে হয়েছে। লড়্‌বার জন্যই ভাবতে হয়েছে। পথের সন্ধান করতে হয়েছে, নানাবিধ কাজে নাম্‌তে হয়েছে। কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মোৎসর্গ, বহুজনের সংহতি সাধনে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে চিন্তা ও কর্ম ব্যাপারে নেতৃত্ব অবশ্যই এসেছে। কিন্তু ইতিহাসের নায়ক ব্যক্তি নয়। নায়ক হলো জনতা। রথের রশি জনতার হাতে না থাকলে ইতিহাসের চাকা নড়তে পারেনি; অচলায়তনকে সচল করতে পেরেছে মানুষের সমবেত, সংগঠিত, সুসংহত শক্তি। এই শক্তির পরিমাণ ও গুণ, বিস্তার ও চরিত্র স্বভাবতই বিপ্লবকে চিহ্নিত করে, জায়মান সমাজের গতি প্রকৃতিকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। ইতিহাস তাই চলেছে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায়। তাই যুগসন্ধিক্ষণে একান্ত প্রয়োজন প্রখর ও গভীর সমাজ চেতনা, প্রয়োজন নবকালের পদধ্বনি শুনতে পাবার ক্ষমতা, প্রয়োজন বাস্তব বোধ, প্রয়োজন প্রকৃত সামাজিক সদিচ্ছা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ। কোনো বিপ্লবই অবশ্য চূড়ান্ত নয়; ইতিহাসে পূর্ণচ্ছেদ ঘট্‌লে তো পূর্ণচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে থাকবার মতোই বিপর্যয় ও বিলুপ্তি। তবে বিপ্লবের আপেক্ষিক যুগানুগ সার্থকতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে উপরোক্ত শর্ত পূরণের উপর।

বিপ্লবের মূল্য অবশ্য দিতেই হয়—মানুষ চা'ক্‌ বা না চা'ক্‌, ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়েই উত্তরণের মূল্য দিতে হয়েছে। একেবারে আদিম যুগে প্রাণ রাখতেই মানুষ প্রাণান্ত হতো, জীবনধারণের পক্ষে মাত্র ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাবার মতো উৎপাদনক্ষমতা তার ছিল বলে সমাজে শান্তি না থাকুক্‌, একটা স্থানু ভাব ছিল। কিন্তু কালের গতি এবং দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতার ফলে ঐ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পেল, কিঞ্চিৎ হলেও উদ্‌বৃত্ত কিছু উৎপন্ন হতে লাগ্‌ল, উদ্ভব হলো শ্রেণীবিভক্তির, সমাজের উদ্‌বৃত্ত সম্পত্তি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তগত হতে লাগ্‌ল। ক্রমশ দেখা গেল জাদুকর আর পুরোহিত আর গণক আর

সপারিষদ রাজা এসে হাজির হচ্ছে, মানুষে মানুষে তারতম্য সমাজের রীতিনীতি নির্ধারণ করছে, শ্রেণীবৈষম্য প্রকট হচ্ছে, মুষ্টিমেয় সমাজপতির শাসন ও শোষণের পত্তন হচ্ছে। আদিম মানুষের ইতিবৃত্তকে স্বর্ণযুগের কাহিনী বলে বহু বর্ণনা আছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের অস্পষ্ট প্রত্যুষেই জীবনের যন্ত্রণা মানুষকে ভোগ করতে হয়েছে। "লেভায়াথান্"—প্রণেতা হব্স্-এর রচনায় আছে যে মানুষের জীবন তখন ছিল "একক' শ্রীহীন, পশুতুল্য এবং সংক্ষিপ্ত" (Solitary, nasty, brutish and short")। একেবারে আদিযুগে শ্রেণীভেদ ছিল না কিন্তু জীবন ছিল দুঃসাধ্য ; কবিকল্পনায় তৎকালীন সারল্য মোহনীয় প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও এ-কথা ভুল্লে চলে না। তারপর বহুবর্ষব্যাপী পরিবর্তনের ফলে এল শ্রেণীশাসন—যার হেরফের দেখা গেছে গোলামী ব্যবস্থায়, ভূমিদাসপ্রথায়, সামন্ততন্ত্রে, ধনবাদী কর্তৃত্বে। যুগ যুগ ধরে মানুষের ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত এই ধারাকে পাল্টে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় সমাজদেহের পাঁজর থেকে লোভ নামক মৃত্যুশেলকে উৎপাটিত করে, নূতন শ্রেণীবিহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নভেম্বর বিপ্লব (১৯১৭) থেকে দুনিয়া জুড়ে চলেছে। এ-কাজ সহজ নয়। সস্তায় কিস্তি মাৎ হয় না, চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ সম্ভব নয়—সুতরাং আশ্চর্য হবার কথা নয় যে এখনও সকল অন্ধকারের অবসান হয়নি, সকল বাধা অপসৃত হয়নি। কিন্তু এ-কাজের মূলগত গরিমাই আজ পৃথিবীর ইতিহাসকে ভাস্বর করে রেখেছে— "নতশির মূক সবে ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী" এ-ছবি আজ সত্য নয়, দেশে দেশে বহু বর্ণ বহু জাতি বহু ধারার মানুষ আজ জেগেছে। নবজীবনে উত্তরণের জন্য মূল্য দিতে পরাঙ্‌মুখ তারা নয়, ইতিহাসের নায়ক আজ তারা।

মার্ক্সীয় বিচার বলে যে প্রাচীন সমাজদেহের অভ্যন্তরেই নূতন সমাজ জন্মের জন্য অপেক্ষা করছে, সমাজব্যবস্থারই অন্তর্ভূত বহু বৈপরীত্য পরিপক্ক হয়ে ওঠার ফলে নবজাতকের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব থেকে বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে এবং সংগঠিত সংহতি শক্তি ব্যবহার করে সমাজের অনিবার্য নবজন্মকে মানুষ যদি অভ্যর্থনা করতে পারে, তাহলে জন্মকালীন যে অকাট্য কষ্ট ও ক্লেদ তার অনেকাংশ নিবারিত হওয়া সম্ভব। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগে প্রগতির ফলে যেমন বিনা যন্ত্রণায় গর্ভধারিণীর দেহ থেকে প্রসবের ব্যবস্থার কথা শোনা যায়, তেমনই বহুজনের সমাজচেতনার প্রকৃত উদ্রেক

ঘটলে পূর্বতন বিপ্লবের তুলনায় রক্তক্ষয় এবং অন্যান্য মূল্য কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা। এ-কথা মনে রেখেই স্বকীয় সরস ভঙ্গীতে বার্ণার্ড শ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এক ভাষণে বলেন: "বিপ্লবের জন্য আমি অধীর। কাল যদি বিপ্লব হয় তো আমি আহ্লাদে আটখানা হব। তবে গড়ের হিসাবে সাধারণ মানুষের মতো আমিও কাপুরুষ। তাই চাই আপনারা যথাসম্ভব ভদ্রভাবে বিপ্লব ঘটিয়ে দিন!" এটাও মনে রাখতে হবে যে ইতিমধ্যে দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। রুশ বিপ্লব ইতিহাসের বনিয়াদকে নাড়া দিয়েছে, চীন বিপ্লব (১৯৪৯) প্রাচ্য ভূখণ্ডে নূতন জীবন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, কিউবা প্রভৃতি নূতন বৈভবের সূচনা করেছে। এশিয়া আফ্রিকা লাতিন-আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি এবং তার সার্থকতা সাধনের অবিরাম অভিযান চলেছে, সাম্রাজ্যবাদ পরাজয়ের ধাক্কায় ভোল্ বদলাতে বাধ্য হচ্ছে, তার কলাকৌশল ফন্দি-ফিকির ক্রমশ ব্যর্থ হতে থাকছে, সমাজবাদের শক্তিই যে তার আভ্যন্তরীন অথচ সাময়িক বৈষম্য সত্ত্বেও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে চলেছে তাই আজ ইতিহাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এমন পরিস্থিতিতে বিপ্লবের রক্তমূল্য পূর্বাপেক্ষা স্বল্প হওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনায় আস্থা রাখায় ভ্রান্তি নেই।

ভ্রান্তি ঘটে যদি মার্কসবাদ এ-বিষয়ে প্রখর সতর্কতার যে শিক্ষা দেয় তা ভুলে যাই। যদি ভাবি যে ভদ্র, শিষ্ট, শান্ত, মন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়া চলে, যদি ভাবি ভোট কিম্বা অনুরূপ উপায়ে অধিকাংশের অভিমত মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে সংগ্রহ করে বিপ্লবের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যায়, যদি শ্রেণীশত্রুর শক্তি ও স্বার্থসাধনে অপরিসীম ক্রূরতা অবলম্বনের সঙ্কল্প সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ি। বামপন্থার নামে অকারণ, অশোভন এবং অসার্থক হঠকারিতার আতিশয্য লক্ষ্য করে তাকে লেনিনের অনুসরণে "শৈশবের ব্যারাম" অভিহিত করা অবশ্যই ভুল নয়। কিন্তু ভ্রান্তি ঘটে যদি বিস্মৃত হই মার্কসীয় নীতির শিক্ষা যে, বিপ্লবের সময় যখন নিকট তখন বিপ্লব থেকে পরাঙ্‌মুখ থাকা হলো সময় হওয়ার পূর্বেই বৈপ্লবিক আতিশয্যে মত্ত হওয়ার চেয়ে বড়ো অপরাধ। বিপ্লব-পরাঙমুখিতার উদাহরণ মার্কস তাঁর জীবদ্দশাতেই দেখে বলেছিলেন তাদের সম্বন্ধে: "বীজ পুঁতেছিলাম দানবের, আর ফসল তুলছি পতঙ্গের!" সমাজে আজ যারা মালিক তারা বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়তে রাজী নয়। জমির লড়াইয়ে এই মুহূর্তেই তো তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত মিলছে। ভালোমানুষের মতো হার মানবে না তারা, এবং

তাই সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ত প্রয়োজন। যুগের হাওয়া শুভবুদ্ধি মানুষের পক্ষে বলে সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস করতে পারা নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু সংগ্রাম এড়িয়ে যেতে পারব ভাবা বাতুলতা।

এজন্যই আজ যুবমনের মধ্যে কিছুটা বেপরোয়া কায়দায় প্রাণ দেওয়া নেওয়ার জন্য তৈরী থাকার মনোভাবকে তাচ্ছিল্য করা অন্যায়। ভীরু অপবাদে আহত বোধ করে বাঙালি তরুণ একদা যেমন বোমা পিস্তল হাতে নিয়ে অকুতোভয় যাত্রা শুরু করেছিল, তেমনই মান্ধাতাগন্ধী এই দেশে মানুষের দুর্ভোগ কাটছে না অথচ বিপ্লব ব্যাপারীদের মধ্যেই বিবাদ বিভেদ এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিপ্লব বিমুখিতা আর নির্বাচনী রাজনীতির সুরক্ষিত পথে বিচরণপ্রবণতা দেখে সেই তরুণদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে আশ্চর্য হবার কথা আছে কি? আর যদি সত্যই পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ভরসা রাখি তো এ-ঘটনায় অতিরিক্ত বিচলিত হওয়ারও কোনো হেতু থাকে কি?

অস্বীকার করা চলে না যে আমাদের বর্তমান রাজনীতিতে শুধু তত্ত্বের স্পর্শরহিত উষরতা আসেনি। সঙ্গে সঙ্গে যেন এসেছে একপ্রকার ক্লীবতা, যার বিপক্ষে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন সজীব মন আজ বেশি অনুভব করছে। মহাত্মা কবিরের সাধনা ছিল 'বিনা খড়্গের সংগ্রাম' কিন্তু সকলেতো মানসিকতার ঐ স্তরে অবস্থান করে না। দেশের চারদিকে তাকিয়ে চেতন অবচেতন মনে অর্জুনকে সম্বোধন করে কৃষ্ণের উক্তি স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক; "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ।" বিপ্লবী বাক্য ব্যবহারে পারঙগম হলেও বিপ্লবী কর্ম বিনা সবই ব্যর্থ। যেমন "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ"। তেমনই বিপ্লব তো কয়েকটা ধ্বনির কল্যাণে আসবে না। বিপ্লবের জয় আপনা থেকে আসবে না। সংগ্রামী মানুষকে একত্র হয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে হাতে ধরে টেনে আনতে হবে। রেশমের দস্তানা পরে এ-লড়াই নয়, গোলাপজল ছড়িয়ে এ-যুদ্ধ নয়। তাই উচ্চৈঃস্বরে অনেকে আজ বলছেন, রক্ত দেখলে যারা মূর্চ্ছা যায়, বিশেষত নিজের গায়ের রক্ত, তারা অন্দর মহলে চলে যাক্।

অতিবিপ্লবীদের বিভ্রান্তি যাই হোক না কেন, তাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে সাম্রাজ্যবাদী এবং তার অনুচরদের পাশবিকতার সম্বন্ধে গা-সওয়া ভাব দেখানো একটা বড়ো দরের অপরাধ। সর্ব দেশে, বিশেষত আফ্রিকার মতো

ভূভাগে, সাম্রাজ্যবাদের কীর্তিকলাপ দেখে ফরাসী মনীষী সার্ত্র্‌ (Sartre) কিছুকাল আগে বলেন যে "অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য চোখের সামনে খুলে গিয়েছে যা হলো পাশ্চাত্য মানবিকতার আবরণমুক্ত নগ্নতার দৃশ্য"। ফ্রান্‌জ্‌ ফানঁ-র মতো মহাজন বলেছেন, শুধু হিংসার পথকে নিন্দা করলে তো চলবে না, এতকালের জমানো অন্যায়ের প্রতিকারে অস্ত্রধারণ একান্ত সঙ্গত, নইলে মানুষের মুক্তি আসবে, নবজন্ম ঘটবে কেমন করে? নজরুলের গানে "মরণ ভীত মানুষ-মেয়ের ভীতি" "হরণ" করার ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো মানুষের অভাব হলেতো সমাজ পঙ্গু, বিকল, ব্যর্থ। "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন", এমন বোধ ব্যাপক না হলে কি বলা যায়, দিন আগত ঐ? মৃত্যু যদি না ঘটে তো পুনর্জন্ম হবে কোথা থেকে?

"দ্বিজেন্দ্র দীপালি" গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপ কুমার রায় তাঁর পিতৃদেবের "আমার দেশ" গানটির রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন যে সাবধানী বন্ধুদের পরামর্শে (এবং রাজপুরুষ হিসাবে কবিকে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কার কথা তোলার ফলে) "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ" "পংক্তিটি বদলে বসাতে হয়, "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ"। এতে কবির মনে বেদনার অন্ত ছিল না, কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় তিনি ছিলেন নিরুপায়। দেশে যারা নূতন প্রভাত আনতে চায় "হৃদয়-রক্ত শেষ" করার প্রতিজ্ঞা না নিয়ে তো উপায়ান্তর নেই।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন—এ-হলো এ-দেশের বহুদিনের কথা। কিন্তু বিপ্লবের যে-মন্ত্র এনেছে মার্কস্‌বাদ, তাতে আবেগের আতিশয্যে লক্ষ্যভ্রংশ সম্বন্ধে নিয়ত অবহিতি একটা প্রধান কথা। প্রচুর সদ্বুদ্ধি সত্ত্বেও উচ্ছ্বাসপ্রবণতা প্রায়ই বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং অগ্রগতিকে বিপন্ন করার কারণ হয়। মার্কস্‌-এর জীবৎকালেই নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তারা এই আতিশয্যকে ব্যবহার করতে গিয়ে বহু অনর্থের সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ শতকের আদিতে ফরাসী চিন্তানায়ক Sorel সমাজবাদী ঐক্যে কথঞ্চিৎ ফাটল ঘটিয়েছিলেন; তাঁর প্রচারিত তত্ত্বে হিংসাকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছিল—হিংসাই বুঝি জীবনের মলিনতা দূর করতে পারে, জগতে নবজীবন সঞ্চার করতে পারে, প্রাক্তন দাস ও প্রভু উভয়কেই প্রকৃত মনুষ্যে রূপান্তর করার শক্তি রাখে। বৈপ্লবিক কর্মের বাস্তব পরীক্ষায় কিন্তু এ-ধরণের চিত্তবৃত্তি যে বিপদ এবং ব্যর্থতা টেনে আনে তা দেখা

দেশে দেশে বান্ধব

শারদীয় সংখ্যা "পরিচয়"-এর জন্য লেখা না দিয়ে রেহাই নেই। তাই নিতান্ত তাড়াহুড়া সত্ত্বেও লিখতে বসা গেছে। এই তাড়াহুড়ার বিশেষ যে হেতু, তা থেকেই সংগ্রহ করছি প্রবন্ধের খোরাক। অনতিবিলম্বে যেতে হবে সোভিয়েত দেশে কাজাক্‌স্তানের রাজধানী আল্‌মা-আটায় আয়োজিত লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক আলোচনায় যোগদানের আমন্ত্রণে। এবার নিয়ে ছ'বার যাওয়া হবে সোভিয়েট দেশে—যা ছিল কিছুকাল আগে পর্যন্ত একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার। মনে পড়ছে ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারী ফৌজ যখন হঠাৎ সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সোভিয়েতভূমি আক্রমণ এবং অধিকারের চেষ্টায়, তখন কলকাতায় আমরা কয়েকজন মিলে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠন করেছিলাম, যার বর্তমান ওয়ারিসান্ হলো ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতি। ১৯৪২ সালে কথা হয়েছিল সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে কয়েকজনের ঐ দেশে যাওয়ার। পশ্চিম বাঙলার বর্তমান অ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেল স্নেহাংশু আচার্য, সম্প্রতি সি-এস-আই-আর-এর প্রধান অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ডক্টর হুমায়ন জহীর এবং আমাকে সেজন্য প্রস্তুত হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সরকারী অনুমতি মেলে নি। (দেশ তখনও স্বাধীন নয়)। আর হয়তো সোভিয়েত পক্ষের যুদ্ধের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে অসুবিধাও ছিল। আবার ১৯৫১ সালে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম সোভিয়েতে যাবার—দেশ তখন স্বাধীন। জহরলাল নেহরু তখন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু কমিউনিস্ট বলে পাসপোর্ট পাই নি। সুখের বিষয়, স্বনামধন্য সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সেবার গেছ্‌লেন এবং ফিরে মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখতে পেরেছিলেন। যাই হোক্, তারপর নানা ঘাটে অনেক জল বয়ে গেছে, সোভিয়েত এবং ভারতবর্ষ দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত বেড়েছে, অনেকটা সহজ হয়েছে, তাই একাধিকবার সেখানে গেছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা আজ নগণ্য নয়।

করলেখায় কি বলে জানা নেই, কিন্তু কপালে ভ্রমণযোগ নিতান্ত কম ঘটে

নি স্বীকার করতে হবে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় যখন শিশুপাঠ্য বইয়ে "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"—জাতীয় কবিতার মাথায় গ্রাম্য দৃশ্যের ধ্যাবড়া ছবি দেখেই শহুরে জীবনে কিছুটা দমবন্ধ অবস্থা থেকেই যেন সেই পাতার উপর আছড়ে পড়তে ইচ্ছা হতো। এখনও মনে আছে অল্প বয়সে যখন রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রায় শূন্য, তখন শুনতাম শিয়ালদহ থেকে হালিশহর (যেখানে আমাদের আদি বাস) হল ছাব্বিশ মাইল আর হাওড়া থেকে দেওঘর ২০৫ মাইল—দেওঘরের সঙ্গে আমাদের প্রায় যেন একটা পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল, মাঝে মাঝে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে দেখতাম বৈদ্যনাথ মন্দিরের নধরকান্তি মিষ্টভাষী পাণ্ডাদের। রেলে ক'বার এবং কতটা ঘোরা গেছে, তা ছিল তখনকার মনের উপজীব্য। পরে ছাত্রাবস্থায় কিছুটা সাবালক হওয়ার পর যাওয়া গেছে পুরী, কোনারক, চিল্‌কা, ওয়ালটেয়র, দার্জিলিং—তখন ভারতবর্ষের অনন্তপার মধুরিমার আস্বাদ কিছুটা মিলতে আরম্ভ হয়েছে, প্রশ্ন উঠেছে মনে—বেশি ভালো লেগেছে হিমালয়ের বিভূতি না সমুদ্রের উচ্ছল আত্মীয়তা? পরাধীনতার নিরন্তর বেদনা ছিল আমাদের তখনকার সাথী—বর্তমানকে প্রায় যেন অস্বীকার করতে চাইতাম অতীতের দিকে চেয়ে। কোনারকের সূর্যমন্দির তাই যেন অন্তরকে অভিভূত করেছিল, ভারতের সাধারণ মানুষের হাতে গড়া মূর্তি আর সৌধ বিশ্বের সৌন্দর্যকে নিথর প্রস্তরে অমন বিস্ময়করভাবে বন্দী এবং মুক্ত করে রেখেছে দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল। সে-গর্ব আজও মন থেকে যায় নি—পরবর্তীকালে "হিমবৎ সেতু পর্যন্তম্" "গঙ্গামৌক্তিকহারিণী" আমাদের এই দেশের এক থেকে অপর প্রান্তে যাবার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু কোনারকের মায়া এখনও কেমন যেন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে।

অধ্যয়নপর্ব সাঙ্গ করার জন্য যেতে হয়েছে ইয়োরোপে—কিছুটা সভয়ে কারণ সাংসারিক অকর্মণ্যতা আর অতিরিক্ত আত্মসচেতনতার চাপে দিন-যাপনের গ্লানি সততই আমাকে কিঞ্চিৎ বিব্রত করে রাখে। গিয়েছিলাম সরকারী বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ; লণ্ডন পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন অপর বৃত্তিধারী, উদ্ভিদ্‌বিদ্বান্ হেদায়তুল্লা, বর্ধমানে বাড়ি, হাসিখুসি সাদাসিধে মানুষ, আজ তিনি কোথায় ঠিক জানি না। ইংলণ্ড সম্বন্ধে মোহ আমাদের কালের আগেই শিক্ষিতমহলে কেটে গিয়েছিল ; 'বিলেত দেশটা মাটির' এটা জানতাম আর সঙ্গে সঙ্গে মনে ছিল সেদিনকার জাত্যভিমানের অন্তর্দাহ—ভুলতে পারি

না তখন বিদেশ যেতে হত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান পাসপোর্ট' নিয়ে, প্রায়-গান্ধীবাদী মনকে সর্বদাই যেন একটা অস্বস্তির বোঝা বইতে হতো। তবুও স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই ইয়োরোপের কাছে ঋণের কথা। কম বয়সে প্রাকৃতিক শোভা মনকে মাতাবার ক্ষমতা বিশেষভাবে রাখে, কিন্তু শুধু ইয়োরোপের বহুবিচিত্র নিসর্গসৌন্দর্যের কথাই ভাবছি না। ঢের বেশি ভাবছি মনের উপর ইয়োরোপের স্পর্শ যা অন্তত অনেকগুলো ব্যাপারে নূতন চেতনার অঞ্জনশলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলিত করে দিয়েছিল। চিন্তা ও কর্মের যে প্রাণবন্ত প্রকাশ এদেশে দুর্লভ তার সাক্ষাৎ সেখানে পাওয়ার মূল্যকে ছোট করে দেখতে কখনও পারব না। ভারতবর্ষের গভীরে আমাদের সত্তার শিকড়, কিন্তু স্বীকার না করে গত্যন্তর নেই যে কিছুটা মান্ধাতাগন্ধী এদেশে তুরীয় মার্গে বিচরণশক্তি বিনা মুক্তির আস্বাদ অতি দুরূহ বস্তু। পুরো একটা বই না লিখলে ব্যাপারটা বোধগম্য করা হয়তো সম্ভব হয় না। কিন্তু এটা অযথার্থ নয় যে আমাদের মতো দেশ থেকে গিয়ে মনে হয় যে ইয়োরোপ যেখানে বরণীয় সেখানে এই মরজগতেই মানুষের মহিমা ও মুক্তি হলো তার একান্ত অভীপ্সা। শিল্পসাহিত্যের গরিমায় এবং সাধারণ সামাজিক সম্পর্কে বিশেষত নরনারীর সখ্যবন্ধনে যে সহজ, শোভন সাবলীলতা সেখানে সম্ভব, তাতে এই মুক্তিপ্রয়াসেরই প্রকাশ। প্রাচ্যজগতে ইয়োরোপীয় দানবিকতার অভিজ্ঞতা আমাদের মনে অপরিসীম তিক্ততা ও যন্ত্রণা এনে দিয়েছে বটে, কিন্তু ইয়োরোপের যে-ঐশ্বর্য তাকে জগজ্জয়ের পথে ঠেলেছে তার মধ্যে নিখাদ শ্রদ্ধার উপাদানেরও অভাব নেই।

প্রায় বছরপাঁচেক বিদেশে কাটিয়ে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের সস্নেহ আহ্বানে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলাম। মার্কসবাদ সম্পর্কিত কয়েকখানা আমার বই কাস্টম্‌স্‌ কর্তৃপক্ষ নির্বোধের মতো আটকেছিল বলে লণ্ডনের "নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান"-এ এক পত্র লিখেছিলাম (ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী প্রায় যাবার উপক্রম ঘটে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণনের হস্তক্ষেপে রেহাই পাই!)। তাতে বলি, 'ইংলণ্ডে জীবনের কয়েকটা সুখী বৎসর কাটিয়েছি, সে দেশের মানুষকে বন্ধু বলে ডেকেছি। সেদেশের দৃশ্যে চোখ জুড়িয়েছে। সেখানকার ধ্বনি কানে লেগে আছে। কিন্তু আমাদের এই দুই দেশের যে সম্পর্ক—তাকে ঘৃণা করি আমার কায়মনোবাক্যে যত ঘৃণা আছে তাই দিয়ে।' এরই সঙ্গে মনে পড়ছে আমার গুরুস্থানীয় সুহৃৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের কথা। প্রায় যেন স্বদেশের প্রতি অভিমানভরে চল্লিশ

বৎসরাধিক কাল তিনি বিলাতে প্রবাসী—দেশে ফিরতে চান্‌ অথচ চান্‌ না, একবার বলেন আমাকে যে এই বর্ণবিদ্বেষের দেশের পোকাগুলোও আমার অস্থি চর্মে মুখ দেবেনা কিন্তু দেশে ফিরে কাজটা কি ঠিক্‌ করব? এ দেশের প্রকৃতই একটা মায়াবী রূপ আছে—যা আমার মতো লোকেরও মনে ধাক্কা দিয়েছিল যখন ১৯৫৬ সালে, কানাডা থেকে ফেরার পথে ৩২ বৎসর বাদে ইংলণ্ডে ঢুকে বুকের মধ্যে একটু যেন মোচড় বোধ করেছিলাম যখন লণ্ডন বিমানবন্দর থেকে বাসে চড়ে আসার পথে দেখি সরু রাস্তা, জবর ট্র্যাফিক্‌, ছোট বসতবাড়ির ভিড়, মাঝে মাঝে ছোটখাট খেলার মাঠ—কেমন যেন মনে হয়েছিল বুঝি নিজের দেশেই ফিরে এলাম।

কলেজে পড়তে পড়তে বোধহয় চোখে পড়েছিল সুনীতি চাটুজ্জে মশায়ের একটা ছোট্ট লেখা—তিনি বলেছিলেন যে নিজের স্বদেশ ছাড়াও দু'একটা অপর দেশ সম্বন্ধে আত্মীয়তাবোধ স্বাভাবিক, যেমন বিপ্লবের তদানীন্তন পীঠক্ষেত্র হিসাবে ফ্রান্স কিম্বা পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাগুরু প্রাচীন গ্রীসকে আমরা ভারতীয়রা যদি একটা বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে দেখি তো তা সম্পূর্ণ সঙ্গত। বিলাত যাবার আগে থেকে প্রাচীন গ্রীস সম্বন্ধে প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম; এর জন্য বহু পরিমাণে দায়ী বোধ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের তুলনাহীন অধ্যাপক কুরুভিলা জ্যাকারিয়া, যিনি ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে এবং বি-এ অনার্সে আমাদের খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীস সম্বন্ধে গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত বলতে পারি যে আমাদের স্কুলের হেড পণ্ডিত মশায় বিজয় ভট্টাচার্য এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং কুরুভিলা জ্যাকারিয়া শিক্ষাদানব্যাপারে আমার কাছে এক অতুলন ত্রিমূর্তি, দেশবিদেশে যাঁদের জুড়ি কখনও দেখি নি। যাই হোক্‌, অক্সফোর্ডে হাজির হতে না হতেই খেয়াল হলো যেমন করে হোক্‌ যেতে হবে অ্যাথেন্স্‌-এ, 'পার্থেনন' অন্তত দেখতে হবে। নজরে এল 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন—'হেলীনিক্‌ ট্রাভ্‌লার্স গীল্‌ড্‌' এক দল নিয়ে যাবে গ্রীসে, তার নেতা হবেন বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক গিলবার্ট মরে (Murray), আর প্রাচীন গ্রীসে যুক্তরাষ্ট্র গঠনপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ যে লিখে পাঠাবে তাকে বিনামূল্যে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনই নির্বুদ্ধি যে তখনই সব কাজ ফেলে ঐ প্রবন্ধ লিখতে লাগলাম, যদিও জানা উচিত ছিল যে ওদেশে ঐ বিষয়ে আমার চেয়ে সুনিপুণ ছাত্রের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না বলে এমন এক পারিতোষিক বাস্তবিকই ছিল

আমার নাগালের বাইরে। গ্রীসে যাওয়া আমার হলো না, আজ পর্যন্ত হয় নি—সেজন্য খেদও কিছুটা রয়ে গেছে। ছোটখাট সান্ত্বনা শুধু এই যে লেখাটি দেশের একজন অধ্যাপকের নামে একটি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল এবং তার ফলে কিঞ্চিৎ গবেষণার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য হওয়ায় তাঁর চাকরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। জ্ঞাতসারে এবং সানন্দেই আমি এই সামান্য সাহায্য তাঁকে করতে পেরেছিলাম, যদিও ন্যায়ের কঠোর বিচারে অন্যায়ই আমরা করেছিলাম।

ফ্রান্সে অবশ্য যেতে পেরেছি—ইংলণ্ড থেকে সেখানে যাওয়া অতি সহজ-সাধ্য। তাছাড়া প্যারিস না দেখে ফরাসী জীবনের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত না হয়ে ইয়োরোপে ঘুরে আসার মত বাতুলতা প্রায় নেই। অক্সফোর্ডে অধিষ্ঠানের ফলে লণ্ডনের সঙ্গে মোলাকাৎ খুব বেশি আমার হতো না, আর হলেও সচরাচর কুয়াসার ঘোমটা ভেদ করে তার গোমড়ামুখ তেমন ভালো লাগত না, অত বড় শহরে একাকিত্বের অনুভূতিও বোঝার মতো মনে হত। প্যারিসের চেহারা ছিল আলাদা, সেখানকার আকাশে বাতাসে ছড়ানো যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব আত্মীয়তার আবহাওয়া, অতি অল্প ফরাসী জ্ঞানের ফলে মাঝে মাঝে অসুবিধার সৃষ্টি হলেও তাকে গায়ে মাখার বালাই ছিল না। দেশের দক্ষিণে আল্‌প্‌স পর্বতমালার অদূরে গ্রনব্‌ল (Grenoble) শহরে মাসখানেক থেকেছি। বন্ধু হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে—যে ফরাসী পরিবারে ছিলাম তারা একবর্ণ ইংরাজী জান্‌ত না। স্বভাবত স্বল্পভাষী আমার পক্ষে সুবিধেই হয়েছিল তবে একটা সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম বাড়ির গিন্নীর কাছ থেকে—'Monsieur n'aime pas causer, mais quand il parle nous comprenons tout' অর্থাৎ আমি বেশি কথা বলতে ভালবাসি না তবে যখন কিছু বলি তখন তার সবটাই বুঝতে পারেন! বেপরোয়া হয়ে গড়গড় করে বলে যাওয়ার চেষ্টা বিনা অবশ্য বিদেশী ভাষায় বলার অভ্যাস কঠিন। সুতরাং সার্টিফিকেট প্রকৃতপক্ষে আমার সঙ্কোচবিহ্বল ব্যর্থতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড, ওয়েল্‌স্‌-এর নানা অঞ্চলে ঘুরেছি, একাদিক্রমে বহুদিন থাকা অবশ্য হয়েছে প্রধানত অক্সফোর্ডে। তাই ঐ শ্রুতকীর্তি বিদ্যায়তন সম্বন্ধে মমতা জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ওদেশে আমাদের কাছে অনেক সময় যেন কিছুটা কৃত্রিম লাগে। কারণ কোন কোন অঞ্চল বাদে প্রাকৃতিক দৃশ্যও যেন সযত্নবিন্যস্ত, মানুষের হাত না

থাকলেও যেন মনে হয় বুঝি মানুষের হাত কোথাও আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বর্ণনা করতে বসিনি, তা এই প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভবও নয়। তবে এটা ঠিক যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে ওদেশের বহিরাবরণের আড়ষ্টতা আমাদের চোখে একটু বেশি পরিমাণেই বিরস এমন কি রীতিমতো কটু মনে হওয়াও অস্বাভাবিক ছিল না। লণ্ডনের তো কথাই নেই, খাস্‌ অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়ন্ত্রিত 'লজিং হাউস্‌'-এও কদাচিৎ হলেও মাঝে মাঝে বর্ণবৈষম্যের সাক্ষাৎ মিলত। লণ্ডনে স্যুটকেস্‌ হাতে নিয়ে ঘর খুঁজতে গিয়ে প্রায় আমাদের সকলেই দেখেছি যে গৃহস্বামিনী পরম সৌজন্যে এবং স্মিতহাস্যে বললেন, ঘর খালি নেই। অথচ অনৃতকথন আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। বর্ণচেতনা ইংলণ্ডের তুলনায় ইয়োরোপের অন্যত্র কিছুটা কম; সাম্রাজ্যই এদিক থেকে ইংলণ্ডের কাল হয়েছে। কিন্তু এ-সত্ত্বেও সন্দেহ নেই সে-দেশে অগণিত নরনারী বর্ণ ব্যাপারে সুস্থ, সভ্য, মুক্ত মানসের অধিকারী। সন্দেহ নেই যে, বন্ধু বলে একবার গ্রহণ করলে সে দেশের মানুষ সম্পূর্ণ সততার সঙ্গেই তা করে থাকে। আর অক্সফোর্ডের মতো জায়গায় যে একটু ভাবে তার মনে শুধু সেখানকার অপরূপ নিসর্গশোভা দাগ কাটে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাতশো বছর ধরে একাগ্র জ্ঞানচর্চা পুরুষানুক্রমে চালিয়ে যাওয়ার ছবি ফুটে ওঠে। যাকে অক্স্‌ফোর্ডের অনুরাগীরা বলে জগতের সেরা রাস্তা সেই হাইস্ট্রীটে একাধিকবার দেখলাম স্বয়ং আইন্‌স্টাইন্‌কে, চায়ের টেবিলে প্রায় যেন সমান-সমান কায়দায় দীপ্তিমান আলোচনা শুনলাম বিজ্ঞানী অধ্যাপক মিল্‌ন্‌-এর কিম্বা ইতিহাসবিদ্‌ অধ্যাপক ক্লার্কের—১৯২৯ সালে কেম্ব্রিজে, সম্ভবত ট্রিনিটি কিম্বা কিংস্‌ কলেজের উঠোনে দেখেছিলাম বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞানসাধক জে-জে-টম্‌সন্‌কে।

বিলাত যাবার আগে নরওয়ের লেখকদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়েছিল—Hamsun, Johan Bojer তখন বাঙলাদেশে জনপ্রিয় যা নিয়ে 'শনিবারের চিঠি' তখনই ছিল বিরক্ত। নরওয়ে যাবার একটা ইচ্ছা তাই খুবই ছিল। আর গ্রীসের তুলনায় ইংলণ্ড থেকে ঢের বেশি কাছে বলে সেখানে যাওয়া এবং সমুদ্র যেখানে তার বহু বিস্তার করে স্থলভূমিতে বিশাল জলাধারের মায়া সৃষ্টি করেছে, সেই 'ফিয়র্ড' ('fjord') কয়েকটা দেখা সম্ভব হয়েছিল। গরম দেশ থেকে গেছি বলে বিশেষত মন চাইত শীতকালে বরফে ঢাকা সুইট্‌সরল্যাণ্ডের দৃশ্য দেখা—তাও সম্ভব হয়েছিল। গ্রীষ্মে নরওয়ে এবং গভীর শীতকালে সুইট্‌সরল্যাণ্ড যেতে পেরেছিলাম, ইংরেজী উভয় দেশেই খুব সহায়ক বলে

সুবিধা ছিল, সুইট্‌সারল্যাণ্ডে একটু-আধটু জার্মান বলারও সুযোগ মিলেছিল। উভয় দেশেই মনে হয়েছে মানুষ মানুষের আত্মীয় তার গাত্রচর্মের বর্ণ যাই হোক না কেন—বন্ধুভাবে সকল মানুষ সর্বদেশে জীবনযাপন করতে না পারার তো কোনো কারণ নেই।

ইয়োরোপে অন্যান্য দেশে গেছি—ইতালী, বেলজিয়ম, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, (এখানে সোশ্যালিস্ট দেশগুলির কথা আপাতত বাদ রাখছি)—এবং সর্বত্রই মনে হয়েছে মানুষের একাত্মতার কথা। ১৯৩২ সালে গেছি জার্মানীর পুরোনো শহর হাইডেলবর্গে—যেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় আর তার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অসম্ভব-প্রকাণ্ড 'বিয়র'-এর জালা হলো বিশ্ববিখ্যাত—ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা হয়েছে এক বেকার শ্রমিকের সঙ্গে, যে নিয়ে গেছে তার বাসায়, আমায় ক'দিন অতিথি হিসাবে রাখলে কিছু রোজগার হবে আশা করে। পরে শুনেছি সে ধর্মে ইহুদী যদিও জাতিতে খাঁটি জার্মান—দেখেছি সেখানে এক গ্রীক ছাত্রকে—গরীবের সংসার—স্নান করতে চাইলাম যখন, তখন জড়ো-করা কয়লা সরিয়ে 'বাথ-টব্‌' পরিষ্কার করে দিল। জার্মান অতি অল্প জানা থাকা সত্ত্বেও বাড়ির গিন্নীর কথার কিছু কম্‌তি ছিল না—এখনও মনে আছে কদিন পরে চলে যাবার সময় আমাকে বললেন, ইংলণ্ডে ফিরেই যেন তাঁকে আমার পৌঁছাবার খবর ("ankommen") পাঠাই। পরে ঐ পরিবারের কি হাল হয়েছিল জানিনা—শুনেছিলাম তারা সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমর্থক। হিটলার তখনও জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি—হিটলারীদের ছোট ছোট মিটিং সেখানে দেখেছি, বেশ মনে পড়ছে রাস্তার মাথায় ছোট্ট এক সভায় নাৎসি বক্তা আবেগ নিয়ে বলছে "Versuchen Sie einmal" ("আসুন আমরা একবার চেষ্টা করি…")। বহু বৎসর পরে, ১৯৫৭ সালে, সোশালিষ্ট পূর্ব জার্মানীতে গিয়ে মনে হয়েছে হাইডেলবার্গের কথা—ভেবেছি আবার জার্মানী এক হবে, মানবতার ভিত্তিতে, সকল তুচ্ছতা ও স্বার্থান্ধ নির্মমতাকে অতিক্রম করে। মানুষ তো সর্বদা প্রস্তুত, শুধু তাদের মরমে প্রবেশ করবে এমন কথা শোনাবার এবং তদনুসারে কাজে নামার লোকেরই তো আজও সর্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে অভাব।

সোশালিস্ট দেশগুলির কথা সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে বলব। সোভিয়েতের কর্মকাণ্ড চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য বারবার হয়েছে। পোলাণ্ড, পূর্ব-জার্মানী, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া দেখেছি—মনোমুগ্ধকর অনেক কিছুই সেখানে

দেখেছি। মোঙ্গোলিয়াতে যাওয়ার বিরল সুযোগ একবার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি—যেন জাদুমন্ত্রে বহুবিশ্রুত দেশকে অতীতের কারাবাস থেকে সমুজ্জ্বল বর্তমানে সম-সুযোগের ভিত্তিতে নবজীবন সংগঠনের মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করা হয়েছে। মহাচীনে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম ১৯৫১ সালে—কিন্তু তখন ছিল আমাদের মতো ব্যক্তির পথে বহু অবান্তর বাধা—স্বাধীন ভারতের কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট দিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। সোশালিস্ট 'দুনিয়া সম্বন্ধে যা জেনেছি বা জেনেছি বলে অনুমান করি, তার কিয়দংশ হয়তো ভবিষ্যতে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব হবে না।

ধনিক জগতে মাথাপিছু রোজগারের বিচারে অগ্রগণ্য দুই দেশে যেতে পেরেছি—অস্ট্রেলিয়া (১৯৫৯) আর ক্যানাডা (১৯৫৬)। অস্ট্রেলিয়ার অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিকাংশে গিয়েছি পার্লামেণ্টারী দলের সদস্য হিসাবে—কোথাও কোথাও, বিশেষ করে প্রাকৃতিক শোভায় ভরপুর টাস্‌মানিয়া দ্বীপে দেখেছি হুবহু পঞ্চাশ বছর আগেকার ইংলণ্ডের ছবি। ক্যানাডা থেকে অভ্যাগত এম-পি'রা অসঙ্কোচে মন্তব্য করতেও ছাড়েননি—এসব পুরোনো ইংরেজ কেতা আজ অচল। হোটেলে 'সেণ্ট্রাল হীটিং' চাই, বাইরে যতই ঠাণ্ডা হোক্‌ ভিতরে গরম না হলেই নয়। নতুবা আমেরিকান মহাদেশ থেকে 'ট্যুরিষ্ট' আসতে চাইবে না! আমার চোখে চমৎকার লেগেছিল ঘরে 'ফায়ার-প্লেস'-এ আগুন, কোথাও কোথাও কাঠের আগুন (log-fire), যার চকমকিতে বসতে ভারি ভালো লেগেছিল। কিন্তু ধনবান মার্কিনী-বিচারে তা বুঝি বাতিল! যাই হোক, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ, যেখানে একটু বিবেচক-ধরণের মানুষ যারা, তারা সে দেশের আদিবাসীদের প্রায় নির্বংশ করে দেওয়া সম্বন্ধে খুবই অপ্রতিভ এবং যারা আজকের নতুন পৃথিবীকে জানতে চায়, তাদের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি ঐ একই মূলীভূত মানবিকতা, যার বন্ধনে গোটা দুনিয়াকে বেঁধে দেওয়াই তো হলো বর্তমানের যুগ-ধ্বনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণেরও অধিকার পাইনি, কারণ কমিউনিস্ট বলে যারা পরিচিত তাদের পক্ষে ওদেশে যেতে (এমন কি নাম্‌তে) হলে খাস্‌ ওয়াশিংটনে স্টেট্‌ ডিপার্টমেণ্টের বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন। সোশালিস্ট দেশগুলো সম্বন্ধে বুর্জোয়া দুনিয়ায় অভিযোগ এই যে লৌহ যবনিকার পিছনে তাদের অবস্থান, সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর লঙ্ঘন কারও কর্ম নয়। নিউইয়র্ক বিমানবন্দরের রৌপ্য যবনিকা দূর থেকে দেখেছি, তাকে ভেদ করার সুযোগ

থেকেও বঞ্চিত থেকেছি। খুব বেশি অভাব বোধ করিনি, কারণ "Little Golden America" (হয়তো বহু পাঠকেরই Ilf এবং Petrov রচিত এই মনোরম গ্রন্থটি মনে পড়বে) আমাদের কাছে অপরিচিত নয়—দোষে গুণে মিলে আজ তার যা পরিস্থিতি তাকে কাটিয়ে সুষ্ঠু সভ্যতার স্তরে ঐ দেশের বহুগুণান্বিত অধিবাসীবৃন্দ অনতিদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই এগিয়ে যাবেন ভরসা রাখি।

লৌহ যবনিকার দ্বারে প্রথম নেমেছিলাম ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত দেশের তরমিজ্ (Tarmiz) শহরে। কাবুলে ক'দিন কাটিয়ে আমাদের প্লেন গেল তাসখন্দে—মাঝে সীমান্ত শহর তর্মিজে কিছুক্ষণ স্থিতি। একটুও বাড়িয়ে বলছি না কিন্তু মনে হয়েছিল এ তো আমাদেরই দেশ—এমনকি ছোট্ট বিমানবন্দরের বে-বন্দোবস্তের মধ্যেও যেন আমাদের আল্‌গা-আল্‌সে দেশের হাওয়া কিছুটা ছিল। আর ভুলতে পারব না বিমানবন্দরের ছোট্ট রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় পরিচারিকাদের একান্ত সহজ আন্তরিকতার কথা—একেবারে পরম আত্মীয়ের মমতা নিয়ে তারা আমাদের ক'জন বিদেশীর আপ্যায়ন করেছিল, আর তার মধ্যে ছিল যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব সৌহার্দ্যের স্পর্শ। জগতে কোথাও কোনো জবরদস্ত কমিউনিস্ট (বা অপর কোনো) পার্টি নেই যারা হুকুম জারি করে এমন সহজ, শোভন মানবিক ব্যবহার বিদেশীকে দেওয়াতে পারে। ইয়োরোপের নানা দেশে ঘুরে অন্তত সাধারণ পরিস্থিতিতে ব্যবহারের সততা এবং আন্তরিকতা সম্বন্ধে বিচার করার শক্তি হয়েছে। সোশালিস্ট দেশে, বিশেষ করে পূর্ব-ভূ-ভাগের সোশালিস্ট দেশে, প্রকৃতই যে 'দেশে দেশে বান্ধব' নীতি জীবনের অঙ্গ হয়েছে তা মনে করার কারণ পরে আরও অনেক খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু তার প্রথম সাক্ষাৎ পাই সোভিয়েত বিমানবন্দর তর্মিজ-এ।

ভারতবর্ষের অজর প্রার্থনা হলো—"সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু"—সকলে সবদেশে আনন্দ করুক। আসুক দেশে দেশে বান্ধব—অবসান হোক প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস—মানুষের প্রকৃত ইতিহাস—আরম্ভ হোক্।

("পরিচয়" ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৬, সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

"দুর্বল সংশয় হোক অবসান"

"আমার জীবন সফল হয় নাই।…যে উদ্দেশ্য লইয়া জীবনপ্রভাতে ঘরের বাহির হইয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হয় নাই।"

সম্প্রতি যাঁর আকস্মিক তিরোভাবে দেশ শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ('মহারাজ') "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম" শীর্ষক যে গ্রন্থ লিখে গেছেন, তার প্রথম বাক্যটি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

'মহারাজ' ছিলেন একেবারে অসামান্য মানুষ। একান্ত নিষ্ঠা ও সংহত আবেগ নিয়ে সুদীর্ঘ জীবন তিনি কাটিয়ে গেছেন, অবিচল একাগ্রতা ও সহৃদয় সারল্যের সমাবেশে গঠিত হয়েছিল তাঁর চরিত্র। কিশোর বয়সেই স্বদেশের মুক্তির আকুল কামনা নিয়ে তৎকালে যে বিপ্লবের প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল তার আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কায়মনোবাক্যে অকুতোভয় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিলেন—জীবনের শেষ অধ্যায়ে দেশের মুক্তির সাক্ষাৎ তিনি পেলেন, কিন্তু যে ভাবে, যে চেহারায়, যে মূল্যের বিনিময়ে মুক্তি এল তাতে সুখী হতে পারলেন না। লিখলেন, "আমার স্বপ্ন সফল হয় নাই—আমি সফলকাম বিপ্লবী নই।"

'মহারাজ' আমাদের রাজনীতিজীবনে বিতর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং প্রশ্নাতীত যে বিরলসংখ্যক মহাভাগ আছেন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর সঙ্গে তুলনার ইঙ্গিতমাত্র আজকের কারও সম্পর্কে মনে আসতে পারে না। কিন্তু তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি অনেকেরই মনে জাগবে: "আমার জীবন সফল হয় নাই।"

কিছুকাল পূর্বে রজনী পাম দত্ত যা লিখেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করতে বারবার ইচ্ছা হয়েছে লেনিন জন্মশতাব্দ পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতে। কার্ল্ মার্কস্ জন্মেছিলেন ১৮১৮ সালে; ঠিক তার একশো বৎসর পরে সোভিয়েত বিপ্লবের কল্যাণে ইতিহাসে প্রথম সফল সোশালিস্ট রাষ্ট্রের জন্ম হয়। লেনিন জন্মেছিলেন ১৮৭০ সালে, তারপর একশোবৎসর কেটেছে,

জগতের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সোশালিস্ট ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। কার্ল মার্ক্‌স-এর মৃত্যু হয় ১৮৮৩ সালে—এমন আশা তো উদ্ভট নয় যে ১৯৮৩ সালে দেখা যাবে অন্তত দুনিয়ার অধিকাংশ সোশালিস্ট আর তার মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষেরও স্থান? মার্কসবাদ অবশ্য ফলিত জ্যোতিষের কারবার করে না, কিন্তু মানুষের উপর আস্থা রাখে বলেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার ভরসা, সমসমাজে উত্তীর্ণ হওয়া সম্পর্কে তার নিশ্চিতি। অল্পাধিক পরিমাণে যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য মার্ক্‌সবাদে দীক্ষা নিয়েছি বলে যাদের গর্ব, তারা আজকের সমুজ্জ্বল পরিপ্রেক্ষিতে কর্তব্য নির্ধারণে কতটা সফল হচ্ছি জানি না, কিন্তু চোখের সামনে সবাই দেখছি আত্মঘাতী আত্মকলহের চূডান্ত, দেখছি যাকে "সপ্তাহ" চিহ্নিত করেছে "ছিন্নমস্তা রাজনীতি" বলে, দেখছি যেন আমরা সবাই স্বখাত-সলিলে ডুবে মরছি। পরস্পরকে দোষ দেবার বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া ছাড়া প্রকৃত সন্তুষ্টির কোনো কারণের সন্ধান পাচ্ছি না—ভারতবর্ষের অধুনাতন পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রণ্টের তত্ত্ব এবং সীমিত হলেও কর্মের যে আশ্বাসে দেশবাসী ব্যগ্র হয়ে সাড়া দিয়েছিল, বামপন্থীরা সবাই মিলে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে তার প্রতি কৃতঘ্নতারই পরিচয় দিচ্ছি। বাঙলায় বন্যার্তদের ত্রাণ ব্যাপারেও দলীয় সংকীর্ণতা ও নিছক নেংরামি যে মূর্তিতে দেখা দিয়েছে, তার দিকে চেয়ে প্রায় যেন ডাক ছেড়ে বলতে চায় মন: 'আমাদের জীবন বাস্তবিকই কি এমনই ভাবে বিফল হবে, দেশকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে, আরও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেবে?'

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সালে এঙ্গেল্‌স্ এক বন্ধুকে লেখেন: "ইতিহাস যেন এক নিষ্ঠুর দেবতা। শুধু যুদ্ধকালে নয়, 'শান্তিপূর্ণ' অর্থনৈতিক বিকাশের যুগেও তার জয়রথ চলে রাশি রাশি শবদেহের উপর দিয়ে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আমরা এমনই নির্বোধ যে একেবারে অত্যধিক দুঃখকষ্টের চাপে না পড়লে প্রকৃত প্রগতির পথে চলার সাহস সংগ্রহ কখনও করি না।" এই সঙ্গে মনে পড়ছে ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস্-এর রচনা যাতে বুর্জোয়া যুগ থেকে সমাজবাদে উত্তরণ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে ঐ-উত্তরণ ঘটলে তবেই "যে হিন্দু দেবতা নিহতের খর্পর বিনা সুধাদানেও অস্বীকৃত হত, তার সঙ্গে মানবসভ্যতার সাদৃশ্য দূর হবে।" ইতিমধ্যে তাই মূল্য দিতে আমাদের হবে, দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, মর্মন্তুদ ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই সঠিক্ পথের সন্ধান পেতে হবে।

এদেশের মানুষ বর্তমান অর্থ ও সমাজব্যবস্থাকে যে খুব বেশিদিন আর বরদাস্ত করবে না তার লক্ষণ মোটামুটি সর্বত্র। এদেশের কর্তৃপক্ষীয়েরা যে আগের কায়দায় শাসন আর শোষণ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব আবিষ্কার করছে, তাও সংশয়াতীত। বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে সন্দেহ নেই—শুধু আজকের দুনিয়ায় জটিল অথচ দ্রুতপরিবর্তমান পরিবেশে ভারতবর্ষের মতো ভূগোল, অর্থনীতি, রণকৌশল, সমাজপরম্পরা প্রভৃতি দিক থেকে অবস্থিত দেশে বিপ্লব কী আকারে এবং কেমনভাবে আসবে, সেটাই মূল চিন্তা ও তদনুরূপ কর্মের বিষয়। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে ক্যানাডার টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র বক্তৃতা করার সময় চীন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লেখক ফীলিক্স্‌ গ্রীন্‌-এর কাছে শুনেছিলাম যে বিপ্লবের পূর্বে সমৃদ্ধ বলে খ্যাত শাংহাই শহরে প্রতি বৎসর গড় আটাশ হাজার মৃতদেহ রাস্তা থেকে সরাতে হত, যে শবগুলি এমন মানুষের যাদের কেউ কোথাও আছে বলে খোঁজ ছিল না—এই বর্বরতার অবসান তৎক্ষণাৎ ঘটিয়েছিল চীন বিপ্লব। আমাদের দেশেও অনুরূপ-ঘটনা অবিরাম ঘটছে—এই শহর কলকাতায় সম্ভ্রান্ত বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় আর উচ্ছিষ্ট ফেলে দেওয়া হয় পথে, যেখানে কুকুরে আর মানুষে আজও তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করে থাকে, পথের ধারে বে-ওয়ারিশ্‌ লাস্‌ দেখে সরে যাওয়াতে ভদ্র পথচারী আমরা তো অভ্যস্ত! বিপ্লব এদেশে আসতে খুব দেরি হলে তো মানবতারই পরাজয় আর অপমান।

তবে কোনো পাকা শান-বাঁধা রাস্তায় সোজাসুজি বিপ্লবকে টেনে আনা যায় না—অনেক আঁকবাঁক আছে, অনেক বাধা, অনেক অন্ধকারের ধাক্কা, অনেক দৌরাত্ম্যের মোকাবিলা সামলাতে যে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। তাই শুধু বিপ্লবের ধ্যান নয়, কিংবা অধীর ব্যগ্রতায় সহজ বিপ্লবের মোহাঞ্জন চোখে মেখে বেপরোয়া ঝাঁপিয়ে পড়া নয়—চিন্তা বিনা জগৎকে বদ্‌লানো যাবে না, চিন্তা আর কর্মের সমন্বয় যাতে বাস্তবিকই ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারে তার সাধনা বিনা পথ নেই।

'সাধনা' কথাটা হয়তো ভাববাদী শোনাচ্ছে কিন্তু নাচার। সাধনা বিনা সিদ্ধি হবে কোথা থেকে? চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ যে হয় না তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? যারা বাস্তবিক সাহস দেখাচ্ছে, প্রাণ দিতে এবং নিতে যারা তৈরি, তাদের সম্বন্ধে 'চালাকি' কথাটা প্রযোজ্য নিশ্চয় নয়, কিন্তু তাদেরও

ভেবে দেখতে হবে পরিস্থিতির বাস্তব পর্যালোচনা বিনা পথ স্থির করা যায় না, শুধু সংকল্প ও সাহস যথেষ্ট নয়, মননবর্জিত উচ্ছ্বাস বিপ্লবের পরিপন্থী।

১৯৫০ সালের ভারতবর্ষে, এবং বিশেষ করে, রাজনীতি-চেতনার দিক থেকে সর্বাগ্রগণ্য বাংলাদেশে আজ যে দুর্দশা, তার মূল কারণ যে মার্কস্‌বাদী মহলে ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, ক্ষমতালোলুপ পরস্পরবিদ্বেষের আতিশয্য তা সন্দেহাতীত। আমরা যারা ২০০০ সালে বেঁচে থাকব না, আটের দশককেও সম্ভবত যারা দেখব না, অথচ আমাদের উত্তরপুরুষ তরুণদের মনের সন্ধান যারা পাচ্ছি না, তারা না বলে কি পারি—"আমাদের জীবন সফল হয় নাই?"

একটা সান্ত্বনা হয়তো মার্কস্‌বাদী আখ্যা যারা নিয়ে থাকি তাদেরও আছে। অন্তত দেশ আমাদের স্বাধীন—প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীনতার পরিণতিরূপে সমাজবাদ এখনও আমাদের নাগালের বাইরে, তবুও স্বাধীনতার মহার্ঘতাকে যেন হ্রাস না করে দেখি। পরাধীনতার জ্বালা যারা জেনেছি, অন্তত তারা কখনও তা করতে পারব না। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান' পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশ যাওয়ার যন্ত্রণা ভুলব কেমন করে? আমাদের স্বাধীনতার এখনও অনেক ঘাটতি সন্দেহ নেই—কিন্তু যা পেয়েছি, তাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করা সম্ভব নয়। এটা সান্ত্বনা, কিন্তু পুরো সান্ত্বনা অবশ্য মিলছে না!

পুরো সান্ত্বনা যে মিলতেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ইতিহাসের আমাদের কাছে নেই। আর একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে যে আমাদেরই জীবনে সমাজ বিকাশের প্রধান স্তরগুলি বিকাশ পাবে আশা করে বসে থাকা একধরনের 'আদিখ্যেতা' বই কিছু নয়! ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে আমরা যারা সমাজবাদের স্বপ্ন দেখে তাকে বাস্তবে টেনে আনার যৌথ-প্রচেষ্টায় কম বেশি যোগ দিয়েছিলাম, তারা আজকে কিছু পরিমাণে আশাভঙ্গের চিহ্ন দেখে বিহ্বল হলাম, এ তো আজগুবি ব্যাপার! ফল মানুষ চায় বটে, কিন্তু যে মানুষ ফল হাতের মধ্যে না পেলে কাজ করতে চায় না, তেমন মানুষ কি কখনও কাজের কাজ করতে পারে? "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন"—কথাটা কি উড়িয়ে দেবার মতো? তা যদি হত তো মানুষ আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে থাকতে পারত না—'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' দিয়ে যুগ-যুগান্তের যাত্রা মানুষের চলেছে, হঠাৎ আজ তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

"আমার জীবন সফল হয় নাই" লিখেছিলেন যে "মহারাজ," তিনি জীবনের

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হতে পারেন নি। বাঙলাদেশের "ছিন্নমস্তা রাজনীতি" দেখে যারা নিদারুণ বিচলিত হয়েছি, তারা বিশেষ করে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেব। সাম্যবাদী আন্দোলনের বিকৃতি ও নিয়ত বিবদমান্ ব্যর্থতা দেখে 'হা হতোঽস্মি' বলে হাল ছেড়ে দেওয়া হবে সব চেয়ে বড়ো অপরাধ। একাকিত্বের আবর্ত পরিত্যাগ করে আবার সবাই মিলে 'পথের আলো' খুঁজলে দেখা যাবে—

"দুন্দুভিতে হল রে কার
আঘাত শুরু,
"বুকের মধ্যে উঠ্‌ল বেজে
গুরু গুরু—
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের
স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো।"

তখন ভাবনায় লাগবে নতুন "ঝড়ের হাওয়া," আর দেখব "বজ্রশিখার একপলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো।"

জয় হোক

আজ দুনিয়ার নজর পড়ে রয়েছে আমাদের এই মহাদেশের সেই দিগন্তে যেখানে বুকভরা ভালবাসা নিয়ে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নামকরণ করেছেন 'বাংলাদেশ'। প্রায় অভাবনীয় ভোটাধিক্যে জনমত শেখ মুজিবর রহমানকে সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বে এবং পূর্ব বাংলার একচ্ছত্র নেতৃত্বের শিরোপা পরিয়েছিল—বাস্তবিকই তিনি হলেন জনগণমন অধিনায়ক। বাঙালীর এই অবিস্মরণীয় অভ্যুত্থান যাদের সহ্য হয় নি, যারা সাধারণ মানুষের এই জাগরণের ছোঁয়াচ পশ্চিম পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত, সেই সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট ফৌজদার ও ধনপতির দল ইসলামাবাদে নিজেদের আসন অটল রাখার চেষ্টায় প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানকে দিয়ে বাংলাদেশকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে দিতে নেমেছে, নিরস্ত্র নরনারীকে মারবার জন্য ব্যবহার করছে মেশিনগান আর ট্যাংক আর জেট প্লেন। দুষ্টচক্রের শয়তানীর বিরুদ্ধে অসমসাহসে লড়ছে বাংলাদেশ—তার কানে বাজছে মুজিবরের নির্ভয় আহ্বান "আমরা বিড়াল কুকুরের মতো মরব না; যদি মরতে হয় তাহলে বাংলামায়ের সুযোগ্য সন্তান হিসাবেই প্রাণ বিসর্জন দেব"।

বহুদিন আগে, স্বদেশী আন্দোলনের যখন জোয়ার তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'এই বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে
বাহির হলে, জননি'!

'এপার বাংলা ওপার বাংলা' যখন আবার গভীর নিবিড় সৌহার্দ্যের নৌকা ভাসাবার আশায় উদ্বেল তখনই আবার এল শত্রুর মদোন্মত্ত আঘাত। আর আমরা শুনলাম নজরুল যাকে বলেছিলেন 'হৈদরী ডাক', আর দেখলাম বাংলাদেশের অপরূপ রূপ—আশ্চর্য নয় যে সঙ্গে সঙ্গে আজকের কবিকণ্ঠে শুনছি এখানে:

মুজিবর! শেখ মুজিবর!
তোমাকে সেলাম……
বাংলার এই রূপ, এত রূপ
যত চোখ মেলে দেখি, তত বুক ভরে
আর ভালোবাসি, তত ভালোবাসি।
(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'যুগান্তর', ২৬ মার্চ, '৭১)

চোরের মতো রাতের অন্ধকারে দখলকারী ফৌজ এসে বাংলাদেশকে আজ জ্বালিয়ে মারার চেষ্টায় লেগেছে। যেখানে আমরা বাঙালী আছি তাদের মন আজ তাই ভারাক্রান্ত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে—ধন্য বাংলাদেশের সংহতি, ধন্য তার সংকল্প: "দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।" মুজিবরের সহচর তো হল বাংলাদেশের সবাই—মুষ্টিমেয় বিশ্বাসঘাতক যদি থাকে তো পরোয়া নেই—মুজিবরের লড়াই হল ন্যায়যুদ্ধ, প্রকৃত অবিকৃত জনযুদ্ধ, এ তো অমোঘ, অপরাজেয়, "এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"

এই যে সেদিন এসেছিল একুশে ফেব্রুয়ারী, যেদিন সবাই আমরা স্মরণ করি বাংলাভাষার জন্য ঢাকার রাজপথে বাঙালীর লড়াই—যে ভাষায় 'মা' বলে ডাকি, যে ভাষা মায়ের কোলে বসে শিখি, সে-ভাষাকে ভালোবাসা, সে ভাষার মর্যাদার জন্য বুকের রক্ত ঢালা যে কি গৌরবের, তা সবাই যেন তখন বুঝি, ছোঁওয়া লাগে আমাদের মর্মের অন্তঃস্থলে। এবার এল মার্চ মাসে এই নূতন ঝটিকা—জয় হোক্, জয় হোক্ বাংলাদেশের!

শুধু যে বাঙালীর আবেগ আজ গভীরভাবে উদ্রিক্ত হয়েছে তা নয়। দিল্লীতে পার্লামেণ্টের অধিবেশনে দেখা গেল সবাই প্রচণ্ড বিক্ষোভ অনুভব করছেন। দু'একজন কূটনৈতিক কারণে একটু সাবধানে পদক্ষেপের কথা বললেন বটে, কিন্তু বাংলাদেশের এই সংগ্রামে প্রত্যেকেরই সহানুভূতি ও সহায়তার কামনা ছিল সন্দেহাতীত। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলতে কুণ্ঠিত হলেন না যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে তাণ্ডব যারা শুরু করেছে তাদের সম্বন্ধে বিশেষণ খুঁজে পাওয়া নিতান্ত দুরূহ।

একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙালীরা পাকিস্তানের বিন্দুমাত্র হানি চায় না। কিন্তু সংখ্যালঘু পশ্চিমাদের শোষণ ও অত্যাচার তারা আর কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। সাম্প্রতিক

নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে নভেম্বর মাসে ভয়াবহ ও অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বাঙলাদেশের অভিজ্ঞতা হয়েছিল মর্মান্তিক—বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে বাঙালী তখন লক্ষ্য করেছিল যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রেরিত সাহায্য বণ্টনব্যাপারে তাদের বঞ্চিত করতেও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার কুণ্ঠিত হয় নি। পাকিস্তানকে অখণ্ড রেখেই বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে চেয়েছে স্বায়ত্তশাসন—সর্বজনের সমর্থন নিয়ে তিনি এই দাবী উপস্থিত করেছেন। মওলানা ভাসানির মতো নেতা, যিনি স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ববাংলা চেয়েছিলেন তাঁরও সমর্থন অর্জন করেছিলেন—গণতন্ত্রের যদি কোন প্রকৃত বাস্তব অর্থ থাকে তাহলে সেই গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতি অবিকৃতভাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশের সংহতি ও সংকল্পের রাষ্ট্রিকরূপ তিনি দিয়েছেন। ইসলামাবাদের শাসকগোষ্ঠী স্বভাবতই এতে বিচলিত। কিন্তু ইয়াহিয়া খান্ কি ভুলে যাবেন তাঁর পূর্ববর্তী আয়ুবখান্-এর কথা? কে না জানে, আয়ুব খান্ মতলব এঁটেছিলেন বজ্রমুষ্টিতে শাসন চালিয়ে বাংলাদেশকে বুটের তলায় চেপে রাখবেন, কিন্তু পূর্বগগনে মাদল তখন বেজে উঠেছিল, কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝাপটায় কোথায় তিনি ছিটকে পড়লেন—সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার পাত্তা রাখে কে?

ভুট্টোর মতো সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট নেতার সঙ্গে মিতালি করে ইয়াহিয়া খান্ গোটা পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলাফলকে নাকচ করতে লেগেছিলেন। মুজিবরকে প্রধানমন্ত্রী পদে আহ্বান করা দূরে থাক্, ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বানচাল করেছিলেন। মুজিবরের উন্নত শির নোয়াতে না পেরে বাংলাদেশে সামরিক আইন জারী করলেন, আর জগৎ দেখ্‌ল অকল্পনীয় এক দৃশ্য—মুজিবরের ডাকে দেশজোড়া হরতাল, যার তুলনা ইতিহাসে কোথাও নেই। যে হরতালে যোগ দেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে রাজ্য-পালের বাবুর্চি পর্যন্ত সবাই,আবালবৃদ্ধবনিতা। গান্ধীর নাম নিয়ে বড়াই যারা করি তারা অন্তত বুঝব অপরূপ জনসমর্থন বিনা এ ঘটনা সম্ভব নয়, নৈতিকতা আর গণতন্ত্রের এর চেয়ে বৃহৎ বিজয় তো কল্পনা করা যায় না। পশ্চিমা শোষকদের এতে গা জলে উঠেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু হার মানতে হল ইয়াহিয়া খান্‌কে, তিনি এলেন ঢাকায়, বসলেন মুজিবরের সঙ্গে বৈঠকে কথাবার্তা চলল দশ দিন ধরে, স্বয়ং ভুট্টো এসে রকম-বেরকম অভিনয় করে গেলেন। আশা হল সকলের—মুজিবরও ভাবলেন যে, বাংলাদেশের মর্যাদার

সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আপোষরফা একটা হবে। ঘুণাক্ষরে কোন কু-মতলবের কথা ইয়াহিয়া খান্ জানলেন না, কিন্তু রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা তিনি দিলেন, আর স্বস্থানে ফিরেই বাংলাদেশের গর্দান নেবার হুকুম দিলেন সেই জল্লাদদের, যারা সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশে যুদ্ধসম্ভার নামিয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত অনাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ গর্জন করে উঠেছে। লক্ষকণ্ঠে আজ ধিক্কার—বাংলাদেশ থেকে স্বৈরাচারী হাত গুটিয়ে নিন ইয়াহিয়া খান্।

বোধহয় পাঞ্জাবী সামরিকচক্র এবং পশ্চিমা ধনপতিদের বেষ্টনীর মধ্যে ইয়াহিয়া খান্ বন্দী। নইলে সবাই তো জানে পাঠানের যত দোষই থাকুক না কেন, সে সৎ, কথার খেলাপ সে করে না। অদ্ভুত লাগে—দশদিন আলোচনা চলল। মুজিবর কখনও ভুলেও একটি অসংযত বাক্য উচ্চারণ করলেন না, ভরসা পেলেন সম্মানজনক চুক্তির—অথচ চকিত বজ্রাঘাতের মতো নিরস্ত্র বাংলাদেশের উপর পড়ল সমরবাহিনীর আক্রমণ। গণতন্ত্রের সর্ববিধ রীতিনীতি সম্যকভাবে পরিতুষ্ট করে যারা যেন প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলছিল, যাদের দৃষ্টান্ত যেন ইতিহাসে নতুন পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল তাদেরই বিরুদ্ধে আজ পশ্চিম পাকিস্থানের যুদ্ধবাহিনী গণ-হত্যার বিপুল বিকট প্রয়াসে ব্যাপৃত।

একে গৃহযুদ্ধ বলে না, এ হল প্রকৃত, যথার্থ মুক্তিসংগ্রাম। গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে ধনপতিপুষ্ট এক সামরিকচক্র ঘটাতে চেষ্টা করছে, যাকে বিদেশী ভাষায় বলে, Coup d'e'tat—জনগণের হাতে রাষ্ট্রকে যেতে দেওয়া হবে না, তাকে রাখতে হবে পশ্চিমা ধনপতি এবং সামরিক গোষ্ঠীর হাতে যে কোন উপায়ে—নীতি বর্জন করে, উদ্দাম নরহত্যার পথে।

বাংলাদেশের জাগরণ কিন্তু কারও ভ্রূকুটিতে আর ভয় প্রদর্শনে আর ক্রূর দৌরাত্ম্যে স্তব্ধ হবার নয়। পূর্বদিগন্তে আজ নব অরুণোদয় ঘটেছে—এমন কোন তমিস্রা নেই যাকে সে বিদীর্ণ না করতে পারে। রক্তের বন্যায় বাংলাদেশ আজ ভাসছে, কিন্তু বাংলার সোনার মাটিতে এই রক্ত আনছে নতুন প্রাণ, আর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে নজরুলের বাণী :

"বলো ভাই মাভৈ মাভৈ, নবযুগ
ঐ এল ঐ,
এল আজ রক্ত যুগান্তর" !

জয় হোক্ মুজিবর রহমান আর তাঁর অগণিত সহচরদের। জয় হোক্ বাংলাদেশের! জন্ম নিক্ নতুন প্রভাত আমাদের এই বাংলার আকাশে!

---

* অলইণ্ডিয়া বেডিও থেকে ২৮শে মার্চ ১৯৫২ প্রদত্ত ভাষণ, "বেতাবজগৎ" (১৬-৩০ এপ্রিল ১৯৭১) থেকে উভয় প্রতিষ্ঠানেব আনুকূল্যে পুনর্মুদ্রিত)।

বাংলাদেশ : 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়'

বাংলাদেশ আজ মুক্ত। ইতিহাসের এক প্রচণ্ড অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরবে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবণিতা আজ ভূষিত। অমিত শৌর্য নিয়ে স্বদেশের সত্তা, স্বার্থ ও সম্মানের জন্য সার্থক সংগ্রাম করেছেন সেখানকার বাঙালিরা। ভারতভূখণ্ডে এমন উদ্দীপনাময় ঘটনার সাক্ষাৎ কখনও মিলেছে মনে হয় না। বিশ্বের বৃত্তান্তে নতুন সংযোজনা করতে চলেছে বাঙালি—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়।

ভারতের সৌভাগ্য ও গর্ব আজ এই যে পরম সৌহার্দ্য নিয়ে, বিপুল বিদেশী প্রতিকূলতায় সন্ত্রস্ত না হয়ে, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে সাধ্যাতিরিক্ত সহায়তা দিতে সে চেয়েছে এবং পেরেছে। আর আমরা—যে যেখানে আছি—যারা মায়ের কোলে শুয়ে প্রথম কথা বলতে শিখি বাঙলা ভাষায়, তারা তো জানি যে বাংলাদেশে মমতার ডোরে সবাইকে বেঁধেছে আর অপরাজেয় করে তুলেছে এই ভাষা। আর তাই আমাদের মনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রসন্নতা—বহু আশাভঙ্গে দীর্ণ আমাদের জীবনেও যেন একটা পরিণতি এসেছে, সার্থকতার সংকেত মিলেছে।

একটু আতিশয্য হচ্ছে কি? হয় তো হোক—কিছুটা বাক্‌বাহুল্য আমাদের সহজাত। সেদিন দিল্লীতে আলিঙ্গন করলাম বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে—পরিশ্রান্ত অথচ সতত তেজঃপুঞ্জ সেই নেতা, 'জনগণমন অধিনায়ক' যার প্রকৃত বিশেষণ, স্পষ্টোচ্চারিত বাঙলায় সমবেত জনতাকে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, আবেগে আমি আজ আকুল'। এই আবেগে একটু যেন বিহ্বল হয়ে পড়া বাঙালিদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নয় কি? একে অস্বীকার করা একপ্রকার অনৃতাচরণ। তবে বিহ্বলতাই যে শেষ কথা নয়, তা মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালিরাই তো সর্বস্ব দিয়ে প্রমাণ করেছে, বাঙালির বুকের গহনে যে তেজ তা তো প্রোজ্জ্বল হয়ে জগতকে চমৎকৃত করেছে। একটু আতিশয্য হয় হোক

—নতুন দিনের আলোয় নিজেকে সংবরণ করে নিতে শুধু যেন আমাদের বিলম্ব না হয়।

বাংলাদেশের মুক্তি শুধু একটা ভৌগোলিক-রাষ্ট্রিক পরিবর্তন আনেনি, সমসাময়িক ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতিকেও এ-ঘটনা প্রভাবিত না করে পারে না। তবে প্রথমেই বলতে চাইছি যে, ভবিষ্যতের কাছে প্রতীক্ষা আমাদের যাই হোক না কেন, আপাতত আমরা অনেকে অসম্ভব একটা ছটফটানি থেকে নিস্তার যে পেয়েছি এ-বড়ো কম কথা নয়।

মাসের পর মাস যখন আমরা বাংলাদেশের স্বীকৃতি চেয়েছি অথচ আশানুরূপ সাড়া মেলেনি, মাসের পর মাস ধরে যখন মাঝে মাঝে রীতিমতো সন্দেহ হয়েছে যে হয়তো বা ভারত সরকার সদিচ্ছা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে ব্যর্থ হচ্ছে, তখনকার কথা মনে পড়ছে। মে মাসে (১৯৫১) মধ্যকলকাতায় এক মস্ত সভায় বক্তৃতা করার পর কয়েকজন ছেলে পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আচ্ছা, দেখুন, অজয়বাবু (অজয় মুখোপাধ্যায়) আর আপনি আর ক'জন মিলে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে আমরণ অনশন করছেন না কেন?' অনেকে হেসে উঠল, আমাকেও একটা জবাব দিতে হলো, কিন্তু গান্ধীজী-প্রবর্তিত অনশন প্রথায় বিশ্বাসী না হয়েও কথাটা আমার মনে ধাক্কা দিয়েছিল। বাস্তবিকই ভেবেছিলাম, অন্তত মনের ছটফটানিকে শান্ত করার একটা উপায় বুঝি ওভাবে মিলতেও পারে!

ঘটনাচক্রে, প্রায় একই সময়ে, "পোলাণ্ড" নামে যে-সচিত্র মাসিক কেউ কেউ দেখে থাকবেন, তাতে লক্ষ্য করলাম Szmul Zygielbojm-এর ছবি এবং জীবনকথা। ইনি পোলাণ্ডের ইহুদিসংঘের নেতা ছিলেন এবং হিটলারী অমানুষিকতায় যখন ওয়ারশ শহরের ইহুদি বাসিন্দারা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তখন সাহায্যের আশা নিয়ে লণ্ডনে যান (১৯৪০-৪১)। সেখানে প্রচুর সহানুভূতি অথচ বাস্তব সহায়তায় অনিচ্ছা কিম্বা অপারগতা দেখে নিজের যথাসাধ্য প্রয়াসের ব্যর্থতার ফলে তিনি ভগ্নহৃদয় অবস্থায় আত্মহত্যা করেন এবং একপত্রে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার বিবৃতি রেখে যান। এক খ্যাতনামা পোলিশ কবি এই ঘটনা নিয়ে লেখা তাঁর রচনার আখ্যা দেন: "The Bloodshed unites us" এবং এই নামে একটি গ্রন্থের সমালোচনা (যা থেকে এ-ঘটনা সম্বন্ধে আরও কিছু জানা গেল) আমার চোখে পড়ল "Polish Perspectives" মাসিক-পত্রের ১৯৫১ সালের ৭-৮ সংখ্যায়।

"পরিচয়" পত্রিকার বিগত শারদীয় সংখ্যার জন্ত না লিখে পার পাব না জেনে যখন লিখতে বসেছিলাম তখন মন ছিল ভারাক্রান্ত। বাংলাদেশ ছাড়া অন্ত বিষয়ে লিখব না, অথচ লিখতে বসে দেখলাম—পারছি না। কয়েকটা পাতা কোনোক্রমে লিখেও আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না; কেবল ভাবলাম এভাবে কথা সাজিয়ে যাওয়া একেবারে বৃথা, নিজেকে এবং অপরকে বঞ্চিত করা, তাই কিছুতেই লেখা সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। মনের ছটফটানি থেকে গেল। কথা বলে আর লিখে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়ার রাস্তাও আমার যেন বন্ধ হয়ে গেল।

নিছক নিজের কাছে তাই বাংলাদেশের মুক্তি একটা প্রায় অবিরাম যন্ত্রণার প্রায়-সম্পূর্ণ উপশম ঘটিয়েছে। আজও চিন্তা মুক্তিপর্বোত্তর অধ্যায়ের বিবিধ সমস্যা নিয়ে—চিন্তাজ্বর থেকে নিস্তার তো নেই—কিন্তু এ-চিন্তা হলো গুণগতভাবে ভিন্ন ও পূর্বের মতো যন্ত্রণাদায়ক নয়। কর্মের বলে বাংলাদেশ নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। নকল মুদ্রা দিয়ে স্বাধীনতা আমরা কিনেছিলাম—দেশবিভাগের বিনিময়ে ভারত ও পাকিস্তানের সদাসন্ত্রস্ত অস্তিত্ব আরম্ভ হয়েছিল। ইতিহাসের কাছে রক্তের যে-ঋণ আমাদের ছিল, তা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিশোধ করেছে। বাঙালি বলে সবার আমাদের বুক আজ তাই দশ হাত; আর ভারতীয় বলেও এই আনন্দ যে বাংলাদেশের অসমসাহস সংগ্রামে এদেশের জনতা, এদেশের জওয়ান আব এদেশের কর্তৃপক্ষ প্রকৃত সহযোগিতা দেবার সৌভাগ্য পেয়েছে।

আগেই বলেছি যে ভারত ভূখণ্ডে এমন উদ্দীপক ঘটনা বড় একটা হয়নি। 'চিরদিন আছি ভিখারীর মতো জগতের পথ পাশে', রবীন্দ্রনাথের এ-বিলাপ তো মিথ্যা নয়। বিপুল আমাদের এই দেশ তো বিশ্বের দৃষ্টিতে এখনও প্রায় অকিঞ্চিৎকর—আধুনিক জগতের ইতিহাসে এদেশের অবদান নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে কি ঘটে না-ঘটে তাতে পৃথিবীর চেহারা বদলায় না—আমরা থেকেছি বিদেশী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত, তারপর বড়লোকের গরিব কুটুম্বের মতো স্বাধীন হয়েও কেমন যেন ত্রস্ত, সংকুচিত, পরনির্ভর। গান্ধীজী মতবাদের দিক থেকে অহিংস প্রতিরোধ প্রবর্তন করে জনতাকে ইতিহাসের মঞ্চে নায়করূপে বসাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে প্রকৃত মুক্তি সংগ্রামের নিশানা দেখাতে চেয়েও দেখাতে পারলেন না। এদেশে

আমরা রয়ে গেলাম, এখনও বহুলাংশে রয়েছি পরমুখাপেক্ষী—ইতিহাসসৃষ্টি যেন আমরা করতে অপারগ, আমরা চলব পরানুকারী ধারায়, অনুসরণ করব যে আদর্শ ও কার্যক্রম অপরাপর দেশে প্রচারিত ও পরীক্ষিত হচ্ছে, মান্ধাতাগন্ধী এই দেশে আমরা চলব ধীরপদে, সাবধানী পথিকের মতো পথ ভুলবার ভয়েই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকব ; নিজেদের চিন্তায় আস্থা নেই, নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস নেই ; অনিশ্চয়ের ভাবনায় জড়তাগ্রস্ত হয়ে থাকাই যেন এদেশের বিধিলিপি। এই যে দুঃসহ অধ্যায়—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যার অশুভ সূচনা—তার অভিসমাপ্তি যেন ঘটালো বাংলাদেশের বজ্রনিপাতী অভ্যুদয়, দশদিক চকিত করে বাংলাদেশের অকুতোভয় অভ্যুত্থান ইতিহাসে নতুন দিগন্ত যেন উন্মোচিত করল। "প্রভাতসূর্য এসেছ রুদ্র সাজে, দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে"—একথাই বারবার মনে হয়েছে বাংলাদেশের প্রচণ্ড নির্মম অনল-পরীক্ষার দিনগুলিতে।

বিস্তৃত উল্লেখের প্রয়োজন নেই, কিন্তু একথা নিঃসন্দিগ্ধ যে মুজিবর রহমানের অনন্য নেতৃত্বে ভাষা ও জাতিগতভাবে বহুধানিপীড়িত বাঙালি নিজস্ব জাতীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে—প্রথমে চেয়েছে স্বায়ত্তশাসন এবং পরে অত্যাচারীর অপরিসীম দৌরাত্ম্যের পরিচয় পেয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেছে। অনন্য সেই নেতৃত্ব, কারণ ইতিহাসে এমন নজির কোথাও নেই যে একটা গোটা দেশের জনতা প্রায় সমগ্রভাবে ঐক্যবদ্ধ। সোশালিস্ট দেশে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনতার সংহতি ঘোষিত হয়ে থাকে বটে, কিন্তু সেখানে —বাস্তব ঐতিহাসিক কারণে—বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব নেই, নির্বাচনেও তাই দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। ইংলণ্ডের মতো দেশে 'লেবর' পার্টির পক্ষ থেকে একবার বলা হয়েছিল যে আদর্শ অবস্থা হলো 'লেবর দলের' দুই তৃতীয়াংশ আসন লাভ, তার বেশি কাম্য নয় ; কারণ অগ্রগমনের পথ নিয়ে নানা মত রয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো কোনো ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী চাক্ বা না চাক্, বিপ্লবেরই বারতা বইতে আরম্ভ করেছিল এবং সেজন্যই মুজিবের নেতৃত্বে দেশবাসী ১৬৯ এর মধ্যে ১৬৭ আসনে তাঁকে জয়ী করল, রৌদ্ররশ্মি দিয়ে যেন লিখলো ইতিহাসের পাতায় 'আমরা নতুন দেশ চাই, নতুন জীবন চাই, মুজিবর এসো, হাল ধরো, চলো এগিয়ে চলি!' সমাজকে যখন ঢেলে সাজাবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসে তখন প্রয়োজন হয় এমনই সংহতি। এই সংহতি প্রকাশ পেল অভূতপূর্ব এক নির্বাচনের মাধ্যমে—প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব ছিল না, পার্লামেণ্টারী রীতি-

মাফিক কারও স্বাধীন ভোটাধিকারে বাধা ছিল না, অথচ আওয়ামী দলের বিজয় হলো প্রায় সামুহিক।

সম্প্রতি চিলিতে নির্বাচনের জোরে সমাজতন্ত্রের সমর্থক দলগুলির মিলিত সংস্থা জয়ী হয়েছে, ডক্টর আলেন্দে-র নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে কতকটা কিউবা-র মতোই (যদিও ভিন্ন পথে) সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় এক দুর্গ নির্মিত হয়েছে বলে তাই নিয়ে জগৎজোড়া আলোড়ন দেখা দিয়েছে। মুজিবর রহমান যে-সংহতির নায়ক তার নির্বাচন-সাফল্য আরও অনেক বেশি চমকপ্রদ। তবে সমাজতত্ত্ব বিষয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে তেমন কোনো ঘোষণা তিনি করেননি—তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ব-বাংলায় বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। হয়তো এটাও ঠিক যে রাষ্ট্র ও সমাজ-তত্ত্বের কচ্‌কচি সম্বন্ধে মুজিবর রহমান এবং তাঁর অধিকাংশ সহকর্মীর খুব বেশি আগ্রহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অকাট্য যে পশ্চিম পাকিস্তানী দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার সংগ্রামে জনতার দুঃখ-দৈন্য-বঞ্চনার মোচনই ছিল মুখ্য বস্তু; বাংলাভাষা নিয়ে যে-আবেগ তা ছিল এরই মর্মস্পর্শী প্রকাশ। তাই অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ জগৎকে জানিয়েছে যে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র তার লক্ষ্য। অবশ্য বাংলাদেশ একটা দুনিয়াছাড়া কল্পরাজ্য নয়; সেখানেও বহুজনের মধ্যে আছে বহুবিধ দুর্বলতা, আছে বহুযুগ-সঞ্জাত গ্লানির জের, মনুষ্যচরিত্র নিখুঁৎ নয় বলে সেখানে নিশ্চয়ই আছে অনেক বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। কিন্তু সাম্প্রতিক সংগ্রাম থেকে একথা স্পষ্ট যে প্রায় সর্বজনের সম্মতি নিয়ে বিপ্লব সংঘটনের সামর্থ্য রয়েছে বাংলাদেশের। অকল্পনীয় যন্ত্রণা ভোগের পর প্রায় এক ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন করে জনজীবন গড়ে তুলবে সেদেশ। ইতিহাসে এটা নতুন সংযোজনা নয় তো কি?

* * *

গণতন্ত্রের লড়াইয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা যে কত প্রোজ্জ্বল তা বলে শেষ করা শক্ত। গান্ধীজী যে-অহিংস সার্বজনীন প্রতিরোধের পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তার সব চেয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখি বাংলাদেশে। সংগ্রামের সর্বসংহারী মূর্তি দেখা যাওয়ার আগে মুজিবর রহমানের ডাকে যে হরতাল সেখানে হয়েছে, যাতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে লাটভবনের বাবুর্চি পর্যন্ত সবাই যোগ দিয়েছে, তা ইতিহাসে অতুলন। সামরিক শক্তি লেশমাত্র

ছিল না যে-মুজিবরের হাতে, তাঁরই ডাকে গোটা অসামরিক শাসন পরিপূর্ণ সাড়া দিয়েছে, প্রচণ্ড শাস্তির ঝুঁকি নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিকূল উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করেছে। ইতিহাসে অপর কোনো উদাহরণ নেই যে জনতার উদ্দীপনার প্রাবল্যে রেডিও স্টেশন হস্তান্তরিত হয়েছে, প্রাক্তন কর্তৃপক্ষ স্থানচ্যুত হয়েছে, অথচ বন্দুক থেকে একটা গুলি বেরোয়নি, কেউই হতাহত হয়নি। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথমার্ধে প্রখর পশ্চিম-পাকিস্তানী প্ররোচনা সত্ত্বেও মুজিবর রহমান নির্দেশ দেন যে ব্যাঙ্কে পশ্চিমাদের টাকা নিয়ে লেনদেন বন্ধ থাকবে কিন্তু তার প্রতিটি পাই পয়সা নিরাপদ থাকবে, বাজেয়াপ্ত করা হবে না। অভাবনীয় সাফল্যের সময়ে এ হেন সংযমী, সুশীল ব্যবহারেরও কোনো নজির কোথাও নেই। জাগ্রত জনশক্তি যে অসাধ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে, তারই আভাস তখন আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ থেকে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে অটুট রেখে যে বাস্তবিকই জনতার অভ্যুদয় অমোঘ হয়ে উঠতে পারে, তার এমন প্রদর্শনী ইতিহাসে কবে কোথায় দেখা গেছে? ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাই বাংলাদেশের জাগরণ নতুন এক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে বলা একেবারে অত্যুক্তি হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের আর এক শিক্ষাকে ভাস্বর চিত্রপটে উপস্থাপিত করল। এখনও বিশ্বে জনবিরোধী ধারা নির্মূল হয়নি, এখনও পশ্চিম-পাকিস্তানের দুর্বৃত্ত শাসকদের পৃষ্ঠপোষক শক্তিপুঞ্জ একান্ত প্রকট—যাদের নায়ক হলো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যারা 'ইউনাইটেড নেশন্‌সে' এবং অন্যত্র নিজেদের খল, ক্রুর, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্ববিবেককে পঙ্গু করে রাখল, যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপ্লবধুরন্ধর বলে বিঘোষিত মহাচীন জনগণের সর্বত্র-ঈপ্সিত সমাজতন্ত্রের আদর্শকে কালিমালিপ্ত করে ফেললো, যাদের চতুর জগদ্ব্যাপী চক্রান্তের ফলে বাংলাদেশের সমব্যথী ভারত ও বিশ্বের সমাজবাদী দেশগুলির পক্ষে ত্বরিদ্বেগে সেখানকার নিঃসন্দিগ্ধ মুক্তিসংগ্রামকে সহায়তা দেওয়া সম্ভব হলো না। তাই বাংলাদেশকে নামতে হলো অসম সমরে—আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পশ্চিমা ফৌজের বিপক্ষে প্রায় শুধু হাতে লড়তে হলো, অবর্ণনীয় অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে নিজস্ব মুক্তিবাহিনী গড়তে হলো, জীবনপণ করে প্রায় অসম্ভব পরিস্থিতিতে, বস্তুত একক সংগ্রামের ভয়ঙ্কর সংকল্পে অটুট থাকতে হলো।

মনে পড়ছে দিল্লিতে ১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে এক সভায়

বাংলাদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা শেষ করতেই শ্রোতাদের মধ্যে একজন বর্ষীয়ান, যিনি বহুদিন দেশের বিশিষ্ট নেতা বলে পরিচিত এবং কিছুকাল একটি প্রান্তের রাজ্যপালও ছিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'পাকিস্তানী ফৌজের বিরুদ্ধে ক'দিন বাংলাদেশ লড়তে পারবে মনে হয়?' তাঁর অনুমান কি, এই পাল্টা প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'এক-পক্ষকাল—তার বেশি কেমন করে চালাবে এই অসম যুদ্ধ?' অন্তরাত্মা প্রতিবাদ করে উঠলেও কিছু বলিনি—আর স্বীকার করছি, বেশ কিছু ভয় ছিল। পশ্চিমবাংলায় রাজনীতিতে যে নীচতা আর রিক্ততা তার কথা মনে কাঁটার মতো সর্বদাই ফুটে থাকে, আর পূর্ববাংলায় আমাদেরই মতো মানুষ তো রয়েছে—তাই ভয় ছিল, এ-আগুনের পরীক্ষায় তারা শিরদাঁড়া খাড়া রেখে লড়তে পারবে তো? যুদ্ধে অনভ্যস্ত, 'ইংরেজের হুকুমে কয়েক পুরুষ ধরে নিরস্ত্র, আজও সমরশিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত, এবং ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসী কর্তৃক ভীরু বলে নিন্দিত বাঙালি এই প্রায়-অসম্ভব সংঘর্ষে কোথায় দাঁড়াবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল বৈকি! 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' এই গানকে যারা সেই রুদ্র দিনে জাতীয় সঙ্গীত বলে ঘোষণা করে তাদের মনের গড়ন তো যুদ্ধোন্মাদ যন্ত্রমানব থেকে একেবারে আলাদা—পারবে কি তারা নির্মম মনুষ্যত্বহীন শত্রু শক্তির মোকাবিলা করতে, এ-ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সকল দুর্বল সংশয়ের অবসান ঘটালো বাংলাদেশের মানুষ—এককোটি ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য, কিন্তু অভাব হয়নি মুক্তিযোদ্ধার। যথাসম্ভব সাহায্য এসেছে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে, প্রতিবেশীর কাছ থেকে। কিন্তু তা তো ছিল সর্বদা অ-যথেষ্ট; নির্ভর করতে হয়েছে প্রথমে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশেরই অন্তর্নিহিত শক্তির উপর। 'ধন্যোঽহম্ কৃতকৃতার্থোঽহম্, সার্থকং জীবনং মম', বলতে পারি আমরা সবাই—অল্পাধিক পরিমাণে আমরা সাক্ষী থেকেছি এই দেদীপ্যমান্ অভ্যুত্থানের।

তাই আমাদের কথা বাদ দিলেও চক্ষুষ্মান বিদেশী পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, বাংলাদেশের লড়াই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আলজীরিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে, যাতে বহু লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিকতা মনে পড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকার অষ্টাদশ শতকীয় মুক্তিসংগ্রামকে। আমাদের কথা না হয় নাই বলি, বিদেশী বহু সাংবাদিক, যাদের পক্ষপাত পরিপূর্ণভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রতি, তারাও বলতে বাধ্য

হয়েছে হিটলারী নৃশংসতা আর ভিয়েৎনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অমানুষিকতার অনুরূপ ঘটনা বারবার এবং বিপুল ক্ষেত্র জুড়ে, বাংলাদেশে ঘটেছে। এজন্যই বলা যায় যে এই প্রথম ভারতভূখণ্ড রাখতে পারল ইতিহাসের বুকে তার প্রকৃত মুক্তিকামনার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য—এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল যাতে পরদেশে সংঘটিত বীরকাহিনী মাত্র থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহের যে বঞ্চনা তা অপসৃত হলো। এই প্রথম বাঙালি হিসাবে—এবং বাংলাদেশের সহায়ক রূপে ভারতবাসী হিসাবে—দুনিয়ার দরবারে বাস্তবিকই আমরা মাথা তুলতে পারলাম। নকলনবিশ বলে নয়, আত্মশক্তির উদ্দীপনায় অপরাজেয় হয়ে ওঠার সামর্থ্য আমরাও রাখি, একথা জগৎ জানল। বারবার বলি, এমন ঘটনা আমাদের ইতিহাসে কোথায় কবে ঘটেছে ?

সারা ভাবত যে উদ্বেলিত হয়েছে, তার মূল কারণ বাংলাদেশের এই অকুতোভয় আবির্ভাব। প্রথম দিকে প্রকৃতই, এবং বিশেষ করে বাংলার বাইরে ও দিল্লির কর্তৃপক্ষীয় মহলে প্রচুর সন্দেহ ছিল বাঙালির সামর্থ্য ও সংকল্পের দৃঢ়তা সম্বন্ধে। অচিরে সে-সন্দেহ দূর হলো এবং সর্বত্র সঞ্চারিত হলো বাংলাদেশ বিষয়ে এক অদ্ভুত শ্রদ্ধার মনোভাব। পাকিস্তান বিপর্যস্ত হচ্ছে বলে যে সহজ উৎফুল্লতা বহুজনের মনে এসেছিল, এবং তাকে উপজীব্য করে জনসংঘ, স্বয়ং-সেবক সংঘ প্রভৃতি অনেক আশা ও পরিকল্পনা করতে থাকে, তাকে একেবারে উপ্‌ছিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি অভিবাদনের চিত্তবৃত্তি এবং সেই সংগ্রামে একাত্ম হওয়ার কামনা। এজন্যই এক কোটি শরণার্থীর ভরণপোষণ নিয়ে কোনো কটূক্তি শোনা যায়নি ; এজন্যই আকুমারীহিমাচল বাংলাদেশের সংগ্রামে যথাশক্তির অধিক সাহায্যে ও উদ্যত হতে শঙ্কিত হয়নি। এজন্যই পাঞ্জাবীবহুল ভারতীয় ফৌজে বাংলাদেশ সম্বন্ধে উপেক্ষার লেশমাত্র দেখা যায়নি—এই প্রথম আমাদের ইতিহাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রকৃত সৌভ্রাত্র ও সহজ মানবিক মমতা নিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে যথার্থ মুক্তিফৌজের ভূমিকায় নামতে পেরেছে। হয়তো আমাদের চোখের সামনে ঘটছে বলে আমরা তলিয়ে ভাবি না, কিন্তু বাস্তবিকই এ-ঘটনা হলো যুগান্তকারী, এবং এর সাধকতম শক্তি হলো বাংলাদেশের অভ্যুত্থান।

সেই অতুলন অভ্যুত্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আজ বাংলাদেশের নেতাদের। প্রায় সমান দায়িত্ব হলো তার সহকর্মী, সহমর্মী, সহযোগী প্রতি-

বেশী ভারতের। বাংলাদেশ এবং ভারত মিলে নতুন ভবিষ্যতের সম্মুখীন আজ—মনে রাখতে হবে ইতিহাসের শিক্ষা, যে বিপ্লব ঘটানোর চেয়ে বিপ্লবোত্তর সমাজের সাফল্যসাধন প্রায়ই হয় কঠোরতর। এজন্যই প্রয়োজন, অভিনিবেশ সহকারে পথনির্দেশ ও তদনুযায়ী কর্ম। এজন্যই প্রয়োজন, মোহ আর ভ্রান্তি আর চিন্তারহিত অবিমৃষ্যকারিতাকে সম্পূর্ণ বর্জন। এজন্যই প্রয়োজন, যে-ঐক্য প্রকৃত প্রস্তাবে জনশক্তির মূল, সেই ঐক্যের সম্প্রসারণ। এজন্যই প্রয়োজন, যে অকিঞ্চিৎকর ভেদভাবাতুর উপাদান আজও বাংলাদেশের সমাজে আছে তাদের পরিহার করে এবং ক্ষেত্রানুযায়ী দমন করে, সমগ্র অবশিষ্ট শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একত্রিত রাখা। এজন্যই প্রয়োজন, যুদ্ধের উন্মাদনাপূর্ণ দিনগুলির আবেগকে সুপরিব্যাপ্ত অথচ সুস্থির, সংহত, যুক্তিসিদ্ধ, নীতিনিষ্ঠ করে রাখা। এজন্যই এত অপরিমেয় গুরুত্ব ন্যস্ত হয়ে রয়েছে বাংলাদেশের ঘোষিত পরিকল্পনার উপর—সেখানে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটবে, 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' দেশবাসী অবগাহন করবে।

বাংলাদেশ জানে কে তার শত্রু আর কে তার মিত্র—ভারতের অভিজ্ঞতাও হলো অনুরূপ। বাংলাদেশ জানে শত্রু বহুরূপী, নানা ছদ্মবেশে অনিষ্ট সাধনে সে কৃতসংকল্প। ভারতও জানে কিভাবে তার অবিমিশ্র সৌহার্দ্যেরও কদর্থ করার জন্য বৈরীপক্ষ নিয়ত সমুদ্যত রয়েছে। উভয় দেশ দরিদ্র ও নির্বিত্ত বলে আরও জানে অর্থানুকূল্যের ভান করে সাম্রাজ্যবাদ তার ঊর্ণনাভী জালে বেঁধে ফেলার শক্তি আজও কম রাখে না। বাংলাদেশের সংগ্রাম প্রচুর ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছে যে জনতা অপরাজেয়। আরও প্রমাণ করেছে যে এই অপ্রতিরোধ্য জনশক্তির ভিত্তি বিনা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ত্রিধারা একীভূত হতে পারে না।

ইসলামের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই যে সর্বমানবের সমান অধিকার হলো বিধির বিধান। অপরাপর ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, তেমনই ইসলামের বেলাতেও দেখা গেছে ধর্মের নামে অধর্মের ছড়াছড়ি—যার সবচেয়ে জঘন্য আর ন্যক্কারজনক আধুনিক উদাহরণ দেখিয়েছে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের নরাধম অনুচরবৃন্দ। কিন্তু যে বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী হলেন আনুষ্ঠানিক, ধর্মভীরু মুসলমান, তাঁরাই আজ ইসলামের ঐতিহাসিক অবদানকে সর্বজনের জীবনে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় যে নামছেন, তাতে সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বেই

-এর বহু আভাস মিলেছে। মুজিবর রহমান সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বাক্-বিস্তার করেন বলে মনে হয় না, কিন্তু বলা যায় তাঁর সম্বন্ধে—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি—

এ যেন প্রকৃতই তাঁর বর্ণনা। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা, বাঙালির দৈনন্দিন অভাবী জীবনের বঞ্চনা-সঞ্জাত সহজ মানবিক অনুভূতি যে-নেতৃত্বকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত রেখেছে, সে-নেতৃত্ব ভুলভ্রান্তি করুক বা না করুক, জ্ঞাতসারে জনবিরোধী পথে পা দিতে চাইবে না। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সম্মিলন যে ঘটবে, তার অস্বীকার এর চেয়ে শক্তিশালী আর কি হতে পারে ?

বহুকাল আগে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে ও পরিপ্রেক্ষিতে, ইংরেজ লেখক রাস্কিন্ (Ruskin) বলেছিলেন এক "রত্নস্তূপ"-এর কথা, "যাতে মর্‌চে ধরে না, যাকে পোকায় কাটে না, আর যার প্রতি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তা কলুষিত হয় না"। বাংলাদেশেব মুক্তি-কাহিনী হলো তেমনই এক "রত্নস্তূপ" যার চেয়ে মূল্যবান সম্পদ ভারত ভূখণ্ডের আজ নেই। সকল আঁধার আজও নিশ্চয় কাটেনি, বহু বাধা এখনও রয়ে গেছে, ভবিষ্যতের পসরায় কোন্ নতুন আর উদ্ভট প্রতিবন্ধক দেখা দেয় কে জানে ? কিন্তু অন্তত আপাতত, একান্ত সুদুর্লভ প্রসন্নতায় আমাদের চিত্ত যেন স্নাত, শুদ্ধ, শান্ত হয়ে আছে ; আর বাংলা-দেশেরই পরম প্রিয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাক্য দিয়ে তাকে সম্বোধন করতে মন চাইছে—

হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন উষাব খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক্ ক্ষয়
তোমারই হউক্ জয় ॥

গান্ধীজী

স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, একটা সময় ছিল যখন গান্ধীজী আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। সেই আচ্ছন্ন ভাব হয়তো পুরোপুরি কখনও কাটেনি বলে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে নিজেকে কিছু পরিমাণে অন্তেবাসী অনুভব করেছি বলতেও আমার দ্বিধা নেই। 'অন্তেবাসী' কথাটার একটা অর্থ হল 'ছাত্র'। আজও কমিউনিজ্‌ম্‌-এর ছাত্র বলে নিজের পরিচয় দেওয়া খুব একটা বিভ্রম বা অপকর্ম বলে পরিগণিত হবে না ভরসা করি।

ক্যাণ্টরবরি-র 'ডীন্‌' হিউলেট জন্‌সন্‌ ('লালডীন্‌' বলে যার আখ্যা ছিল) সোভিয়েট দেশ সম্বন্ধে তাঁর সুবিখ্যাত বই লিখতে গিয়ে প্রথমে আত্মপরিচয় বলে একটা অধ্যায় দিয়ে আরম্ভ করেন। যুক্তি ছিল এই যে সোভিয়েট সমাজ এমনই এক বস্তু ("phenomenon") যে সে-বিষয়ে যিনি লিখছেন, তাঁর নিজের কথা কিছু জানা না থাকলে সোভিয়েট সম্বন্ধে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া বুঝে ওঠা কঠিন হবে। গান্ধীজীকে কে বা কারা যেন একবার বর্ণনা করেছিলেন "a human phenomenon" বলে। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে লেখকের নিজের কথা একটু বলে রাখা ভালো। অবশ্য একাজটি করা দরকার অহমিকা এড়িয়ে—তা নইলে এর কোনই সার্থকতা নেই।

মাঝারি অবস্থার বাঙালী 'ভদ্রলোক' পরিবারে আমার জন্ম। কলকাতাতেই জন্ম, লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষা। ছাব্বিশ মাইল দূরে হালিশহরে আমাদের আদি নিবাস। কিন্তু অতি কদাচিৎ সন্তর্পণে সেখানে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা মাত্র থেকে কলকাতায় ফেরা—আমকাঁঠালের সময় হয়তো পিতামহের সঙ্গে গিয়ে দেশের বাগানের ফল কিছু নিয়ে আসা—এ-ছাড়া গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। তাই শহুরে আবহাওয়াতেই আমরা ভাইবোনেরা সবাই মানুষ হয়েছি। বিলাসিতা ছিল না। কিন্তু সাংসারিক অভাব আমরা অন্তত ছেলেবেলায় কখনও বুঝতে পারিনি। পেরেছি পরে যখন বিলেত থেকে আমাকে ব্যারিস্টারী পাশ করিয়ে আনার জন্য কিছুটা আর্থিক সংকট বোধ হয় ঘটেছিল। কমিউনিজ্‌ম্‌-এর অমোঘ মোহ আমাকে ব্যারিস্টারীর আপাতকঠিন অথচ

অর্থার্জনের সমুজ্জল পথ থেকে প্রকৃতপ্রস্তাবে সরিয়ে রাখায় নিজের পরিবারের কাছে নিছক সাংসারিক যে-ঋণ তা পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সে অন্য কথা।

খুব গভীরভাবে না হলেও, বেশ খানিকটা ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে লেখাপড়ার চর্চা আমাদের পরিবারের আবহাওয়ার অঙ্গীভূত ছিল। ইংরিজী, বাংলা, সংস্কৃত বই বাড়িময় ছড়িয়ে ছিল। শোবার ঘর, খাবার ঘরের নিষ্কৃতি ছিল না। বিরাট সব খবরের কাগজের ফাইল সাজানো থাকত, যতদিন না সময় আর আমাদের দেশের সংখ্যাহীন কীটকুল তাদের অন্ত্যেষ্টি না ঘটাত। প্রতি রবিবার সাম্‌নের বৈঠকখানায় বাবার বন্ধুরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যেতেন—তাকে আড্ডা বলতে সংকোচ আসে। কারণ মাঝে মাঝে হাসির রোল উঠলেও (যে-ধরণের হাসি আজকের বাঙালীকে হাসতে দেখি না) আলোচনা চলত গুরুগম্ভীর বিষয়ে—রাজনীতি, সাহিত্য আর না জানি কত কি ব্যাপার নিয়ে। একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত সেখানে আমাদের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। কিন্তু বাড়ীর আবহাওয়াতেই ছিল লেখাপড়া আর রাজনীতি বিষয়ে এক ধরণের নাতিগভীর অথচ সর্বত্রপ্রসারী আগ্রহ যা যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গেই আত্মস্থ হতে পারত। তাই কিশোর বয়সে মনের দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার পংক্তি ; "জয় মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধীর গাহো জয়।"

একেবারে অবাধে, নিজের সঙ্গে কিছুটা লড়াই না করেই যে এ-ঘটনা ঘটেছিল, তা নয়। যাঁরা সাংবাদিক, তাঁরা রাজনীতিক্ষেত্রের বিরাট পুরুষদের তত একটা সমীহের চক্ষে দেখেন না। "ভাই হাততালি"-র অন্বেষণে ব্যস্ত রাজনীতিবিশারদদের নানা দোষ ও দুর্বলতা সাংবাদিকদের কাছে সহজে ও স্বাভাবিকভাবে ধরা পড়ে থাকে। মানুষ সম্বন্ধে অত্যুৎসাহী হওয়া তাই সাংবাদিকদের পক্ষে বেশ একটু বাধে। আমার পিতামহ বাংলা সংবাদপত্র জগতে পথিকৃৎ না হলেও ঠিক তাদের পরবর্তী যুগে একজন অগ্রগণ্য সাংবাদিক বলে পরিচিত ছিলেন। আমার পিতা ছিলেন ব্যবহারজীবী, শিক্ষক, প্রকৃত বাগ্মী ও সুলেখক ; "বেঙ্গলী" পত্রিকা পরিচালনে তিনি বহুদিন স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁরা উভয়েই গান্ধীকে খুব সুনজরে দেখতেন না—ভাবতেন লোকটা উদ্ভট, শক্তিমান্ সন্দেহ নেই কিন্তু কেমন যেন বেখাপ্পা ধরণের—সাহসী নিশ্চয়ই, কিন্তু তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা যায় না, কখন্ কি করে বা বলে বসে তার স্থিরতা নেই, যুক্তির নিরিখে

আটকানো যায় না, ফসকে যায়। আমার পিতামহের সঙ্গে প্রায়ই তখন আমাকে যেতে হত "দৈনিক বসুমতী" অফিসে। ঐ কাগজ ছিল গান্ধীজীর সমর্থক. ("বসুমতীতে"-তে সর্বদা লেখা হত "গন্ধী")। কিন্তু কাগজের অফিসে যে-আবহাওয়া তাতেও ছিল একরকম দো-মনা ভাব, যা খুব প্রকট না হলেও আমার স্কুলছাত্র মনের কাছেও ধরা পড়ত। হয়তো এর কারণ হল যে বাংলা তার সহজে উদ্রিক্ত চিত্তাবেগ নিয়ে গান্ধীযুগে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তার মনে যেন ছিল বহু দ্বিধা, বহু স্বগতোক্ত প্রশ্ন। বারবার গান্ধী আন্দোলনে বাংলা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছে, কিন্তু কোথায় যেন সেই সাড়ার মধ্যে অস্বস্তি সর্বদাই থেকেছে।

এত কথা তখন আমার কিছুই জানা ছিল না। তবে এটা ঠিক যে ১৯২০-২২ সালে সারা দেশের হাওয়ায় এমন একটা অজানা উদ্দীপনা ছিল যে তা আমার মনকে নাড়া না দিয়ে পারেনি। আজ্‌কের ছেলেরা বুঝবে না, কিন্তু তখন পরাধীনতার জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠা আমাদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। সেই জ্বালা প্রশমনের চেষ্টায় জাতিগর্বের সন্ধানে ছেলেবেলাতেই আমরা গিয়েছিলাম—ইতিহাস মনকে আকর্ষণ করেছিল আমার দেশের "অতীত গৌরব কাহিনী" (সরলা দেবীর এক প্রসিদ্ধ গানের আরম্ভ হল এই) জানার সম্ভাবনা দেখিয়ে। বিলম্বিত লয়ে হয়তো তখন গান শুনেছি—"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত-তোমারি"। স্তব্ধ অপরাহ্ণে ভিক্ষুক এসে গেয়েছে "ক্ষুদিরামের ফাঁসি"-র গান—"একবার বিদায় দাও মা আমায়, ঘুরে আসি"। সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে "নগরের পথে রোল" উঠেছিল—"গান্ধীজী! গান্ধীজী"! কিশোর মনকে আকুল করে গান্ধী যেন উঠে এসেছিলেন দুঃখিনী ভারতবর্ষের গৌরবযুগের ইতিহাসের জীর্ণ পাতা ভেদ করে। এমন জনগণমন-অধিনায়কের আবির্ভাব পূর্বে কবে হয়েছে এদেশে, জানি না—পরেও কখনও দেখিনি। আজ অভিজ্ঞতার তৃতীয় নেত্র দিয়ে বিচার করতে গেলে হাসি পেতে পারে। কিন্তু তখন বাস্তবিকই যেন সবাই ভেবেছিলাম—"এসেছে সে একদিন। লক্ষপরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ।" মনে পড়্‌ত রবীন্দ্রনাথের অজর ছন্দে গুরু গোবিন্দের বহুবর্ষব্যাপী সাধনার কথা—গান্ধীজী বুঝি তাঁরই মতো বলছেন, "আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগুক্‌ সকল দেশ।"

অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার বয়স তখনও আমাদের নয়। স্কুলের

দরজায় কিছুদিন হৈচৈ চলেছে, বোধ হয় কয়েক সপ্তাহ ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে স্কুল কামাই প্রায় সবাই করেছি। আমাদের বাড়ির অতি নিকটে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (যার বর্তমান নাম হল রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। স্কোয়ারের সাম্‌নে তখনকার হিসাবে এক মস্ত বাড়িতে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গৌড়ীয় বিদ্যায়তন, সুভাষচন্দ্র বসু যার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। "গোলামখানা" বলে ঘোষিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট-করে-আসা ছাত্রদের ভর্তি করার আয়োজন কিছুটা সেখানে পরে হয়েছিল। স্কুলগুলোর দিকে আন্দোলনের নজর ছিল অল্প কয়েক দিন মাত্র। আমরা তাই আন্দোলনে সামিল ঠিক হইনি, কিন্তু পড়াশুনার পালা কিছুকাল আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশের হাওয়ায় তখন এক ধরনের জাদু মিশে ছিল। বেশ মনে আছে বাড়ির পুরোনো হিন্দুস্থানী চাকর এবং ঝি (যাদের কখনও আমরা পরিবারের বহির্ভূত মনে করতে পারিনি) আমাদের কাছে গল্প করত গান্ধী মহারাজের অলৌকিক শক্তির কথা। তিনি বুঝি ইচ্ছা করলেই যখন যেখানে খুসী হাজির হতে পারেন, সাধারণ মানুষ তিনি নন্, তিনি মহাত্মা, দেবতার অংশ!

অলৌকিক ব্যাপার বাদ দিয়ে সেদিনের বাস্তব বহু ঘটনা স্মরণ করলে আজও যেন রোমাঞ্চ আসে। হিন্দু মুসলমান একত্র মিলে যে দুর্জয় সংহতির পরিচয় তখন দিয়েছিল, ক্ষণস্থায়ী হলেও তার দ্যুতি সে। ভুল্‌বার নয়। মনে পড়ছে ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর কলকাতায় হরতালের কথা—অভূতপূর্ব সে ঘটনা, মহানগরীর জীবনছন্দ সেদিন স্তব্ধ, জনতা যেন পূর্ণ জাগ্রত, নবজন্মের প্রতীক্ষায় উদ্বেল, সংকল্পের দৃঢ়তায় অটল। বোম্বাইয়ে সেদিন কিছু হাঙ্গামা হয় যা মহাত্মাজীকে বিচলিত করে—জনজাগরণ বিষয়ে তাঁর মনের মৌল দ্বিধা ছিল ঐ বিচলিতির কারণ, কিন্তু তখন আমরা তা বুঝিনি। তলিয়ে ভাব্‌বার সুযোগ ও সামর্থ্য আমাদের ছিল না। বারবার গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বৎসর (১৯২১) শেষ হওয়ার পূর্বে স্বরাজ আমাদের আয়ত্ত হবে। বেশ মনে আছে একটা ঘটনা যা আজ্‌কে মজাদার মনে হয় অথচ তখন একেবারেই উদ্ভট বা হাস্যকর হয়তো ভাবিনি। আমার দাদুর সঙ্গে "বসুমতী" অফিস যেতাম নেবুতলা স্ট্রীট (বর্তমানে শশীভূষণ দে স্ট্রীট) দিয়ে। পথে প্রায় দেখা হত এক বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে। তিনি একদিন বেশ চিন্তিত মুখে আমার

পিতামহকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, দেখুন, স্বরাজ তো এসে গেল, এখন আমার জমানো নোটগুলোর কি ব্যবস্থা করি বলে দেবেন?" দাদু তাঁকে নির্ভয়ে থাকতে উপদেশ দেন, "স্বরাজ" সরকার ইংরেজের টাকা আর নোট-গুলোকে একেবারে বাতিল করে দেবেন না বলে আশ্বস্ত করেন।

আরও অনেক কথা সহজে মনে আসে, যার উল্লেখ দরকার নেই। শুধু ইচ্ছা করছে বলতে তখনকার একটা স্মৃতির কথা। বসুমতীর অফিসে তখন প্রায় প্রতিদিন আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর তখন একমুখ দাড়ি, অথচ সৌম্য চেহারা। প্রায়ই তাঁকে নিয়ে কৌতুক চল্‌ত তাঁর সামনেই। সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ঘরে একটি আরামকেদারায় শরৎচন্দ্রের স্থান নির্দিষ্ট থাকত। এলেই বলা হত, এই যে এলেন (বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পরবর্তী স্বত্বাধিকারী, অতুলনীয় বিজ্ঞাপন লেখক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়) "বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী"! গ্রাম সম্পর্কে আমার পিতামহের ভাগিনেয় বলে শরৎচন্দ্র তাঁর পদধূলি নিতেন, প্রতিদিনই নিতেন বলে মনে আছে। তখন শরৎচন্দ্র গান্ধীজীর অনুগামী, নিজে চরকা কাটতেন কিনা জানিনা কিন্তু খাদি বিষয়ে উৎসাহী। আমার দাদুর কাছে শুনলেন নেবুতলা স্ট্রীটে পূর্ববাংলা থেকে আসা ক'জন এক চরকার দোকান খুলেছে, একশো নম্বর পর্যন্ত সুতো কেটে তারা দেখাচ্ছে। শরৎচন্দ্র শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, আমাকে বললেন, চলো, নিয়ে চলো সেই দোকানে। জীবনে অন্তত একদিন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথ প্রদর্শক হতে পেরেছি গান্ধীজীর কল্যাণে!

বর্ষশেষ হল। ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি অতিবাহিত হল, স্বরাজের আবির্ভাব ঘটল না। তখনও দেশবাসীর উৎসাহে উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়েনি, তখনও শেষ সংগ্রামের উদগ্র প্রতীক্ষায় দেশ আকুল। ফেব্রুয়ারী মাসে চৌরীচোরায় পুলিশ চৌকী বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে জলে যাওয়ার পর হঠাৎ গান্ধাজী একেবারে থমকে দাঁড়ালেন, বললেন "স্বরাজ আমার নাকে আনছে নোংরা দুর্গন্ধ", অহিংসা নীতি থেকে এমন বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ঘোষিত সংগ্রাম তাই প্রত্যাহৃত হল! দেশ যেন স্তম্ভিত বিস্ময়ে নেতার নির্দেশ শুনল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, আশাভঙ্গের বেদনায় ক্লিষ্ট হল। কিন্তু তখনও গান্ধীজীর প্রভাব অটুট—জেল থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপৎ রায়, মোতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নায়করা প্রখর আপত্তি জানালেন,

কিন্তু সর্বাধিনায়কের মন টল্‌ল না। অনতিবিলম্বে, সংগ্রাম স্থগিত থাকার সুযোগ নিয়ে সরকার আঘাত হান্‌ল—গান্ধীজী গ্রেফ্‌তার হলেন, বিচারে তাঁর হল ছ'বৎসর কারাদণ্ড। বিচারগৃহে তিনি বললেন, "আগুন নিয়ে খেলা করেছি, ছাড়া পেলে আবার করব।" বললেন, "অহিংসা আমার বিশ্বাসের প্রথম ও শেষ কথা, কিন্তু আমাকে বাছাই করতে হয়েছে। হয় আমাকে মেনে নিতে হয় এমন এক শাসনব্যবস্থা যা আমার দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে, নয় এমন লড়াইয়ের ঝক্কি নিতে হয় যাতে দেশের লোকের ক্ষিপ্ত ক্রোধ ফেটে পড়তে পারে।" ভাস্বর ভাষায় বললেন "আমার দেশের শহরবাসীরা জানেনা যে কোটি কোটি গ্রামের মানুষ ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে পড়ছে। তারা জানেনা যে তাদের তুচ্ছ আরাম হল বিদেশী শোষকের হয়ে কাজ করার দালালী, আর মুনাফা এবং দালালী দুই-ই শুষে নেওয়া হয় জনগণের কাছ থেকে। তারা বোঝেনা যে আইনের নামে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ভারতের শাসন চালানো হয় জন-সাধারণকে শোষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কোন যুক্তির বাহার কিম্বা সংখ্যা নিয়ে জাদুকরী উড়িয়ে দিতে পারে না সেই সাক্ষ্য যা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কঙ্কালসার মানুষ দেখে মেলে। আমার মনে কোন সংশয় নেই যে যদি উর্ধে ভগবান থাকেন তো ইংলণ্ড এবং এদেশের শহরবাসী উভয়কেই জবাবদিহি করতে হবে এমন অমানুষিক অপরাধের জন্য, যার তুলনা বোধ হয় ইতিহাসে নেই।"

উপস্থিত থেকেছি "দৈনিক বসুমতীর"-সম্পাদকীয় কক্ষে যখন গান্ধীজীর ছ'বছর জেল হওয়ার পর "রাজরোষে গুরু গন্ধী" প্রবন্ধটি লিখিত ও পঠিত হয়। "মাসিক বসুমতী" তখন সম্প্রতি প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে। তার এক সংখ্যায় প্রকাশ হল প্রমথ চৌধুরীর ("বীরবল") একটি রচনা—যিনি ছিলেন মহাত্মার প্রখর সমালোচক, তিনিই মাথা নত করে বললেন, যে বিবৃতি আদালতে গান্ধীজি দিয়েছেন, তা আমার চোখ খুলে দিল, দেখছি তাঁকে প্রকৃতই যেন গীতার উক্ত "স্থিতপ্রজ্ঞ" মহাপুরুষরূপে।

তার পরে দেশের দুর্দিন এসেছে, জনমনে উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে ক্রমশঃ প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে—গোটা দেশ যেন দারুণ স্নায়বিক অবসাদে ক্লিষ্ট হয়েছে আর তারই প্রতিক্রিয়াতে সুপ্ত বিকার যেন জেগে উঠেছে। ১৯২৩ সাল থেকে শুরু হয়ে গেছে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ যা ছিল প্রায় অকল্পনীয়—উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কোহাট থেকে আরম্ভ করে দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা পর্যন্ত করাল

গতিতে এগিয়েছে। গান্ধী-নেতৃত্ব সম্বন্ধেও তখন বহুজনের মনে বহু প্রশ্ন উঠেছে। যে সন্ত্রাসবাদীরা গান্ধীজীকে কথা দিয়েছিলেন কিছুকাল দেশকে তাঁর পথ পরখ্ করার সময় দেবেন, তাঁরা কখনই খুব ভালোমনে তা বলেননি। স্বভাবতই তরুণ বিপ্লবী মনে বিক্ষোভ জমে উঠ্‌তে লাগল। ক্রমশ তাঁরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী কাজে নামলেন। আমাদেরই পাড়ায় কাছাকাছি অঞ্চলে পুরানো সন্ত্রাসবাদী নেতা কিছু ছিলেন। তাদের ধারায় নবীনেরা এগিয়ে এলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন শাঁখারীটোলা অঞ্চলের গোপীনাথ সাহা, সন্তোষ কুমার মিত্র। পরে জেনেছি শাঁখারীটোলা—তালতলা—বৌবাজার এলাকা ছিল ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক অনন্ত সিং—গনেশ ঘোষের কিছুকালের আস্তানা। খাস্ কংগ্রেসের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল গঠিত হল, অসহযোগপন্থা ছেড়ে কাউন্সিলগুলোতে ঢুকে ভিতর থেকে সেদিনের নিতান্ত সীমিত শাসন-ব্যবস্থাকে বিকল করার কথা দেশ তাঁদের কাছে শুনল। গান্ধীজীর একছত্র আমলে যে মোহাচ্ছন্ন ভাব দেশে ছিল তার বদলে কিছুটা সুস্পষ্ট রাজনীতির ছক্ দেখা গেল। কিন্তু পূর্বতন মাদকতা তখন অনুপস্থিত। দেশের সাম্‌নে গান্ধীজীর মূর্তি প্রাক্তন বিভূতিমণ্ডিত না হলেও কিন্তু তাঁর মর্যাদা ও প্রভাব ছিল বিপুল। ঠিক তাঁকে "The lost leader" (হারিয়ে যাওয়া নেতা") ভাব্‌বার মতো মনোবৃত্তি কখনও দেশের হয়নি বলেই ধারণা। কোথায় যে দেশের-সঙ্গে-নাড়ীর-টানে বাঁধা একটা সত্তা তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, যার ফলে অতবড় ওলটপালট সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয় নি।

মনে আছে কলেজ জীবনে অধ্যাপক মশায়রা নোট দিলে সচরাচর তা না লিখে ক্রমাগত গান্ধী রচনা থেকে উদ্ধৃতি খাতায় লিখে চলেছি। বহু উদ্ধৃতি তখন কণ্ঠস্থ ছিল, এখনও যে একেবারে নেই তা নয়। বেশ মনে পড়ে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে পড়েছিলাম মার্কিন পাদ্রী জন্ হেন্‌স্ হোম্‌স্-এর লেখা গান্ধী সম্বন্ধে গ্রন্থ। আজও ভুলিনি তাঁর এক বচন: "আমি যখন রম্যাঁ রলাঁ বিষয়ে ভাবি তখন মনে পড়ে টলস্টয়-এর নাম। যখন লেনিন সম্পর্কে ভাবি তখন মনে আসে নেপোলিয়নের নাম। আর যখন ভাবি গান্ধী সম্বন্ধে, তখন মনে আসে যীশুখৃস্টের কথা। গান্ধী যাপন করছেন যীশুর জীবন, গান্ধীর মুখে শুনছি যীশুর বাক্য, যীশুরই মতো তিনি যন্ত্রণা ভোগ করছেন, সতত প্রয়াসে নিযুক্ত আছেন, আর একদিন যীশুরই মতো পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে

গৌরবমণ্ডিত মৃত্যুবরণ করবেন।" এ-ভাবের কথা আমাদের তৎকালীন অপরিণত অথচ একান্ত দেশাভিমানী মনকে অভিভূত করেছিল স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

কলেজে প্রাইজের টাকায় কিনে পড়েছি রম্যাঁ রলাঁ রচিত "মহাত্মা গান্ধী" গ্রন্থটি। ভাববার চেষ্টা করা গেছে ১৯২১ সালের অক্টোবরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বিতর্ক এবং তার বিপুল তাৎপর্য সম্বন্ধে। "সত্যের আহ্বান" আখ্যা দিয়ে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীজীর প্রতি অনপনেয় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও মৌলিক মতভেদের কথা তিনি বলেন। অসহযোগ আন্দোলনের নেতিবাচকতা, পশ্চিমী সভ্যতা বিষয়ে মহাত্মার ঐকান্তিক বিরাগ, বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে মানবঘৃণার আভাস, শিল্পসাহিত্যের মহিমা সম্পর্কে গান্ধীজীর অনীহা প্রভৃতির উল্লেখ করে কবি মনের খেদ প্রকাশ করেন, অন্য পথের চিন্তা করতে তাঁকে অনুরোধ করেন। এর উত্তর দেন গান্ধীজী— দুই মহামানবের এই পত্রালাপ আমাদের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা।

মহাত্মার উত্তরে দেখা গিয়েছিল তাঁর পক্ষে একান্ত অনভ্যস্ত চিত্তাবেগের প্রাবল্য: "যুদ্ধ যখন চলে, তখন কবি রেখে দেন তাঁর বীণা, স্কুলের ছাত্র বই ঠেলে রাখে, উকিল আদালতের রিপোর্ট সরিয়ে রাখে। যুদ্ধ শেষ হবার পরই কবি তাঁর নিজের সুরে গাইতে পারবেন। বাড়ীতে যখন আগুন লেগেছে, তখন বাসিন্দাদের সবাইকে বার হতে হবে, বালতি করে জল এনে আগুন নিভাতে হবে। আমার চারদিকে যখন সংঘষ রয়েছে, তখন আমার একমাত্র কর্তব্য হল ক্ষুধিতকে অন্নদান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষ যেন একটা বাড়ী যাতে আগুন লেগেছে, কারণ দিনের পর দিন মনুষ্যত্ব এখানে ঝলসানো হ'চ্ছে, খিদেয় মানুষ মরছে যেহেতু খাবার কেনার টাকা রোজগারের মতো আয় নেই।·· বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে আমি আমার লজ্জারই মুখাগ্নি করছি। ···কবির কতকগুলো সহজাত অনুভূতি আছে, তাই তিনি বাঁচেন আগামী দিনের জন্য। আর তিনি স্বভাবতই চান্ আমরাও তাই করি। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি তাঁর আঁকা ছবি—দেখি সুন্দর পাখীরা ভোরবেলা বন্দনাগান কণ্ঠে নিয়ে আকাশে উড়ে চলেছে। এই পাখীগুলি দিনের বেলা খেতে পেয়েছে, তারা উড়ছে কারণ তাদের ডানাগুলি বিশ্রাম পেয়েছে, তাদের শিরায় পূর্বরাত্রে নূতন রক্তের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু আমার যন্ত্রণা হল এই যে আমি দেখেছি এমন পাখী যারা এত দুর্বল যে অনেক

সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও তারা সামান্য একটু ডানা নাড়তে পারেনা। ভারতবর্ষের আকাশের নীচে যে মানুষ-পাখী বাস করে, সে যখন জাগে তখন পূর্বরাত্রে বিশ্রামের ভাণ যখন করেছিল সে-তুলনাতেও সে দুর্বল। লক্ষ লক্ষ মানুষের বেঁচে থাকা হল যেন একটা নিরবধি স্বপ্নাবেশের সামিল। এই যে দুর্গতি তার বর্ণনা সম্ভব নয়, নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে একে বোঝা যায় না। যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট এমন রোগীকে দেখেছি যাকে কবিরের দোহা শুনিয়েও সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। কোটি কোটি ক্ষুধিত চায় একটি মাত্র কবিতা—বলকারী খাদ্য। এ বস্তু তাদের দান করা যায় না। তাদেরই তা অর্জন করতে হবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবেই তারা পারবে, অন্যথা নয়…।"

রম্যাঁ রলাঁ-র মন্তব্য হল অপূর্ব সুন্দর: "[এই পত্রালাপে দেখি] শিল্পের স্বপ্নসৌধের সামনে বিশ্বের দুর্গতি দাঁড়িয়ে উঠে বলছে: 'সাহস করে বলতে পারো আমি নেই?' এই ছবি গান্ধীকে কখনও বিশ্রাম নিতে দেয়নি, এজন্যই তিনি পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কবিকে উপদেশ দিয়েছেন: 'অপরের মতো কবি চরকা কাটুন, নিজের বিদেশী কাপড় চোপড় জালিয়ে ফেলুন! এটাই হল আজকের কর্তব্য। আগামীকালের ভার ঈশ্বরের হাতে। গীতায় বলা হয়েছে, ধর্ম আচরণ করো!"

এই ঐতিহাসিক বিতর্ক বর্তমান ভারতের মানসিকতায় আলোড়ন আনবে কিনা জানিনা, কিন্তু আমাদের তরুণ বয়সে মাতিয়ে তুলেছিল। আর হয়তো বলা যায় যে, মন যদি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে তো হৃদয় এসে বাধা দিয়েছে। সন্দেহ নেই যে চিন্তা ও কর্মে বহু অপূর্ণতা সত্ত্বেও গান্ধীজী দেশের যেভাবে হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন তা অতুলন। এই সংঘাতের কথাই উক্ত হয়েছে দেখলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও উপদেষ্টা স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ১৯২১ সালের শেষভাগে লেখা রচনায়। স্বনামধন্য সাংবাদিক তখন স্বল্পপরিচিত তরুণ, কিন্তু বিপিনচন্দ্র পালের মতো ব্যক্তির বিপক্ষে কথা তিনি বলেছিলেন: "বাংলায় তত্ত্ব ছিল, আবার বলি বাংলায় তত্ত্ব ছিল সাধনা ছিলনা, আদর্শ ছিল নিষ্ঠা ছিল না, মেধা ছিল দৃঢ়তা ছিল না। বাংলা যাহা করিতে পারিত, বাঙালী নেতারা তাহা করিতে দেয় নাই।" কথাগুলি যেন আজও প্রবল ভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু তা যাক্। সত্যেন্দ্রনাথ সহজে বাক্যোচ্ছাস করতেন না, কিন্তু ১৯২১

সালে গান্ধীজী সম্বন্ধে তাঁর লেখনী থেকে বার হল: "এই মহামানবের চরণ তলে এক মহাপ্রলয় দুলিতেছে, সৃষ্টিও বুঝি বা বহুদূরে নয়। দুঃখের বিষয় এক বিপরীত শিক্ষাসভ্যতায় বিপর্যস্ত ইংরাজীনবীশ ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীকে ষোল আনা দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছে না। আমরাও তাই পারিতেছি না। তথাপি পর্বতের নিকট মাথা নত হইয়া আসে, সমুদ্রের অবাধ বিস্তারে চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া থাকে, আকাশের অসীম নীলিমায় চিত্ত উদাস হইয়া যায়, এক বিরাট ভূমিকম্পের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষ স্থির থাকিতে পারে না, প্রলয় ঝঞ্ঝার বিচার বিশ্লেষণ প্রতিবাদ শুষ্ক তৃণের মতো কোথায় উড়িয়া যায়।" ("জীবনী প্রসঙ্গ" পৃঃ ৫১-৫৩)

বিদ্রোহী মন নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, পরবর্তী জীবনে গান্ধী এবং অন্যান্য বহু মহাভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু তাঁর কাছে একদা গান্ধীমূর্তি কিভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল, এই তথ্যের মূল্য আছে। অন্তত আমার মতো যারা গান্ধীযুগের হর্ষ ও বিষাদের কথঞ্চিৎ আস্বাদ পেয়েছে তাদের কাছে আছে।

একেবারে পুরোপুরি গান্ধীবাদী অবশ্য ঠিক হতে পারি নি কখনও—সেটা মানসিক জাড্যের জন্য কিম্বা মনের কোণে ভিন্ন মতের অঙ্কুর ছিল বলে কিনা, তাই নিয়ে গবেষণায় শুধু সময় নষ্ট হবে। তবে বলে রাখা হয়তো উচিত যে আমি নিজে হাতে চরকা কখনও কাটিনি—সভয়ে স্বীকার করছি আজ পর্যন্ত হাতের কোন কাজ, এমনকি পেন্সিল কাটার মতো কাণ্ড আমার কাছে কঠিন ব্যাপার—তবে বছর ছয় সাত খাদি পরেছি, খাদি প্রদর্শনীগুলোয় ছুটে বেড়িয়েছি, যেমন স্বদেশী দেশলাই-এর খোঁজে (যা তখন দুর্লভ ছিল) অনেক হেঁটেছি। খাদি পরার খেসারৎ মাঝে মাঝে দিতে হয়েছে বাড়ির লোকের বিদ্রূপে। প্রতিদিন কাচা কাপড় পরতে হবে, অথচ খদ্দরের ধুতি ভিজে ঢোল হয়ে সহজে শুকোয় না; মনে আছে বর্ষার দিনে ঘরের ভিতর খদ্দর ধুতি শুকোতে দিয়ে সংগোপনে বসে তাকে পাখার হাওয়া দিতে গিয়ে ধরা পড়েছি, সকলের হাসির খোরাক কিছু জুটেছে। গান্ধীভক্তির জের টেনে কয়েক বছর মাছ মাংস খাওয়া ছেড়েছিলাম। পরে দেখলাম কাজটা সহজ অথচ এমন কিছু ব্যাপারই নয়—অত অল্প মূল্যে আত্মপ্রসাদ কেনার চেষ্টা তাই বর্জন করেছিলাম। গান্ধীপথে চলতে গিয়ে কোথায় যেন ভাবের ঘরে চুরি ঘটে যাচ্ছে, এই আশঙ্কা থেকে থেকে তখন জেগেছে। সন্ত্রাসবাদের

পুনরাবির্ভাবও মনের দরজায় নূতনভাবে ধাক্কা দিচ্ছিল। কাটুনী সংঘ আর গ্রামোদ্যোগ নিয়ে গান্ধীজীর ব্যস্ততা একটু কটু লাগতে আরম্ভ তখন করেছে। হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ক্রমশ বিষিয়ে উঠতে থাকল, গান্ধীজীর সহোদরপ্রতিম মহম্মদ আলী—শৌকত আলীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চেষ্টাকেও কংগ্রেস নেতারা ব্যর্থ করে দিলেন, মাঝে মাঝে ঘটা করে 'ঐক্য সম্মেলন' এবং গান্ধীজীর অনলস লেখনীর আপ্তবাক্য ভিন্ন অন্য কোন দাওয়াই দেখা গেল না। ক্রমেই মনে প্রশ্ন উঠতে লাগল, গান্ধীপন্থায় কোথায় যেন গভীর একটা গলদ আছে। স্পষ্ট না হলেও কিছুটা আবছাভাবে মনে কথাটা উঠতে থাকল।

কলেজে রাষ্ট্রনীতি পড়ানো হত বটে, কিন্তু বইয়ের পাতা এবং অধ্যাপকের বক্তৃতা থেকে এ-ধারণাই আসত যে সোশালিজ্‌ম্‌ বস্তুটি মোহনীয় বটে, কিন্তু স্বর্গরাজ্যের এপারে তার সন্ধান পাওয়া শক্ত। আমরা যখন কলেজে উঁচু ক্লাশের ছাত্র, তখন কলকাতার পথেঘাটে মজুর কৃষকের পদধ্বনি শোনা যেতে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা তখনও আমাদের কাছে অজানা। লেনিন-ট্রট্স্কির নাম ছাড়া আর বেশি কিছু জানবার সুযোগও তেমন হয়নি। আর কলেজে কয়াজী-সাহেবের মতো মস্ত পণ্ডিত অধ্যাপকের কাছে লেনিনের যে বর্ণনা শুনেছিলাম তা একেবারেই মোহনীয় নয়। ১৯২৭-২৮ সালে শ্রমিক কৃষক পার্টির পক্ষ থেকে আয়োজিত বড় বড় মিছিল দেখে ভালো লেগেছিল। ১৯২৮ সালে জওয়াহরলাল নেহেরুর "সোভিয়েট রাশিয়া" বইটি সংগ্রহ করেছিলাম। আর চোখ বুলোতে পেরেছিলাম Rene Fulop-Muller-এর "The Mind and Face of Bolshevism" এবং "Lenin and Gandhi" বই দুটিতে। তখনও সোভিয়েটের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানতাম না, মার্কস্‌বাদের বিপুল ভাণ্ডার সম্বন্ধে ছিলাম প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

একটু অপ্রতিভ লাগছে স্বীকার করতে যে আমার মনের এই ফাঁক এবং ফাঁকি থেকে অন্তত কতকটা রেহাই পাবার চেষ্টা করার প্রকৃত সুযোগ পেয়েছিলাম ইয়োরোপে প্রায় পাঁচ বৎসর থাকার কল্যাণে। ছেলেবেলা যে ভাবে মানুষ হয়েছিলাম, তার ফলে ভারতীয়ত্ব আমার মজ্জাগত, একথা বড়াই না করে বলতে পারি। খাঁটি ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী আমার মন সর্বদা চেয়েছে এমন এক চিন্তার সুঠাম অথচ বিপুল চিন্তায় যা সকল জ্ঞান ও সকল

অভিজ্ঞতাকে আধৃত করে রাখতে পারে। বুঝিয়ে বলা শক্ত, কিন্তু মার্কস্‌বাদ ঐ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমার কাছে প্রচণ্ড আবেদন নিয়ে এসেছিল—বিশ্বের সকল ব্যঞ্জনা ও সকল অনুভূতিকে কঠোর অথচ পরিচ্ছন্ন মানবিকসূত্রে গ্রথিত করে মার্কস্‌বাদ আমার চোখে এক পরিপূর্ণ বিশ্ববীক্ষারূপে ক্রমশ প্রতিভাত হতে লাগল। আসক্তি ও নিরাসক্তির সুমোহন সংমিশ্রণ আমার কাছে ভারত-চিন্তাকে পরম মহার্ঘ মর্যাদা দিয়ে রেখেছে, কিন্তু ইয়োরোপের চলমান, প্রশ্নাকুল, বুদ্ধিদীপ্ত, মানবিক সংঘাত আমার চোখে অজ্ঞাতপূর্ব অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিল, পরস্পর-সম্বন্ধ মানব সমাজের বিবর্তন ও ভবিষ্যত বিষয়ে মার্কসীয় চিন্তার দীপান্বিত ভাষ্য এবং আবশ্যিক ভাবেই তদনুসারী কর্ম আমাকে যুগপৎ পুলকিত এবং বিচলিত করল। এ নিয়ে বাক্‌বিস্তারে নিরস্ত হচ্ছি; প্রকৃত সাহিত্যিক প্রতিভা থাকলে ইয়োরোপ যেখানে গরীয়সী সেই স্তরে ভারতীয় মানসে তার প্রতিচ্ছবির আভাস হয়তো দেওয়া যেত।

১৯৩০-৩২-এর আন্দোলনকালে আমি বিদেশে। রবীন্দ্রনাথ অক্‌সফোর্ডে এলেন ১৯৩০-এর জুন মাসে Hibbert Lectures দেবার জন্য। তাঁকে আমন্ত্রণ করা হল ভারতীয় ছাত্রদের মজলিসে। সভাপতি উত্তর প্রদেশবাসী মহ্‌মুদুজ্জাফর (পরে কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা) একটু যেন সৌজন্য-রহিতভাবেই বললেন, 'কবি, তুমি আজ এখানে কেন? তোমার স্থান কি এখন গান্ধীজীর পাশে নয়? দেশের চিন্তায় আমরা যে অত্যন্ত আকুল হয়ে রয়েছি।' রবীন্দ্রনাথ শুনে আঘাত অবশ্যই পেয়েছিলেন, কিন্তু বললেন, 'গান্ধীজী জানেন কিন্তু তোমরা হয়তো জান্‌বে না আমার অস্ত্র হল ভিন্ন। অথচ গান্ধীজীর পাশেই আমি আছি।' এই বলে চেয়ে নিলেন আমারই "চয়নিকা" এবং পাঠ করলেন "দুঃসময়" কবিতাটি—

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

কবিকণ্ঠে কী অপূর্ব না শুনিয়েছিল ঐ অপরূপ সুন্দর রচনা!

অক্‌সফোর্ডে সোসালিস্ট, কমিউনিস্ট ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটছে, অথচ তখনও গান্ধীজী আমাদের মনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছেন। ১৯৩১ সালের শেষার্ধে তিনি ইংলণ্ডে এলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার জন্য। আমরা লক্ষ্য করলাম রাজনীতির বিচারে তিনি দেশকে নিয়ে এগোতে পারছেন না, অথচ রাজ্যের নিরামিষাশী এবং (ইংলণ্ডের পক্ষে) উদ্ভট

মানুষের ভিড় হতে লাগ্‌ল তাঁকে নিয়ে—অহিংসা আর অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর মতামত নিয়েই তারা ব্যস্ত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বস্তুটাই যেন মহাত্মার মাহাত্ম্যসন্ধানীদের কল্যাণে ধামাচাপা পড়তে লাগ্‌ল। কিন্তু তবুও দেখেছি সরল মানুষটির ব্যক্তিত্বের মহিমা সবাইকে মুগ্ধ করছে। পরণে কটিবাস, ইংলণ্ডের শীতকে যেন পরিহাস করে শুধু ঊর্ধাঙ্গে একটি আলোয়ান, জড়ানো। ১৯২১-এ যে পোষাক তিনি ধারণ করেছিলেন, সেই পোষাকেই গেলেন রাজপ্রাসাদে। সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করল, 'আপনার গায়ে জামাকাপড় একটু কম ছিল নাকি?' হাস্যমুখে জবাব এল, 'তোমাদের রাজামশায়ের পোষাক এত বেশি ছিল যে তিনি আমার দৈন্যকে পুষিয়ে দিয়েছেন।' ঐ পরিচ্ছদে অক্‌সফোর্ডের সভায় তিনি যখন ঢুকলেন, সবাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উঠ্‌ল দাঁড়িয়ে, ঠিক যেন রাজা স্বয়ং এসেছেন বলে—কেউ তাদের দাঁড়াতে বলেনি, আর ওদেশে অমন সভায় প্রধান বক্তা ঢুকলে দাঁড়াবার প্রথাই নেই।

আমরা অনেকেই তখন গান্ধী পন্থা থেকে বহুদূরে সরতে আরম্ভ করেছি, কিন্তু কেমন যেন একটা অদৃশ্য বাঁধন কাটানো সম্ভব হয়নি। ১৯৩২ সালের শরৎকালে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' রোধ করার জন্য অনশন করলেন গান্ধীজী, সুদূর ইংলণ্ডেও আমরা দুশ্চিন্তা, আশংকা, মানসিক যন্ত্রণা এবং সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন চিত্তপ্রসাদও অনুভব করলাম। এভাবে মানুষকে, অজানা মানুষকে টানতে পারে, দেশদেশান্তরে আবেগ উদ্রিক্ত করতে পারে যে শক্তি তাতে সম্মান না জানিয়ে উপায় নেই।

১৯৩১ সালের মাঝামাঝি দেশে যখন ফিরি, তখন ভারতবর্ষে পরিবর্তিত পরিস্থিতি, অনেক ঘাট দিয়ে অনেক জল তখন বয়ে গেছে। সমাজবাদী আন্দোলনকে তখন চেষ্টা করে খুঁজে বার করতে হয় না, আর ক্রমশঃ সেই আন্দোলন আমাকে টান্‌লে, ১৯৩৬ সালে (তৎকালে বে-আইনী) কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করলাম। কংগ্রেস তখন ছিল প্রায় সর্ববিধ মত ও পথের মিলনস্থল—তাই প্রকাশ্যে কাজ করতে পারার জন্য কংগ্রেসে কিছুকাল ছিলাম, সেদিনকার কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করেছি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছি হরিপুরা—ত্রিপুরী অধিবেশনের সময়। "Why socialism?" নামে জয়প্রকাশ নারায়ণ লিখিত এক পুস্তিকা তখন জনপ্রিয় ছিল। গান্ধীপন্থা কেন আমরা ছেড়েছি, তা পুস্তিকায় চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। ইতিহাসের কৌতুকময়ী ভূমিকা লক্ষ্য করি

যখন দেখি জয়প্রকাশ ফিরে গেছেন গান্ধীচিন্তার রাজ্যে, গান্ধীবাদের বর্তমান সংস্করণ সর্বোদয় নিয়ে তিনি ব্যস্ত।

ধৃষ্টতার মত শোনাতে পারে, কিন্তু গান্ধীজী (কিম্বা তাঁর সর্বোদয়পন্থী শিষ্যরা) সমাজের বিবিধ সমস্যায় প্রকৃত উত্তর দিতে সে অসমর্থ, এ-বোধ আমার মতো বহু ব্যক্তির মনে অনেক দিন থেকেই জেগে উঠেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরীব মেরে ভরাইনে পেট
ধনীর কাছে হইনে তো হেঁট
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।

একসময় এ-কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু আবার দেখা গেছে, সারাভাই, জীবনলাল, বাজাজ সর্বোপরি বিরলা প্রভৃতি ধনপতিদের সংগে গান্ধীজীর সম্পর্ক—বিরলাদের প্রতিদান বিষয়ে প্রতিশ্রুতি না দিলেও গান্ধীজী নিজেই সাংবাদিক লুই ফিশর-এর কাছে স্বীকার করেছিলেন যে "একটা অনুক্ত ঋণ" (a silent debt) বিরলাদের সম্বন্ধে তাঁর মনে না থেকে পারেনি। দেশের দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধানে বিত্তবান মালিকের তথাকথিত "অছিগিরি"-র ("trusteeship) গান্ধীবাদী তত্ত্ব যে সহায়ক নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাজ ও অর্থব্যবস্থায় বনিয়াদী পরিবর্তন বিনা ভূমিদান, গ্রামদান জীবনদান ইত্যাদি শ্রদ্ধেয় অথচ মূলত অবাস্তব প্রকরণ যে অসার্থক তাও কষ্ট করে প্রমাণের প্রয়োজন নেই। গান্ধীপন্থার প্রয়োগ যেমন দেশকে দিয়েছে বহু গৌরবমণ্ডিত মুহূর্ত, তেমনই যে এনেছে ব্যর্থতার বিড়ম্বনা, এর মূলসূত্র সন্ধানপ্রচেষ্টা আমার মতো ব্যক্তিকে মার্কস্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলন প্রয়াসে প্রবুদ্ধ করেছে।

প্রবল, গভীর মতান্তর সত্ত্বেও গান্ধীজী সম্বন্ধে প্রগল্‌ভ, অশালীন, পণ্ডিতম্মন্য মন্তব্য করতে অস্বীকৃত হওয়া কর্তব্য মনে করি, অসংকোচে গান্ধীজন্মশত-বার্ষিকী উৎসবে যোগদান আমাদের পক্ষে সমুচিত মনে করি। গান্ধীচিন্তা ভারতভূমিতে প্রোথিত বলে তার এক স্বকীয় সতেজ বৈশিষ্ট্য আছে। গান্ধীচিন্তা বেশ কিছুকাল ভারতমানসকে মুগ্ধ করেছিল, জনতা তাকে গ্রহণ

করেছিল, এবং সেজন্যই ঐ চিন্তা পরিণত হয়েছিল এক বিরাট বাস্তব শক্তিতে, এবং এদেশের পরিস্থিতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হবার নয়। 'সত্যাগ্রহ' ব্যাপারকে অবজ্ঞা করা তাই বাতুলতা। সদুদ্দেশ্য সাধন করতে হলে সদুপায় সর্বথা গ্রহণীয়, এ কথাকে নিছক পাদ্রীসুলভ পোষাকী নীতিবাক্য বলে উড়িয়ে দেওয়া মানসিক ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক মনে করি। বিভিন্ন দেশে, বিচিত্র পরিস্থিতিতে বিপ্লবের যে মূল্য লেগেছে তার বিচারে নেমে যে সব ভুল-ভ্রান্তি আর আতিশয্য আর অপরাধেরও কথা সম্প্রতি প্রচুর শোনা গেছে, তা থেকে অন্তত সদুদ্দেশ্য সাধনে সদুপায় অবলম্বন বিষয় গান্ধীজীর আগ্রহকে শ্রদ্ধা না করে কি উপায় আছে?

গান্ধীজীকে দূর থেকে দেখেছি বহুবার, আর সাম্‌নাসাম্‌নি বসে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি দু'বার। আরও অমন সুযোগ সহজভাবেই এসেছে কিন্তু কুণ্ঠাভরে গ্রহণ করিনি। নিতান্ত সঙ্গত কারণ বিনা মহদাশয় এবং নিরতিশয় ব্যস্ত কোন ব্যক্তির কালক্ষেপ ঘটাতে আমার একান্ত সংকোচ। কথা যখন বলেছি এবং শুনেছি কাছে বসে, তখন দেখেছি তাঁর সহজ সদানন্দ ভাব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারণা হয়েছে তিনি যেন প্রকৃতই অন্যগ্রহবাসী। সাধু-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য কখনও চাইনি, কিন্তু এই অনন্য নায়কের নিকটে এসে মনে হয়েছে যেন বিনা আয়াসে শান্তি বিকীরণ করছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, যেন তাঁর সাধ্য রয়েছে অপরের অন্তরের ঝঞ্ঝাকে প্রশমিত করার। এটা নিছক ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া হতে পারে, কিন্তু এ-বস্তু অনুভব করেছি বলেই লিখছি। জওহরলাল নেহরু কিম্বা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর সান্নিধ্যে যে-ধরণের অনুভূতি জাগার লক্ষণ মাত্র থাকৃত না, সে-অনুভূতির আস্বাদ পেয়েছি স্মিতানন মহাত্মার উপস্থিতিতে—স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁকে ছাড়া আমার দেখা আর কাকে বলতে পারি?

গান্ধীবাদে অবিশ্বাসী কারও পক্ষে যা লিখেছি তা লেখা অনুচিত ও অযৌক্তিক, এমন কথা যদি কেউ বলেন তো নাচার। জীবন কিন্তু এমন জটিল যে বাঁধা-ধরা কথা সব সময় চলে না। আর ভারতবর্ষের মার্ক্‌স্‌বাদীদের তো স্বয়ং লেনিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে দুই যুধ্যমান্‌ জগতের মধ্যস্থলে অবস্থান করছিলেন "টলস্টয়্‌"-এর ভারতীয় শিষ্য। মহাত্মা গান্ধীর জয় হোক!

শারদীয়া "কম্পাস": ১৩৭৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত।